

আজবনগরের কাহিনী

পৃথিবীর কোথাও আজবনগর বলে কোন স্থান নেই .
কিন্তু আজবনগরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীই আছে ।

আজবনগরের কাহিনী

নবেন্দু ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬।

দাম ছয় টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ, পৌঃ ১০

ডি, এম, লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ৪২নং কণ্ঠশালশ দ্বারা
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক ৮৩বি,
বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়,
১০৮ নং ফোর্টচিফ স্ট্রিট।

মালতীদিকে

এই লেখকের লেখা—

নায়ক ও লেখক (২য় সংস্করণ)

ডাক দিয়ে যাই (৫ম সংস্করণ)

প্রান্তরের গান

কাঞ্চনপুরের ছেলে .

এই সীমান্তে . . .

মাহুঘ

ইম্পাত

কায়া

পৃথিবী সবার

কালো রক্ত (১ম খণ্ড)

বসন্ত-বাহার

ফিয়াস লেন

নীল (বঙ্গবন্ধু)

এক

নদীর নাম রূপসী।

মিষ্টি একটা স্বপ্নের মতো নদীটা। উত্তরের কোন তুষারাবৃত পাহাড় থেকে যে সে নেমে এসেছে তা জানা নেই। তরী কুমারীর মত মানানসই তার রক্তশুভ্র দেহখানি সে পাথর আর বালুকণার ভৈরী শয্যার ওপর এলিয়ে দিয়ে দিনরাত গান গায়। নীলের ওপর গড়িয়ে যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ওপর আছড়ে পড়ে রূপসী নদী দিনরাত শুধু গান গায় আর গান গায়। সেই গান শুনে বাতাস মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ওঠে, নদীর সুরে সুর মেলার আর ওপারের শালবনে প্রশংসার মর্মর ধ্বনি ওঠে, শালবনের সব পুতুল আকাশের পটভূমিতে আঁকা ধূসর পর্বতশ্রেণীর ওপরে খচিত মেঘরাশি হঠাৎ আবেগান্বিত হয়ে ছুটে আসে। আর তাদের ওদের দিচ্ছিল করে উড়ে আসে যত বাঘাবর বুনো হাঁসের দল, আসে ভিজে বানানো কত বিচিত্র বর্ণের পাখী। রূপার পাতের মত নদীটার আর নাতে বসে তারা তাদের ক্লান্ত পক্ষকে বিশ্রাম দেয়, জলের মধ্যে বসানো হুঁড়ি মাছ ধরে, বগু উল্লাসের ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। কালশ্রাবহঠাৎ একসময়ে তারা দল বেঁধে উড়ে চলে যায়, ডানার বিচলিতায়ুতরকে বিক্ষুব্ধ করে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। রূপসী নদীর হয়ে বসে বার নিশ্চলতা ধনিয়ে আসে। কখনো কখনো নদীর ওপারের রস-শ্রুতারকে ময়ূরেরা উড়ে আসে। কখনো বা নেমে আসে একদল নৃত্যবিদ ব্রীণ, নস্তর্পণে জলের ধারে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়। গলিত তিমিরকারি মত শুভ্র, স্বচ্ছ জলের বুকে তারা নিজস্বের প্রতিবিম্ব দেখে

সবাক হয়ে যায়, সন্ধ্যোহিতের মত শানিকলণ ছিন্ন হয়ে থেকে হঠাৎ
 ভাঙা লাকিয়ে উঠে শালায়, শালবনের নিরাশ্রয় ছায়ায় অশ্রু হয়ে যায়।
 রূপসী নদী একই ভাবে বয়ে যায়। কলকল ছলছল স্রনি ওঠে তার
 লক্ষ্যকোটি নিরীহ তরঙ্গ থেকে, এক টুকরো নীলাকাশ তার বুকে
 চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে থাকে, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সে
 সোনার আবীর মেখে শৃঙ্খার সারে, রাতের নক্ষত্রেরা তার বুকে তারা
 নানা বাসনার প্রদীপের মত জ্বলে, কাঁপে। আর তার বুকের মধ্যে বয়ে
 যায় এক মুগ্ধ জীবনের প্রবাহ, কিরকিরে বাতাসের মত একটা মুহূ
 স্রোত। স্বপ্নের মত রূপসী নদী।

নদীর ওপারে, শালবন, তার পেছনে পর্বতশ্রেণী। এপারে
 তরুহাতিত প্রান্তরে মাহুঘ প্রমাণ বুনো ঘাস, এখানে ওখানে
 আম্র জাম ও তাল গাছের অচেনা বুনো ফুলের রাশি। এপারের
 মাটি নরম, ভিজে-ভিজে। বুনো ফুলের গন্ধের সঙ্গে ভিজে মাটির
 বিচিত্র গন্ধ এখানে ভেসে বেড়ায়। শালিক, জামা আর দোয়েলেরা
 সব প্রান্তরে নেমে কি যেন খুঁটে খুঁটে যায় আশ্রয়স্থল
 করে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে ঘুঘুরা মাতা। নি
 কিরকিরে বাতাসে ঘাসের ডগাগুলো হয়ে পড়তে থাকে। নি
 গুলো যেন কোন এক অজ্ঞত সঙ্গীতের মুগ্ধ প্রোতার ধ্বনি। অ
 বোলায়। গাছপালা লতাপাতা আর ঝোপঝাড়ের সব হিম
 নিবিড় ও ঠাণ্ডা ছায়ায়, উড়ন্ত প্রজাপতি আর ফড়িং-ম
 করে। বুনো ফুলের মধু খেয়ে তাদের শরীর তারপর
 নেশায় অবশ হয়ে ওঠে আর আধবোজা চোখে দ্ব্যমিতে
 একটা মধুময় রক্তপদ্মের আকার ধারণ করে। ছপাশে অ
 রূপসী নদীর জলের শব্দ, শালবনের স্রবণশালবন যে
 হরিনের পায়েব আওয়াজ, বাতাসের গান, বংশোত্তচক্ষু হি
 পাখীর ডাক—সব মিলিয়ে একটা সম্মিলিত শব্দে মুগ্ধ

হয়ে স্বর্গসেব করে যার। ওগারের শালকন থেকে নিগাচর জাহাজের জাহাজ
কীপজারে চেলে আসে। রাতের আত্মানে রোমাঙ্কিত আত্মকের বকে
বলে 'বিকি' শোকারা একতান হুক করে দেয়। গাছপালাগুলো
চুপ করে বিমোহ, প্রজাপতিরা ঘুমোয় আর পাখীরা বিনাস্তের গান
শেষ করে। চরাচরের ওপর রহস্যময়ী রাতের ছায়া ফেলে। গ্রিক সেই
সময়েই দ্বিতীয় ঘরটাতে গিয়ে দাঁড়ায় বুড়ো। মনিমারিক্য-বুক ঘরের
দেওয়াল থেকে সাতরঙা বিচিত্র আলো বেরোচ্ছে সেখানে আর সেই দ্বিধা
আলোর মাঝে সাদি সারি অসংখ্য পুতুল সাজানো আছে। বুড়ো
কারিগর হাতের পুতুলটাকে তাদের একপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিচিত্র
হেসে বলে, "সুখে থাকো"—তারপরে এককোণে বসে পড়ে নে,
পুতুলগুলোর দিকে মুখ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। অসংখ্য পুতুল
আর তাদের প্রত্যেকটিকেই বুড়ো কারিগর তৈরী করেছে। তৈরী
করেছে তার সারা জীবন ধরে।

হ্যাঁ, এই ঘরেই পুতুলেরা থাকে। বিচিত্র বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত
সব পুতুলেরা। পুরুষ ও নারী ছ'রকমের পুতুল। বহুমুখ্য মনিমারিক্য-
খচিত ঘরের মাঝে ওরা সানন্দে দিন কাটায়। সুখস্বপ্নের মত সুন্দর
ওদের দিন আর রাত। প্রজাপতিরা ওদের খাবার জন্ত মধু বয়ে আনে,
ভিজ্জ বাতাস নিয়ে আসে ওদের পানীয়। ওরা শুধু খায় দায় ঘুমোয়
আর নাচগান করে। দুঃখ শোক জরায়ুত্যা নেই ওদের, ঘরের দেওয়ালে
বসানো হীরেমুক্তোর আলোর মতই স্থির ওদের জীবন ও বোঝন।
কালশ্রোত ওদের ভাসাতে পারে না।

বিচিত্র ও আনন্দরস-ঘন পুতুলদের জীবন। ঘর ভুড়ে, গানগানি
হয়ে বসে আছে ওরা আর ওদের মাঝখানে বসে আছে ওদের শিল্পীরা,
রস-স্রষ্টারা। বেহালা-বাদক টিমপি, বীণকার স্রীমন্ত, গায়ক কীর্তিমান,
নৃত্যবিদ পুলাসেন, নর্তকী মারিমাণা, লেখক অশ্বত্থমান, দার্শনিক
তিমিরকান্তি এবং চিত্রকর জ্যোতির্ময়। ভোর হয়, দুপুর কাটে, সন্ধ্যা

হয়, রাত্রি কাটে, আবার রাত্রি প্রভাত হয়। এক হুগে-শাখা বীণার
আলাপের মতই নিখুঁত ওদের প্রাত্যহিক জীবন। একইভাবে চলে তা,
একইভাবে পুনরাবৃত্তি করে।

ভোরবেলা।

সমস্ত পুতুলদের পেছনে যে বলিষ্ঠ পুতুলটা একটা তলোয়ার
হাতে ঝড়িয়ে আছে, প্রতিদিনকার মত আজো সেই প্রহরী চেঁচিয়ে
ওঠে, বলে, “ভাইসব জাগো-৭-৭-৭—কিনী রাত চলে গেছে, ভোর
হয়েছে এ-এ-এ”—

কীর্তিমান তানপুরার তারে ঝঙ্কার তুলে ভৈরব রাগে গান ধরে।
পৃথিবীর সজ-জাগ্রত চোখের সামনে এ কী বিশ্বয়! পাখীর গলা ছেড়ে
গান গাইছে, অকারণে হাওয়ায় গা ভাসাচ্ছে! শালবন আকাশের
উন্মুক্ত তোরণদ্বারের দিকে উন্মুখে চেয়ে আছে, রাতের ঘুম কুসানার
মত জড়িয়ে আছে বহুদূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে আর রূপসী নদীর কৃক
ঝাড়া মুখ দেখছেন সূর্যদেব!

তিমিরকাস্তি তার বড় বড় চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বলে, “ভোর
হয়েছে—ভোরের বাতাসে, ভোরের আলোতে, মহান আত্মার মুখোমুখি
হয়ে দাঁড়াও ভাইসব”—

কলম নেড়ে অংকমান বলে, “এই স্বর্ণোজ্জ্বল ভোর বেলা থেকে
আবার নতুন করে ভালবাসো ভাইসব, মনে রেখো—ভালবাসাই জীবনের
সেরা ঐশ্বর্য”—

...এক কোণে যে পুতুলটা পাখোয়াজ নিয়ে বসে থাকে, তার হাত
কৃতগতিতে চলে! গম্ভীর, মেঘমস্ত ধনি ওঠে। কীর্তিমানের উদার
কণ্ঠস্বরও ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে। পাখোয়াজের গুরু গুরু শব্দ ও

গায়কের ভারী গলা একসঙ্গে মিশে যায় মনে হয় যেন একটা অগ্নিময় শব্দ-স্তুম্ভ আকুল ভাবে আকাশকে স্পর্শ করতে চাইছে।

মুগ্ধ হয়ে শোনে পুতুলেরা। প্রজ্ঞাপতির ঠোট থেকে মধু আহরণ করে, ভিজে বাতাস থেকে পানীয় শোষণ করে ওরা স্থির হয়ে কীর্তিমানের গান শোনে। দিনের প্রথম প্রহর বিভাবের তানে শেষ হয়।

শ্রীমন্ত অনেকক্ষণ ধরেই বীণাটা বাজাবার জন্ত ব্যগ্র হয়ে ছিল, কীর্তিমান থামতেই সে তারে স্বাক্ষর দেয়। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের গানের মতই অপূর্ব সে ধ্বনি।

পুতুলেরা হাসাহাসি করে।

জ্যোতির্ময় পরিহাস করে বলে, “বীণা বাজাবার জন্ত কেনে উঠেছে বীণকার, শোন—তোমরা ওর প্রাণে আঘাত দিও না—” - -

পুতুলেরা বলে, “না না, তুমি বাজাও শ্রীমন্ত, বাজাও—”

শ্রীমন্ত বীণার তারে স্বাক্ষর দেয়। আশাবরীর আলাপ শুরু হয়। পৃথিবীময় এ কী বিশ্বয়! পার্বত্য স্বরুণা বয়ে যায়, দল বেঁধে পাখীরা আকাশে ওড়ে। আর আকাশটা কী গাঢ় নীল! তাতে সাদা সাদা মেঘের পুঞ্জ নিরুদ্ধেশ-বাহরীদের মত ভেসে চলেছে। শালবনে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে হরিণ শিশুরা। রূপসী নদীর ধারে বকেরা বসে আছে আর প্রান্তরে কোথায় যেন কোকিল ডাকছে। মাটির গর্ভ ভেদ করে বেরোচ্ছে জ্বালন তূণের অঙ্কুর, বুনো ঘাসের ডগায় তার লোভী প্রাণের শিপাসা আকুল হয়ে উঠছে। বীণার তারের অপরূপ স্বাক্ষরে ঘরটা গমগম করতে থাকে, মণি-মাণিক্য-খচিত দেওয়ালগুলো যেন পুতুলদের হৃদয়-গেঁদার মতই সজীব হয়ে ওঠে।

আশাবরী রাগিনী শেষ হয়, গাছারী শুরু হয়। নীল মধ্যম্নে মোড়া আকাশের সিঁড়িপথ বেয়ে সূর্য্যদেব এগিয়ে চলেন। ঘাসবনের নিভৃত ছায়ায় বসে প্রজ্ঞাপতির পাখাগুলোকে বিজ্রাম দেয়। আমজাম বট গাছের পাতাগুলো নিম্পন্দ হয়ে কোকিলের ডাক শোনে। শাল-

বনের অন্ধরালে, রূপসী নদীর তীরে, বিকৃত প্রান্তরের এখানে ওখানে, অজস্র বকমের ফুল কোটে। নানা রংয়ের ফুল। প্রান্তরের কুকে, ছোট ছোট বিল আর পুকুরে পদ্মফুলও কোটে। আর এইসব নানা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, সৌখীন বিলাসীর মত অভিজাত ও মন্থর গতিতে তা বয়ে যায়।

উন্মাদের মত বাজাতে থাকে শ্রীমন্ত, বীণার তারগুলো খেন তাদের ক্রন্দন নিয়ে নিড়ে নিড়ে বন্ধার তোলে। সুনতে সুনতে কীর্তিমান দুর্লভে থাকে, গভীর আবেগের সঙ্গে মাথা নাড়তে থাকে। সেই নামহীন পাখোয়াজ-বাদক সজোরে হাত চালায়, বীণার ক্রত লয়ের সঙ্গে লয় মিলিয়ে তাল রাখে। আর সব কিছু সুনতে সুনতে চিত্রকর জ্যোতির্ময় যেন স্বপ্ন দেখে। 'আহা, ফুল ফুটছে। ক-ত ফুল! গোলাপ, টগর, চামেলী, পলাশ আর কুসুমচূড়া। শালবনের ছায়ায় বসে দীর্ঘশ্বাস হরিণেরাও স্বপ্ন দেখছে। হুঁচোখ জলে জ্যোতির্ময়ের, ক্রতগতিতে সে ছবি আঁকতে শুরু করে।

তিমিরকাস্তি মাথা নাড়ে, ঝাঁকড়া চুল ছুলিয়ে বলে, “আনন্দই অমৃত, আনন্দই আত্মার ধর্ম, ভাইসব—তোমাদের স্বরূপ আনন্দময়”—

অংশুমান উঠে দাঁড়ায়, ডাগর ডাগর স্বপ্নালস চোখ দুটোকে সামনের দিকে নিবদ্ধ রেখে সে আবিষ্টের মত বলে, “সুন্দর—পৃথিবী বড় সুন্দর। ভাইসব, সুন্দরই সত্য, সুন্দরই শিব—তাকে ভালবাসো”—

গান্ধারী রাগিনী কখন শেষ হয়ে যায় কারো খেয়াল থাকে না। হঠাৎ যখন পুতুলেরা সচেতন হয় তখন তারা শোনে যে ঘরের মধ্যে যেন এক বিরহিনীর আবির্ভাব হয়েছে, গভীর তার স্বর, প্রাচুর্য বেদনা ভরা। টোড়ি রাগিনী। - এ কী হুঁখ, তবু এ কী সাস্বনা! হৃদয়ের গভীরে কি যেন এক আকুল কামনা, একটা সুবিপুল শূন্যতা! গভীর হুঁখ, তবু একা নয় কেউ। গাছ, লতা, ফুল, পাখী, হরিণ আর নক্ষত্র আছে। পৃথিবী প্রাণময়।

হঠাৎ সেই তলোয়ারধারী প্রহরী নীরবে গুঠে। ঘরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেদনা ধরে যাচ্ছে! না, না, সত্যক করে দিতে হবে। সে যে প্রহরী। এই ঘরে, এই পুর পৃথিবীতে নিঃস্বপ্ন সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের জগতে তো নাকি প্রধান হতে দেওয়া হবে না। এখান থেকে বহুদূরে, মানুষদের পৃথিবীতে নাকি দুঃখ আছে, ব্যাধি ও অভাব আছে, শাসন সমস্ত অন্ধবৃত্তি আছে, পাশ আর অন্ধার আছে। সেখানকার অন্তত আত্মা এই পুতুলদের সৌন্দর্যলোককে প্রতিনিরত গ্রাস করার চেষ্টা করে। পুতুলেরা বেদনায় মুগ্ধমান হয়ে পড়লে তারা এসে পুতুলদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। না, তা হতে পারে না। মানুষদের বিষয়ে বুড়ো কারিগরের মুখে নানা কথা শুনে সে ভয়ানক আকুল হয়েছিল কিন্তু তাই বলে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করবে না। না, সে বাধা দেবে।

তলোয়ারটা তুলে ধরে প্রহরী গর্জে ওঠে, “সাবধান, সাবধান—বেদনা প্রধান হতে চলেছে—”

বাজনা থেমে যায়।

শ্রীমন্ত মাথা নেড়ে বলে, “বুঝেছি প্রহরী, বুঝেছি—তোমাকে ধন্যবাদ।”

তখন বেহালাবাদক উঠে দাঁড়ায়, বলে “দাঁড়াও শ্রীমন্ত, আমি এবার একটু বাড়ির বাজনা বাজাই। প্রহরীর ভয় আর টোড়ি রাগিনীর বেদনাকে আমি এখন দূর করে দিচ্ছি—”

পুতুলেরা হাসাহাসি করে।

জ্যোতির্ময় তাদের পরিহাসের স্রোতে বলে, “বুড়ো টিমথির কাণ্ড দেখেছ তোমরা, বেহালা বাজাবার জন্তু অবীর হয়ে উঠেছে লোকটা! আহা বাজিয়ে টিমথি, বাজিয়ে, তার আগে একবার আমার ছবিটা ওদের দেখাতে দাও—”

বলেই সে নিজের ছবিটা তুলে ধরে। ভলের ওপর একটা রক্তপত্ন

ফুটেছে। কি বিচিত্র তার বর্ণ, কি মনন তার শাপড়িডালো! পুতুলের
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আনন্দের নিশ্বাস ফেলে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সবাই।

একটি যুবক পুতুল তার সঙ্গিনীকে বুকে টেনে নিয়ে চাশা গলায়
বলে ওঠে, “জ্যোতির্ময়ের রক্তপনের একটি শাপড়ির মতই তোমার
ঠোঁট—একটা চুমু দেবে?”

সঙ্গিনী লাজবস্ত হয়ে চোখ বোজে, ধীরে ধীরে নিজের মুখটা তুলে
ধরে, ঠোঁট ছুটোকে আলতো করে একটা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের ভঙ্গ প্রতীক্ষা
করে।

অন্তর্যমানে বলে ওঠে, “ভালবাসো পুতুলেরা, ভালবাসার চেয়ে বড়
সাধনা আর কিছুই নেই”—

কিন্তু টিমথির মুখ তখন অন্ধকার হয়ে ওঠে, বেহালাটা বগলে চেপে
একপাশে বসে পড়ে সে।

জ্যোতির্ময় তাকায় তার দিকে, মহাস্তম্ভ বলে, “আরে, তুমি যে বসে
পড়লে টিমথি? নাও, এবার বাজাও”—

টিমথি মাথা নাড়ে, ধরা গলায় বলে, “না।”

“কেন?”

টিমথি ঠোঁট উলটে বলে, “তুমি আমার বুডো বগলে কেন?”

জ্যোতির্ময় হেসে ওঠে।

পুতুলেরা প্রবোধ দেয় টিমথিকে, “না, না, তুমি বাজাও টিমথি”—
তারা অনুরোধ করে টিমথিকে, “তোমার বুড়ের বাজনা আমাদের
শোনাও টিমথি, টিমথি”—

টিমথি উঠে দাঁড়ায় আবার, খুঁনি দিবে বেহালাটা চেপে ধরে ছড়িটা
চালাতে শুরু করে। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন ইন্দ্রজাল বটে। বিরাট
এক অরণ্য যেন ঘরের মধ্যে তার ছায়ানিক্ষেপ করে। টুপ্ টাপ্
অন্ধনে পাতা পড়ছে, হুঁ একটা পাখী ডাকছে। আর কোনো শব্দ নেই।

খমখে নিশ্চয়তা। অরণ্য প্রতীক্য করছে। ঝড় আসছে মধুর
 বেহালা যেন পরিকার বুঝিয়ে দেয় যে দূরে একটা শোঁ শোঁ ৩১. অমনকই
 শোনা বাচ্ছে। ক্রমে সে শব্দ বাড়ে, কাছে আসে। টিমথি ভাসে
 হয়ে জোরে জোরে ছড়ি টানে এবার। প্রমত্ত ভৈরবের মত সঙ্গীত
 আসে ঝড়। অরণ্যের শান্তি বিহ্বিত হয়। গাছপালার আত্মনাদ, গু, শাখার
 অন্তিম চীৎকার। ঝড় কথা বলে। আমি মুক্তি, আমি বিপ্লব,
 আমি পরিকার করি, আমি জীর্ণ পাতার জ্বলানকে দূর করি, বনশ্রুতির
 গর্বেদ্ধত মাথাকে আমি ভূতের সাধে সমান করি। ঝড় তার কথা
 রাখে। ঝড় খেমে যায়। আবার নিশ্চয়তা, গভীর নিশ্চয়তা। শান্তি।
 টুপ্ টাপ্ পাতা পড়ার শব্দ, ঝিরে ঝিরে বাতাসের নিঃশ্বাস, নাইটিংগেল
 পাখীর ডাক আর ডেজী ফুলের গন্ধ। টিমথিকে আর চেনাই
 যায় না।

নৃপ পুতুলেরা সোংসাহে বাহবা দিয়ে ওঠে, “অপূর্ব হয়েছে টিমথি—
 চমৎকার হয়েছে তোমার বাজনা, তুমি আমাদের প্রজ্ঞাগুলি নাও”—

টিমথি জবাব দেয় না, কোনো কথাই তার কানে যায় না, তার
 সমস্ত বাহ্যজ্ঞানই তখন যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একমনে সে বাড়িয়েই
 চলেছে।

তিমিরকান্তি গম্ভীর হয়ে বলে, “বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর থেকে নিরন্তর
 যে সুরের উৎপত্তি হচ্ছে, টিমথির অন্তর তার সঙ্গীতের মিলিয়ে ছন্দোময়
 হয়ে উঠেছে—টিমথি ভাগ্যবান”—

অশ্বমান মাথা নাড়ে, সায় দিয়ে বলে, “হ্যাঁ, টিমথি ভাগ্যবান—
 তার অন্তরের এই বিচিত্র সঙ্গীতের কথাকে আমি লিপিবদ্ধ করব”—

তারপরে সময় কাটে। বৃন্দাবনী সারঙ্গের আলাপে দিনের দ্বিতীয়
 প্রহর শেষ হয়।

পুতুলেরা বলে, “তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হল, সূর্যদেবের অবরোধণও
 শুরু হল, এবার আমরা নাচ দেখব”—

হুটেছে। বিহীন পাথোয়ারবাদক তখন তার বাজবয়ে আঘাত করে।
 বোনাকিতালের বাজনা শুরু হয়। পুষ্পসেন উঠে দাঁড়ায়। পুতুলেরা
 উদ্বে করতালি দিয়ে তাকে সংবর্ণনা জানায়। নাতিদীর্ঘ দৈর্ঘ্য
 পানের, টানা টানা চোখ, মাথাভর্তি কৌকড়ানো চুল। পেছন থেকে
 বগিয়ে আসে আর একটা পুতুল, এসে তার হাতের বাঁশিতে ফুঁ দেয়।
 কীতিমান পূর্ব-রক্ত আরম্ভ করে। শ্রীমন্ত তার বহুতরী বীণাকে মুখর
 করে তোলে। সম্পূর্ণ জাতি রাজবিজয় রাগের আরোহণ ও অবরোহণ
 শুরু হয়, তার গমক ও মূর্ছনায় সারা কক্ষ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। স্থানক
 ভঙ্গীতে দাঁড়ায় পুষ্পসেন। বাঁ কাঁধের ওপর মাথাটা ঝুঁকি হেলিয়ে,
 হংসপক্ষ মুদ্রায়ুক্ত বাঁ হাতকে কাঁধের সঙ্গে সমান করে, কটিদেশ থেকে
 গ্রীবা পর্যন্ত ডানদিকে ঘানত করে ও আলপদ্ম-যুক্ত ডানহাতকে বুকের
 কাছাকাছি রেখে বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়ায় পুষ্পসেন। একটি রক্তপদ্মের
 জন্মকাহিনীকে সে নৃত্যাকারে বর্ণনা করবে। অন্তগামী সুষমাবের
 বেদনারাগকে সঞ্চয় করে জলাশয় তা নিজের বেদনা-রসে জাগ্রিত করে,
 তারপরে পূর্বাকাশে যখন সোণার হাছলির মত বন্ধিম চন্দ্রদেবকে দেখা
 যায় তখন জলাশয়ের পঙ্ক-হৃদয় থেকে নির্গত হয় তার প্রণয়-কুসুম।
 একটি রক্তবর্ণ পদ্মকলি। ছোট জলাশয়ের রক্তঝরা প্রণয় কুসুম। কিন্তু
 বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তাকে নিম্পলকনেয়ে দেখে। মেঘচূষী আকাশের
 শিখর থেকে নেমে আসে অম্পর লোকের অনন্তযৌবনারা, মহান নীলাকাশ
 চেয়ে থাকে তার কোটি কোটি নক্ষত্র-চক্ষু মেলে, উদরলোকের আনন্দরস
 কুয়াসা আর শিশির হয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্পসেন নাচে। রক্তপদ্মের
 জন্মকাহিনী। কিম্বদ-কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের মত মিষ্টি কাহিনী। নানা-মুদ্রা-
 যুক্ত হাতের ভঙ্গী আর ভাগর ভাগর চোখ দিয়ে সে তা বর্ণনা করে।
 সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নৃপূর দিয়ে সে ভাল রাখে। হাতের ভঙ্গীকে তার দৃষ্টি
 অহুসরণ করে, দৃষ্টিকে অহুসরণ করে মন, মনকে অহুসরণ করে
 ভাব এবং একমুখে পরিচালিত ও সমাবিষ্ট এই সঙ্গীত, ভঙ্গী,

দৃষ্টি, বন ও ভাব থেকে উৎপত্তি হয় রসের। শান্ত ও মধুর
 পুতুলদের চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে। রসই আনন্দ। অনন্তই
 অমৃত। পুতুলেরা বিচিত্র ভেজ অমৃতভব করে, নারা দেহে তাদের
 রোমাঞ্চকর শিহরণ খেলে যায়। পদ্ম ফোটে। আসে ভ্রমর। গুণ্ণ-গুণ্ণ
 গুণ্ণরূপে সে তার হৃদয়কে ব্যক্ত করে। রক্তপদ্ম নিঃশব্দে আত্মত্যাগ করে,
 নিজেকে নিঃশেষ করে, মনে মনে সে বলে যে প্রেম আত্মত্যাগী,
 আত্মদাহী। পাথোয়ার্জের গম্ভীর ধ্বনি, বীণার বিচিত্র বন্ধার,
 কীর্তিমানের মণ্ডিতাবী গান, বীণীর উদাস স্বর ও পুস্পসেনের নৃপুরনিকণ—
 সব মিলিয়ে যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের চক্রধরনির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার
 হয়ে যায়।

অন্তর্যামী বলে ওঠে, “ভালোবাসো পুতুলেরা, ভালোবাসো। অনন্ত
 বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ পৃথিবী, স্বপ্নদর্শী নানাবর্ণের মেঘমালা, অসংখ্য পুস্পের
 সৌরভ, চারদিকের জ্যোতিষলোক আর জানা অজানা লক্ষকোটি
 গ্রহরাজি—ভালোবাসো পুতুলেরা ভালোবাসো।—”

দীর্ঘকেশ দুলিয়ে আবিষ্টের মত বলে তিমিরকান্দি, “আর ভালবেসে
 শক্তি অর্জন কর—আলো, বাতাস, জল, সৌরভ, সঙ্গীত আর ছন্দোময়
 ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে উন্মোচন করার জন্য আমাকে অনুসরণ কর। সুন্দর
 পুতুলেরা, শোন—আমাদের যাত্রাপথ ওপরের দিকে। অজ্ঞাত রহস্য-
 লোকের দুর্গমতাকে ভেদ করে আমাদের সেই শেষ বিশ্বকে আবিষ্কার
 করতে হবে—যার পরে আর কিছুই জানবার থাকবে না। বিশ্বাস কর,
 আমি অনুভব করেছি—সেই শেষ বিশ্ব আমাদের মতই একটি ছোট
 পুতুল, নীলবর্ণ স্থির বিদ্যুতের মতই তার অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি”—

তলোয়ারধারী সেই গ্রহরী হঠাৎ সবার চেতনা ফিরিয়ে আনে, হঠাৎ
 সে সবাইকে শিহরিত করে তোলে, তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে, “ক্লান্ত, বড়
 ক্লান্ত মনে হচ্ছে”—

“ক্লান্ত!” পুতুলেরা শিউরে ওঠে, বিবর্ণ হয়ে যায়। এ কি অন্তত কথা!

—হরী মাথা নাড়ে, বলে, “হ্যা, ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত।”

তিমিরকান্তি গর্জে ওঠে, তিরস্কার করে বলে, “মূর্থ প্রহরী, চুপ কর।
পুতুলের মুখে কখন এমন কথা শোভা পায় না। পুতুলের হৃদয় জীবন
আর অক্ষুরক্ত আনন্দের ভাণ্ডার পেয়েও তোমার ক্লান্তি কেন?”

প্রহরী ভয় পায় না, থামেও না, একইভাবে সে বলে, “কারণ আমরা
সৃষ্টি করি না। পশুর মত বসে বসে এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-বিলাস
আমার কাছে দুর্বলতা বলে মনে হয়।”

“মূর্থ—তুমি মূর্থ—”

“কারণ আমরা বাইরে যাবার চেষ্টা করি না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুংসিং ও
অসুন্দর সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই না—”

“প্রহরী, তুমি হতভাগ্য—”

“কারণ আমরা ঋণ জীবনের অধিকারী শুধু পুতুল হয়েই থাকতে
চাই”—

অশ্রুমান হেসে ওঠে, প্রশ্ন করে, “তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি কি
চাও?”

প্রহরী যেন স্বপ্ন দেখে, স্বর নামিয়ে সে বলে, “আমি পূর্ণাঙ্গ জীবন
চাই।”

“তার অর্থ?”

“আমি পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত অন্তর্ভুক্ত দূর করতে চাই, বহুদূরের
পৃথিবী থেকে আমি”—

“তুমি কি?”—

“তুমি কি?”—

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে পুতুলেরা, “তুমি কি?”—

সেই তলোয়ারধারী প্রহরী যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, “হ্যা,
আমি মানুষ হতে চাই”—

“ছি ছি ছি”—

“ধিক্ প্রহরী—ধিক্”—

পুতুলেরা শিউরে ওঠে। একি অমঙ্গলের কথা! একি পশুর মত কৃদ্ধি! অনাবিল সৌন্দর্য আর নীমাহীন আনন্দকে চায় না! প্রাণবান পৃথিবীর সেরা জীব পুতুল হয়েও নিজেকে ঋণ-জীবনের মনে করে! পৃথিবীর সব চেয়ে দুর্বোধ্য জীব মানুষ হতে চায়! ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে চায়!

অংশুমান ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, “প্রহরী, তুমি উন্মাদ, উন্মাদ”—

পুতুলেরা গর্জে ওঠে, “প্রহরী, তুমি হতু হও।”

প্রহরী মাথা নেড়ে হাসে, বলে, “ভয় করি না তোমাদের—আমার হাতে অস্ত্র আছে”—

আর কোনো কথা বলে না সে, তলোয়ারের হাতলটাকে সে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে হঠাৎ চূপ করে যায়, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কি যেন ভাবে।

কানাকানি করে পুতুলেরা। নৃত্যগীত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্ত। কীর্তিমান আর শ্রীমন্ত যেন মুহূর্তে কি সব ঠিক করে নিজেদের মধ্যে, তারপরে তারা খুদী হয়ে প্রহরীর দিকে তাকায়।

তারা বলে, “প্রহরী, তোমার ক্লান্তিকে আমরা দূর করব, পুতুলের জীবন সঙ্কে তোমাকে আমরা গবিত করে তুলব।”

দিনের চতুর্থ প্রহরও শুরু হয় তখন। শ্রীমন্ত বীণা বাজায়, মূলতানী সুরে গান গায় কীর্তিমান। সময় কাটে। অপরাহ্নের গান গায় পাখীরা, সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েন, তালদীঘির ছায়া দীর্ঘায়ত হয়ে পূর্বদিকে পড়ে। মূলতানী শেষ হয়, কুমারী রাগিনী শুরু হয়। কীর্তিমান গায়, শ্রীমন্ত বাজায়। ওদের ক্লান্তি নেই। জীবন ওদের কাছে দুলভ বলে মনে হয়, তাই ওরা সময় নষ্ট করে না। প্রতিটি মুহূর্তই দামী। বত আনন্দ পাওয়া যায় ততই তো লাভ। কুমারী রাগিনীর পর শুরু হয় মালবী রাগিনী। প্রজাপতির লতাপাতার ছায়ায় ঝিমোয়, মধুসিক্ত ভিমিত

চেতনা দিয়ে তারা ভূগর্ভের প্রাণস্পন্দন শোনে, শোনে নরক-মাটির
 গর্ভস্থিত অসংখ্য বীজের প্রাৰ্থনা। পাখীরা ডাকে, হাওয়ায় গাছপালা
 ঝোলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সূর্যদেব আরো পশ্চিমে ঢলে পড়েন, রূপসী নদীর
 বুকে কাঁপে আকাশের প্রতিবিম্ব, বুনো হাঁসেরা তীরের পাশ ঘেঁষে জলে
 ভাসে। ওপারের শালবন থেকে হরিণের পাল নেমে আসে জলের ধারে।
 শ্রীরাগের আলাপ শুরু হয়। লাল ফুলেরা কান পেতে শোনে।
 পশ্চিমাকাশে চিতার আগুন জলে, তার মধ্যবর্তী বক্তবর্ণ সূর্যদেবকে
 সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের মত মনে হয় আর ভাসমান জলন্ত জাহাজের মত
 বক্ত-রঙীন মেঘতুপেরা আকাশপথে ভেসে বেড়ায়। শ্রীরাগের গম্ভীর
 স্বর যেন একটা যজ্ঞাগ্নিশিখার মত, ভস্মের মত পুতুলদের ওপরে নিড়ে
 যায়, ফুৎকারে ফুৎকারে উল্লসলোকে ঠেলে দেয়। সেখানে নীল শূণ্যতা
 ধূস্র হয়ে, অনন্ত সেই শূণ্যতার বুকে জলছে কোটি কোটি নক্ষত্রের
 আলো। তারা যেন আরো ওপরে ওঠে। শ্রীরাগের আলাপ যেন
 তাদের আত্মার ধ্বনিময় পিপাসা। আরো কিছু চাই, আরো
 কিছু চাই। এই অসীম, অনন্ত, জ্ঞানাভীত সৃষ্টিরহস্তের সীমান্তে
 পৌছতে হবে। কত দিন লাগবে? কোটি কোটি কোটি বৎসর?
 লাগুক। কিন্তু সীমান্ত-শেষের সেই উৎস-স্থলকে খুঁজে বের
 করতেই হবে। সেখানে আছে এক অনিবার্য নীল আগুনের
 জ্যোতির্ময় মূর্তি। তার স্বপ্ন থেকে গড়া এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। স্বপ্ন
 থেকে স্বপ্নান্তর। কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল আবার লয় পেল,
 কত গ্রহ উপগ্রহ বৃহদের মত শূণ্যতার সমুদ্রে ভেসে উঠল আর
 মিলিয়ে গেল, কত নক্ষত্রের জন্ম আর মৃত্যু হল! কিন্তু অচঞ্চল,
 অমলিন, অমর সেই আদি ও অন্তের নীল আগুন। পুতুলের ক্ষুদ্র প্রাণের
 মনিপদে সেই আগুনের আলো আছে বলেই তার এত পিপাসা।
 আনন্দ চাই, আনন্দ-লোকের উৎসে গিয়ে পৌছানো চাই। ওদিকে
 রূপসী নদীর ওপারে, শালবনের অন্তরালবর্তী ধূসর পর্বতশ্রেণীরও ওপারে

সূর্য্যদেব ডুবে যান, দিনেব নবনিকাশতন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদ-সমুদ্র-
 স্নাত চন্দ্রদেবকে দেখা যায় পূর্বাচলে, আকাশের বুক দেখা যায় সপ্তর্ষি
 ঋগলকে। দেখা যায় কালপুরুষ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল আর শুক্রতারাকে।
 আরো ক-ত নক্ষত্র। রাত হয়। ত্রীরাগের আলাপ শেষ হয়, ধোয়ার
 মত ধীরে ধীরে তার মূর্ছনা মিশিয়ে যায়।

তবু প্রহরী মাথা নাড়ে, উদাস কণ্ঠে তবু সে বলে, “ক্লান্ত,
 আমি বড় ক্লান্ত, আমার এই খণ্ড জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা আমাকে অবসন্ন
 করে তুলেছে—”

“শুক্র হও মূর্খ প্রহরী—প্রকৃতিস্থ হও—”

পুতুলেরা প্রহরীর জন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কি হল প্রহরীর? কেন
 সে এমন অভিযোগ করছে? পুতুলের জীবন তার কাছে সন্দেহের কারণ
 কেন? কেন তাকে সে খণ্ডকাব্য বলে মনে করছে? কি হল? প্রহরী
 কি অস্থস্থ হল? প্রহরী কি উন্মাদ হয়ে যাবে? মণিমাণিকা-বচিত ঘরের
 মাঝে হঠাৎ সঙ্গীতহীন স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে।

আর ঠিক সেই সময়ে, সোনার চাবি দিয়ে সোনার তালা খুলে, বুড়ো
 কারিগর রূপোর দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। তার হাতে একটা নতুন
 পুতুল।

পুতুলেরা সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, “আহ্নন শিল্পীরাজ, আহ্নন,
 উপবেশন করুন।”

বুড়ো কারিগর হাতের পুতুলটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিচित्र
 হেসে, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সে পুতুলদের ভাষণ বলে, “স্বখে থাকো—”

তারপর সে এককোণে বসে পড়ে, পুতুলগুলোর দিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে
 তাকিয়ে থাকে। অসংখ্য পুতুল আর তাদের প্রত্যেকটিকেই সে তৈরী
 করেছে, তৈরী করেছে তার সারাজীবন ধরে।

নতুন পুতুলকে অভ্যর্থনা জানায় অগ্ণাণ পুতুলেরা, বলে, “স্বাগতম্।
 হে নবজাতক, শুক্র আনন্দলোকের হে নবীন নাগরিক—তোমাকে

আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, মর জীবজগতের এই অমর কল্পলোকে তুমি আজ থেকে সগৌরবে ও সমানাধিকার নিয়ে বাস কর ।”

বুড়ো কারিগর সহাস্তে বলে, “কিন্তু তোমরা থামলে কেন ? তোমাদের নৃত্যগীত আবার আরম্ভ হোক—”

তখন কীতিমান গান শুরু করে—নটনারায়ণ রাগের গান । বাইরে রাত ঘনাচ্ছে, পুষ্প পুষ্প রহস্য এসে পৃথিবীকে আবৃত করছে । স্পন্দিত নক্ষত্রালোকের নীচে শান্ত পৃথিবী । প্রান্তরে গাছপালাবা কিমোচ্ছে, প্রজাপতি ও পাখীরা ঘুমোচ্ছে, মহান নিঃশব্দতার বুকে পরিণামগিনীর মুহূঃ স্বপ্নাঙ্গের মত কিঁ কিঁ পোকারা তান তুলেছে । মায়াচ্ছন্ন পৃথিবী ধ্যানমগ্না । ওদিকে রূপসী নদী একই ভাবে বয়ে চলেছে, নদীর বুকে নক্ষত্রদের প্রতিবিম্ব যেন তার নানা বাসনার প্রদীপের মত জ্বলছে ও কাঁপছে । ওপারের শালবনে অন্ধকার গাছতর, অগ্নি-নেত্র নৈশ প্রহরীদের চীৎকারে তা প্রতিধ্বনিত, ময়ূর ও মৃগযুগ্মের স্বপ্নে রহস্যময় ।

অংশুমান গানের তালে তালে ঢুলে ওঠে, বলে, “আগি গল্প বলব, তোমরা শুনবে ?”

পুতুলের মাথা নেড়ে সাহা দেয়, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনব—”

কীতিমান থামে । শ্রীমন্ত বীণার তারে নটমল্লারের আলাপ করে ।

অংশুমান গল্প বলা শুরু করে । সৌর-জগতের শেষ সীমান্তে যে পৃথিবীটা আছে সেখানকার একটি তরুণ ও একটি তরুণীর কথা তরুণ বাঁশী বাজাত, তরুণী ফুলের মালা তৈরী করত । পুণিমার এই রাতে তাদের দেখা হল, তারা ভালবাসল । প্রস্তুত বাধা এল, বিপত্তি এর সেই পৃথিবীতে বাস করা তাদের অসম্ভব হয়ে উঠল । তখন এ চন্দ্রহীন রাতে তারা সেই পৃথিবী থেকে বেরিয়ে পড়ল, ছাড়াপথের পা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তারা নক্ষত্রদেহ ধারণ করল, পাশাপাশি জলে জলতে আকাশের বাসিন্দা হয়ে নিজেদের প্রেমকে চিরন্তন করল অংশুমানের কথাটি ফুরায় ।

পুতুলেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করে বলে, “সাধু সাধু—তোমার গল্প
সত্যি বড় মনোরম অংশমান —”

তিমিরকান্তি অনেকক্ষণ ধরে নির্বাক ছিল, এবার সে বলে, “সত্যি
একটি মহৎ কাহিনী শোনালে অংশমান। প্রেম জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য
এবং তা ঐশ্বর্য বলেই তার শত্রু থাকে। কিন্তু কি যায় আসে? প্রেম
নিজের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করে নেবেই। কারণ সৃজনই তার ধর্ম।”

টিমি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, বেহালার তারের ওপর ছড়ি টানতে
টানতে সে বলে, “গান প্রিয় পুতুলেরা, আমার যন্ত্রের হৃদয় মথিত করে
তোমাদের আমি প্রেমের গান শোনাব।”

টিমি বাজাতে শুরু করে। প্রেম আত্মার পিপাসা। প্রেমই শ্রেষ্ঠ
। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রেমের পিপাসায় অধীর। আকাশ ভালবাসে
ঠিক। পৃথিবী ভালবাসে সূর্য আর চন্দ্রকে। অরণ্যের পশু, জলচর
আর নভোচরী পাখী ভালবাসে পরস্পরকে। আর মানুষ ভালবাসে
ক। পুরুষ ভালবাসে নারীকে। পিপাসা। সৌন্দর্যের পিপাসা,
চরম অনুভূতির পিপাসা। যুগ-যুগান্তের ইতিহাস শুধু ভালবাসার
। আর তাতে বাপা পাওয়ার ইতিহাস। কদমতলায় স্নানরী অভিসারিক।
চৈরকাল গে-পদালকের বংশীধ্বনি শুনে মুগ্ধ হয়, চিরকাল প্রেমিক
পুরুষ ক্রুশবদ্ধ হয়েও ভালবাসে, মানুষকে ভালবেসে রাজৈশ্বর্য ত্যাগ
করে ভিখারী হয়, ভালবাসতে গিয়ে অগ্নিশায়কের, আঘাতে মৃত্যুবরণ
করে। দেহপঙ্কের রক্তপদ্ম, অস্তরের একটি মাত্র প্রদীপশিখা এই
ভালবাসা।

টিমি বাজিয়ে চলে। রাত গভীর, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে পুতুলেরা
বাজনা শোনে। বহুদূরে কোথায় যেন গুঁড়ো গুঁড়ো শব্দ পড়ছে, বড়
বড় ওক গাছগুলো যেন অস্ত্রের মত তুমারে গা ঢেকে আছে, আর বরফ-
জমা পর্বতশৃঙ্গ যেন আকাশের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। ভোরের
আলোতে স্কাইলার্ক গান গায়, রবিন পাখী কিচিরমিচির করে,

গোল্ড ফিঞ্চেরা আকাশে ডিগবাজী খায়। শান্ত-সলিলা নদীর তীরে, নিভৃত নিকুঞ্জে বসে প্রেমিক যুগল পরস্পরকে অন্তর-পদ্মের রক্তবানী শোনায়। ওয়াইল্ড বেরীর গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে নাইটিংগেলের ডাক। বিকেলের পড়ন্ত রোদে কোথায় যেন গ্রাম্য অর্কেস্ট্রা বাজে এবং যুগলে নাচে সবাই। নৃত্যের তালে তালে তাদের হৃদয় কাঁপে, চোখের নীলাভ তারা চকচক করে। আর বহুদূরে কাঁপে নীল সমুদ্রের বিরাট হৃদয়—ঝড় আগতপ্রায়। ফুলে ফেঁপে ওঠে সমুদ্র, উত্তেজিত সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে গর্জে ওঠে সে আর বড় বড় রোলারের মত গড়িয়ে যায় তার কামনার তরঙ্গ।

পুতুলেরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মুহূর্তে বারংবার বলে, “অপূর্ব, তোমার বাজনা সার্থক টিমথি—মন্ত্রের এই গভীর ভাষাকে সব চেয়ে গভীরভাবে তুমিই প্রকাশ করেছ, তুমি বত্ত।”

টিমথি থামে না, বাজিয়েই চলে। তখন বাজনার তালে তালে উঠে ঝাঁড়ায় মারিয়ানা।

পুতুলেরা সোৎসাহে বলে, “নাচো মারিয়ানা” আমরা তোমার নাচ দেখব।”

মারিয়ানা নাচতে শুরু করে। টিমথির বাজনার স্বর বদলে যায়। পার্বত্য ঝরণার কলকল আওয়াজ শোনা যায়। মারিয়ানা নাচে। সোনালী রেশমের মত তার মাথার চুল, ডাগর ডাগর চোখের তারাতে তার আকাশের নীলিমা। (আপেলের মত রক্তিম তার গাল, লাল পদ্মের পাপড়ির মত মধুময় তার দুটো রসালো ঠাট। তহীদেহী মারিয়ানার যুগল স্তন যেন দুটি খেত পদ্ম, ক্ষীণ কটিন নীচে তার স্তন্য শ্রোণীদেশ আর দুটি ক্ষটিকতন্ডের মত তার যুগল উরু।) সমুদ্রোত্তীর্ণ দেবী ভেনাসের মত সে, উর্বশীর মত। মারিয়ানা নাচে। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, কোকিল ডাকে, সূর্যালোকের স্পর্শে তুষার গলে। পৃথিবী বিচित्र। যুগশাবক মুগ্ধ হয় পৃথিবীকে দেখে, অবাক্ত আনন্দধনি

করে সে আলোর উৎসের দিকে লাক দেয়। কত বর্ণের পাখী ডাকে।
সোনালী ফসলে ভরা ক্ষেতের কোথায় যেন রাখাল ছেলে গান গায়।
মুহুরে কথা বলে প্রণয়ীযুগল, রাজহাঁসের। পুকুরের বুকে সঁতার কাটে
আর গ্রাম্যপথে ধাবমান ছুরন্ত ছেলেমেয়েরা খিলখিল করে হাসে।
ছন্দোময় পৃথিবী। নটরাজের নৃত্যের তালে তাল মিলিয়েছে সমস্ত পৃথিবী।

নৃত্য শেষ হয়।

পুতুলেরা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, “অপূর্ব, আমাদের সুন্দরী মারিয়ানার
নৃত্য অপূর্ব।”

অমৃতমান বলে ওঠে, “ভালবাসো পুতুলেরা, ভালোবাসাই আমাদের
ধর্ম।”

হঠাৎ বুড়ো কারিগর কথা বলে। সবাই তাকায় তার দিকে, চূপ
হয়ে যায়, সশ্রদ্ধভাবে শোনে তার কথা।

বিড়বিড় করে বলে বুড়ো, “ভালোবাসা সবার ধর্ম—সবার। কিন্তু
মানুষেরা তা বোঝে না, তারা হিংসায় উন্নত, হিংসাই তাদের
ধর্ম।”

পুতুলেরা ক্ষণকালের জ্ঞান স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষদের বিষয়ে তাদের
গভীর শঙ্কা। মানুষদের পৃথিবীতে যে দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও বেদনা
আছে তাকে তারা ভয় পায়। তাদের অসিদ্ধারী প্রহরী তো তার
জ্ঞানই সর্বদা জাগ্রত হয়ে আছে। মানুষ বড় দুর্বোধ্য জীব—পঙ্কোষিত
অ্যাকাশমুখী পদ্ম নয় তাদের জীবন, তাদের জীবন পঙ্কমুখী। পুতুলেরা
জানে যে বুড়ো কারিগরও মানুষ। কিন্তু মানুষেরা সবাই তো বুড়ো
কারিগর নয়। আর বুড়ো কারিগর মানুষ হলেই বা, সে শিল্পী, সে
আনন্দলোকের বাসিন্দা, সে রস-পিপাসু। তার সঙ্গে তো পুতুলদের
প্রভেদ নেই।

তাই কীতিমান বলে, “শিল্পীরাজ, মানুষেরা বড় দুর্বোধ্য জীব—বড়
নিরুপ্ত, তাদের ধর্মের খোঁজে আমাদের দরকার নেই।”

বুড়ো কারিগর মুহূ হাঙ্গ, ধীরে ধীরে গভীর কণ্ঠে বলে, “কিন্তু মানুষই যে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব—”

পুতুলেরা গুঞ্জনধ্বনি তোলে, তাদের চোখে মুখে নিঃশব্দ প্রতিবাদের ভাষা ফুটে ওঠে।

অংশুমান উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে, “মানুষ কি আমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জীব?”

প্রশান্ত হেসে বুড়ো কারিগর জবাব দেয়, “না।”

“তবে?”

“তোমরা মানুষের আনন্দময় জীবনের মূর্তি। যেদিন মানুষেরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে, সেদিন তারা তোমাদের মতই আনন্দময় জীবন যাপন করবে। তোমরা মানুষের কল্লোলকের জীব—আনন্দময় পুতুল—প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে মানুষেরাও তোমাদের মত স্থপী হবে—”

পুতুলেরা গর্ববোধ করে, নিজেদের দুর্লভ জীবন নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তারা মানুষের কল্লোলকের জীব!

দার্শনিক অবাধ হয়ে প্রশ্ন করে, “তাহলে মানুষ সেই সাধনা করে না কেন?”

আশ্চিকালের বস্ত্রবুড়োর মত দেখতে সেই বুড়ো কারিগর মাথা নাড়ে, দুঃখিমিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, “তারা হিংসায় উন্মত্ত, অন্ধ হয়ে গেছে—তারা পরস্পরকে ভালোবাসে না।”

“শিল্পীরাজ—”

বুড়ো কারিগর মাথা ঘুরায়, দেখে যে তার ডান দিকে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অসিধারী গ্রহরী। তার চোখে মুখে গভীর ঐশ্বর্য্য জলজল করছে। কখন যে সে পেছন থেকে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে তা জানাই যায়নি। সেই গ্রহরীই ডাকছে।

“বল গ্রহরী—”

“আপনি মানুষদের গল্প বলুন—আমরা শুনব।”

পুতুলেরা চুপ করে থাকে। মানুষের বিষয়ে তাদের শুনবার আগ্রহ আছে, আবার ভয়ও আছে। কে জানে বাবা, কি সব ভয়াবহ কথা শুনতে হবে!

বুড়ো কারিগর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি মেলে গ্রহরীর দিকে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, “মানুষের কথা শুনতে তোমার ভয় করবে না গ্রহরী?”

গ্রহরী সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বুক ফুলিয়ে বলে, “ভয়! হঁঃ—আমার হাতে তলোয়ার আছে না?”

“তাহলে তুমি শুনবেই?”

“শুনব, শুনব—আপনি বলুন কারিগর—”

“তাহলে শোন—”

বুড়ো কারিগর মানুষদের কথা বলতে আরম্ভ করে। মানুষ-প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ সম্ভান। মানুষ পশুর কল্পনা—একরকমের উন্নত পশু। মানুষ যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বিচিত্র। নগ্ন, অসহায় অবস্থা থেকে সে আজকের সভ্য মানুষ হয়েছে। অন্ধ প্রকৃতির নিম্ন মনুষ্যের চাকাকে সে বাধা দিয়েছে, প্রকৃতির হাওয়ার থেকে সে শক্তি আহরণ করেছে। মানুষ পাহাড় ভাঙে, অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন করে সমুদ্রকে শাসন করে, পানীয় মত পান্য মেলে আকাশে ওড়ে, সহস্র মাইল দূরবর্তী মানুষের সঙ্গে কথা বলে। নক্ষত্রলোকের রহস্য উদঘাটন করতে চায় মানুষ, গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে মিতালি পাতাতে চায়, বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য ব্যাধির জীবাণুদের সে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখে। মানুষ দ্বিধিজয়ী। মানুষ বিশ্বকর্মা কিন্তু ক’জন? ক’জন মানুষ এই মানুষের পরিচয় দিতে পারে? মাত্র কয়েকজন মানুষই মানব সভ্যতাকে আজকের চেহারায় রূপান্তরিত করেছে। বাকী সব কারা? বাকী সব মানুষ নয়। বাকী সব কোটা কোটা মানুষেরা সবাই ছদ্মবেশী, পশু। তাই সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, নগরীর পর নগরী সমাধিস্থ হয়, ককালের স্তূপে যুগান্ত হয়। স্বার্থ,

লোভ, হিংসা, ঘেঁষ, লালশা—মল্কার জগতের সব সর্পাকুর দানবেরা তাদের অন্তরের বাসিন্দা। তাই মুষ্টিমেয়ের সাধনা ব্যাহত হয়, ব্যর্থ হয়। তাই অসারোহী দল দেশ আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে, রক্তশ্রোতে মাটি ভিজ়ে ওঠে। তাই আগ্নেয় গোলার ঘায়ে অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে, মানুষের গলিত রক্তমাংসে বাতাস বিষাক্ত হয়। তাই একদল চায় আর একদলকে শোষণ করতে। তাই মুষ্টিমেয় মানুষেরা কোটি কোটি মানুষকে পদানত রাখে, নির্ধাতিত করে, শোষণে পেষণে বঞ্চিত ও মূৰ্খ করে। একই ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস। যুগে যুগে, এক আধজন যারা সভ্যতাকে এক এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে, সেই সব দৈত্যের মত মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে, নির্ভয়ে ঘোষণা করেছে—‘ভালোবাসো, পরস্পরকে ভালোবাসো, মানুষেরা, ভালোবাসে সুখী হও, শান্তি পায়।’ কিন্তু কেউ শোনেনি তাদের কথা, সেই সব মহৎ মানুষদের তারা কটক-মুকুটে ভূষিত করে কীলক-বিদ্ধ করেছে, বিষপান করিয়ে তাদের মহত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, বন্দুক আর গুলি দিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করেছে এবং মানুষ যে এখনো পশু তাই প্রমাণ করেছে। একই ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু লোভ, হিংসা, লুণ্ঠন, ধ্বংস, হত্যা, হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্র-যুগেও মানুষের মনে প্রকৃত যুগ।

বুড়ো কারিগর থামে, উত্তেজনায হাঁপাতে থাকে সে।

পুতুলেরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, দুঃ দুঃ কেঁপেছিল তাদের কোমল হৃদয়, বুড়ো থামতেই তারা বলে, “থামুন শিল্পীবাজ থামুন, হুঁতগা মানুষদের বিবরণ শুনিye আর আপনি আমাদের শঙ্কিত করবেন না।”

কিন্তু প্রতরী ভয় পায় না, আগুনের মত জ্বলে তার দুই চোখ, আরো কাছে এসে সে প্রশ্ন করে, “কিন্তু চিরকাল কি এমনি চলবে কারিগর, মানুষ কি আর পুতুল হতে পারবে না?”

বুড়ো কারিগর মেঘের মত গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, “পারবে, নিশ্চয় পারবে। মৃতের স্তূপ থেকে অপরাধের প্রাণের অঙ্কুর নাথা তুলবে,

কোটি কোটি নির্ধাত মানুষ হাঠাৎ একদিন ধুমকেতুর মত করাল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে। শক্ত হাতের নিদারুণ খড়্গ দিয়ে তারা মানবতা আর সভ্যতার শত্রুদের নির্মূল করবে। তখনই মানুষদের জীবনে পুতুলদের আনন্দময় জীবন এসে ধরা দেবে— প্রেমের দ্বারা সেই জীবনকে তারা তখন আরো আনন্দময় করে তুলবে। আর মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, ফুলকে, ফলকে, প্রকৃতিকে—অথও শান্তির শ্রোতে জীবন ও ধরিত্রী তখন শুষ্ক ও স্নাত হবে।”

বুড়ো কারিগর থামে, চোখ বুজে কি যেন সে ভাবতে থাকে। বোধ হয় তার মূর্তিত চোখের সামনে ভবিষ্যতের এক যর্গোজ্জ্বল জীবন-চিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। সেই মহান চিত্রের বিচিত্র রসের গভীরতায় সে যেন তখন নিমজ্জিত হয়ে যায়।

অসিধারী গ্রহরী আরো কাছে আসে, তলোয়ারের হাতলটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরে হঠাৎ সে জলন্ত দৃষ্টি মেলে উচ্চারণ করে, “আমি মানুষ হতে চাই—”

পুতুলেরা গর্জে উঠে, “গ্রহরী, শুক হও—”

গ্রহরী থামে না। সে বলে, “হ্যাঁ, আমি মানুষ হতে চাই। মানুষই পৃথিবীর সব চেয়ে মহৎ জীব, দুঃখ ও বেদনার মহৎ আগুনে তার জীবন পরিশুদ্ধ, চিন্তায় ও শ্রমে তার জীবন অপরূপ—”

“গ্রহরী, প্রকৃতিস্থ হও—”

“আমি মানুষ হতে চাই, আমার এই তলোয়ার দিয়ে আমি মানবতার শত্রুদের ধ্বংস করব, তাদের পুতুলের মত স্কন্দর হতে সহায়তা করব—”

“গ্রহরী, তুমি উন্মাদ—”

“আমি মানুষ হতে চাই, কারণ তখনই পুতুলের জীবন সার্থক মনে হবে। কারিগর, আমাকে মানুষ করে দিন—”

বুড়ো কারিগর অবাক হয়ে চোখ মেলে, তার দৃষ্টিতে প্রশংসা ও স্নেহ। প্রশান্ত হাসিতে ভরে যায় তার মুখ, শিশুর মত সরল হয়ে ওঠে,

মুজুক্কে সে বলে, “প্রহরী, তুমি চমৎকার পুতুল। আমি জানি যে তুমি পুতুল হতে চাইবেই কারণ জীবনের এক বেদনা-বিহ্বল মুহূর্তে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম। সেই মুহূর্তে বেদনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম বলেই তো তোমার হাতে ঐ তলোয়ার। কিন্তু আমাকে তুমি মিথ্যে অহুৰোধ করছ, আমি তো মানুষ তৈরী করতে পারি না—”

“পারেন না! কেন? কেন?” হতাশায় রুদ্ধ হয়ে যায় প্রহরীর কণ্ঠ।

বুড়ো কারিগর মাথা নাড়ে, “পারি না। মানুষ প্রকৃতির সন্তান—
—প্রকৃতিই তাকে তৈরী করে।”

প্রহরী স্বক্ হয়ে যায়। হতাশায় মুক হয়ে যায় সে। বিবর্ণ মুখে নিশ্চিন্ত দৃষ্টি মেলে সে একবার বুড়ো কারিগরের দিকে তাকায় তারপরে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

পুতুলেরা আশ্বস্ত হয়, হাঁক ছেড়ে বাঁচে, হাসাহাসি করে বলে, “বাঁচা গেছে, প্রহরীর প্রলাপ বন্ধ হয়েছে।”

আবার গান আরম্ভ হয়, বীণা বজ্রত হয়, নৃত্যরত পদযুগলের তালে তালে পাগোয়ারের ধ্বনি ওঠে। সময় কাটে। বাইরে কুহকিনী রাতের গান শুনে তন্মোহিত পৃথিবী স্বপ্ন দেখে, পাহাড়েরা মাথা নীচু করে কুয়াসার চাবরে মুড়ি দেয়, আর রূপসী নদী ঘুমন্ত রূপসীর মত মুহু শব্দ করে। আকাশ অতঙ্গ, তার অসংখ্য নক্ষত্র-চক্ষুর স্পন্দনে ধূম বিতাড়িত আর ক্ষীরোদ-সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদের অন্তর্ভুক্তাবলম্বী। গভীর, মৌন প্রশান্তি। ধ্যানমগ্ন চরাচর। অগণ্ড নিঃশব্দতার অভল ধ্বংস, গভীর জলোথিত বিরাট বৃষ্টির মত এক বিচিত্র অনাহত ধ্বনি ওঠে। মহান বিশ্বের গান। কীর্তিমানও গান গায়। বেহাগের সুরে রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হয়। সোহিনী ঘোষণা করে রাত্রি চতুর্থ প্রহরের। রাত কাটে, রাত কাটে। রহস্যময়ী প্রকৃতির সৃষ্টি-মুহূর্তে-ভরা মায়ায় রাত কেটে যায়। রাত ও দিনের সন্ধিস্থলে শ্রীমন্তের সপ্ততন্ত্রী বীণা গায় ললিতা রাগিনী। রাত্রি

শেষ ভাই। ক্রত লয়ে ঝঞ্ঝার ওঠে। চরাচর-বাপী রাতের জ্বালা
গলে গলে জ্বাকুসুম-সকাশ সূর্যদেবের জন্ম দেয়।

বুড়ে কারিগর উঠে দাঁড়ায় তখন । তার যাবার সময় হয়েছে ।

পুতুলেরা সম্ভ্রান্তভাবে রাষ্ট্র করে দেয় তাকে, বড়ো গুপোয়। হঠাৎ
সে প্রহরীর পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিষম, গম্ভীর সেই অসিধারী
প্রহরী, হতাশায় ম্লানমুখ।

বুড়ো কারিগর তার ওপর ঝুকে পড়ে, নিম্নকণ্ঠে বলে, “প্রকৃতিই ইচ্ছা পূরণ করে গ্রহরী, তোমার হতাশা কেন? ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন হয় সব কিছু। কোন একদিন, কোন এক আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে তুমি হরত হঠাৎ মানুষ্য হয়ে যাবে—কে জানে?”

বড়ো কারিগর চলে যায়। রূপোর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়, সোনার তালিতে সোনার চাবি ঘোরানোর শব্দটা উঠে মিলিয়ে যায়।

প্রহরীর মুখ আশায় বলমল করে ওঠে, নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় তার পমনীতে, প্রাত্যহিক কর্তব্য সমাপনের জন্ত সে এবার চৌকিয়ে ওঠে, বলে, “ভাইসব জাগো।” — দুঃখিনী রাত চলে গেছে, ভোর হয়েছে—এ—এ—

সেদিন থেকে প্রহরী ভারী অশ্রুমনস্ক হয়ে থাকে। নিঃশব্দে, নিতুলভাবে সে তার কর্তব্য করে যায় তবু সে অশ্রুমনস্ক থাকে। আর পুতুলেরা তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। 'কি হল প্রহরী? বড়ো কারিগরের কথায় কি তার মনে প্রত্যয় জন্মায়নি? অত নিঃশব্দ কেন সে?'

প্রহরী নির্বাক হয়ে থাকে, একটিও কথা বলে না সে। ভাবেন।

নাগে না তার। একটি মাত্র ইচ্ছায় তার অন্তর ফুলে ওঠে, একটিমাত্র কামনার শিখায় তার অন্তর পুড়তে থাকে। সে মাহুষ হবে, তাকে মাহুষ হতেই হবে। বুড়ো কারিগরের কাছে শোনা মাহুষদের কাহিনী শ্রবণ করে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে মাহুষ হবে। মণিমাণিকা-খচিত এই অপরূপ কক্ষে, এই আনন্দ-বন্তা-প্রাবৃত স্রবের পৃথিবীতে তার ভালো লাগে না, বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন বোধ করে সে। হাতের তলোয়ারে তার মরচে ধরেছে, তার সব বিশ্বাস মনে হয়। মাহুষের বলিষ্ঠ জীবন কি লোভনীয়! দুঃখে, বেদনায়, প্রেমে ও কর্কে, চিন্তায় ও স্বপ্নে, ঘাত প্রতিঘাতে বহু-বিচিত্র মাহুষের জীবন কি অপরূপ! সেই জীবনে যখন পুতুলের জীবন এসে মিশবে তখন ইন্দ্রধনুর মত অপরূপ হবে সেই জীবন। হ্যাঁ, সে মাহুষ হবে। লোভ, নীচতা, শঠতা, স্বার্থ, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুঃখ, পরাদীনতা, শোষণ ও নিষাতন—
—অঙ্ককার জগতের সেই সব সপ-কুর দানবদের সে একে একে অপসারিত করবে।

সময় কাটে, প্রহর কাটে। প্রাস্তরের বৃকে পাখীরা ডাকে, পজাপতিরা শুড়ে, ফুল কোটে আর গাছপালাদের মর্মরধ্বনি ওঠে। একইভাবে বয়ে যায় রূপসী নদী, বয়ে যায় আর গান গায়। তার হীরকচূর্ণের মত উজ্জল বালুকণা মেশানো তীরভূমির ওপর নিরুদ্দেশযাত্রী বাঘাবর বুনো হাঁসেরা এসে বিশ্রাম করে। ওপারের শালবন দীর্ঘশ্বাস মুগমুগ ও ময়ূরেরা সোজাসে সময় কাটায়। আকাশে উদয়াস্তের পথ পরিক্রমা করেন সূর্যদেব ও চন্দ্রদেব, অনিবাণ ইন্দ্ৰজাম্বিনীর মত জ্বলে নক্ষত্রেরা, হংসপক্ষ-তুলা শুভ্র মেঘপৃষ্ঠ উড়ে যায় দূরদূরান্তের দেশে। আর, মণিমাণিকাখচিত মরের মাঝে পুতুলেরা নাচে, গায়, গল্প শোনে ও ছবি দেখে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর আলাপে ও মুছনায় সারা ঘর জমজমাট হয়ে ওঠে। তবু ভালো লাগে না প্রহরীর। নিঃশব্দে কর্তব্য সারে সে, পুতুলদের যখন বেদনা আচ্ছন্ন করতে চায় তখন সে

অসি আফালন করে বাধা দেয়, সবাইকে সতর্ক করে। কিন্তু সে নেহাৎই কর্তব্য। সব কিছুই বিশ্বাস লাগে তার। শুধু একটিমাত্র ইচ্ছা তার অন্তরে ভারী হয়ে ওঠে। সে মানুষ হবে। সময় কাটে, দিন কাটে, শুধু একটিমাত্র কামনার শিখা তাকে দহন করতে থাকে। বৃড়ো কারিগরের শেষ কথাগুলোকে স্মরণ করে সে প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করে—
সে মানুষ হবে, মানুষ হবে, মানুষ হবে—

দিন কাটে। দিনের পর দিন কেটে যায়।



হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড হল।

পুতুলেরা দেখল যে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে উঠল। ক্রমে ক্রমের মত কালো মেঘের ছায়ায় আকাশ মিলিয়ে গেল আর মেঘের ডাক গড়িয়ে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। যেন ঢেউগেলানো লোহার পাতের ওপর দিয়ে এক অদৃশ্য দৈত্যারাভ তার রথের চাকা চালিয়ে গেল। শালবন, রূপসী নদী আর এপারের প্রান্তরে নামল থমথমে ভাব, একটা নিরুদ্দ-নিঃশ্বাস প্রতীক্ষা। তখন সব মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ সূর্যদেব মেঘাবৃত হয়ে গেছেন। পাখীরা উত্তেজিত চীৎকার করতে করতে গাছের ডালে লাফালাফি করছে, আর শূন্যপথ বেয়ে দ্রুত পাক খেতে খেতে চিলেরা নেমে আসছে।

পুতুলেরা ভয় গেল, দম্বিলিত কণ্ঠে তারা ধ্বনি তুলল, “প্রহরী, সতর্ক হও—ঝড় আসছে”—

কর্তব্যপরায়ণ প্রহরী তার তলোনারকে তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, নিভীক কণ্ঠে জবাব দিল, “তোমরা নির্ভয়ে থাকো ভাইসব, আমি আছি-ই-ই—”

বলতে বলতেই বায়ুকোণের দিক থেকে একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ শোনা গেল। অতি মৃদু। মুহূর্তে তা প্রবল হল, প্রবলতর হল, প্রবলতম হয়ে আছড়ে পড়ল পুতুলদের পৃথিবীতে। রূপকথার রাজপুত্র যখন প্রাণ-হীনরকে টিপে মেরেছিল তখন হাজার হাজার রাক্ষসীরা যেমন গৌঁ গৌঁ শব্দে আতনাদ করেছিল ঠিক তেমনি। বোবা কান্নার মত একটানা শব্দ। গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়তে লাগল, ছোটো অদৃশ্য হাতা দিয়ে কে যেন সব কিছু উলটে-পালটে দিতে চাইল।

পুতুলেরা আত কোলাহল তুলল, “প্রহরী—বাঁচাও, রক্ষা করো—”

লোহার মূর্তির মত শব্দ হয়ে উঠল প্রহরী, বলল, “ভয় নেই, বাড় আমাদের শত্রু নয়—”

বাড় বাড়ল। রূপসী নদীর জলে বড় বড় ঢেউ উঠল, তার শাস্ত্র মূর্তি ^{প্রহরী} বদলে গেল। বাড়কে প্রতিরোধ করার জন্য সে যেন নাগিনী মূর্তি ধারণ করে গজাতে লাগল। ওপারের শালবন রূপদ গান শুরু করল। মৃগকুল ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ময়ূরেরা পেখন তুলে নাচতে শুরু করল আর বগু দ্বন্দ্বভী পর্বতশ্রেণী যেন বাত্মমুহুরলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই অসিধারী প্রহরী এক বিচিত্র ও পোনাকেকর অদ্ভুতভূতিকে বারংবার কাপতে লাগল।

পুতুলেরা চীৎকার করে বলল, “গবাক্ষ-পথ পাহারা দিয়ে প্রহরী—সাবধান—”

প্রহরী মৃদুকণ্ঠে বলল, “তোমরা শাস্ত্র হও, অ’মি আছি-ই-ই—”

মেঘের ডাক অব্যাহত শোনা গেল। গুরু গুরু গুরু—ঢেউ খেলানো লোহার পাতের ওপর দৈত্যরাজের রথের চাকা গড়িয়ে বাচ্ছে। আর একটানা শৌ শৌ গৌঁ গৌঁ শব্দ। প্রহরী জানালায় ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াল, বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বিশ্বয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু কী আশ্চর্য রূপবতী! আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে—প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আর এই প্রকৃতিকে

বশ মানাতে চাইছে মানুষ! সে মানুষ হবে, সে মানুষ হবেই, মানুষ তাকে হতেই হবে। দু'চোখ জ্বলতে থাকে তার, নাকটা ফুলে ওঠে, উত্তেজনায় বুকটা তার বারংবার ওঠানামা করে।

হঠাৎ কি যেন হল। আকাশে ফাটল ধরিয়ে বারংবার বিদ্যুৎ চমকাল। নীল বিদ্যুতের প্রখর আলোতে সব কিছু কলসে উঠল। সে কী তীব্র আলো! গ্রহরীর চোখে ধাঁধা লাগল, তার মাথা ঘুরে উঠল, একটা বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ যেন তার সারা দেহ আর পায়ের নীচেকার মাটিকে কাঁপিয়ে তুলল। তার দু' চোখের সামনে পুঙ্খ পুঙ্খ কালে মোঘের মত অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল তার চেতনা। বিস্মৃতি। আর সেই বিস্মৃতির মাঝে একটা চাপা যন্ত্রণা, প্রতি অঙ্গে এক সূতীব্র বেদনা।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেল গ্রহরী, দেখল যে বাড় একইভাবে বইছে, নুফলপারে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর বৃষ্টির ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে গাছপালার মর্মরধ্বনি মিশে গেছে। বৃষ্টিতে পৃথিবী যেন সিক্তবসনা স্নানরীর মত শুভ্র, পবিত্র। হঠাৎ চমকে উঠল গ্রহরী, নিজের দিকে তাকিয়ে সে বিশ্বয়ে ও আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। নিজের হাত পা, নাক চোখ, বুক পিঠ, সব সে হাংড়ে হাংড়ে দেখল, অশুভব করল। তার অচৈতন্য অবস্থায় প্রকৃতি তার ইচ্ছাপূরণ করেছে! মানুষ, সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে! কি স্বচ্ছ তার দৃষ্টি, কি প্রখর তার অশুভূতি, কি নিবিড় তার আনন্দ! সে মানুষ হয়েছে! হাতের নখাগ্রভাণ থেকে পায়ের নখাগ্র পর্যন্ত এক বৈজ্ঞানিক চেতনার স্রোত। সে মানুষ! পেশীতে পেশীতে, পেশল মাংসের আড়ালে, লাভাশ্রোতের মত ছরস্তু ও উষ্ণ শক্তি।
আঃ—সে মানুষ—

কথা বলতে চাইল সে কিন্তু পারল না, শুধু তার কণ্ঠ থেকে একটা বিচিত্র আনন্দধ্বনি নিঃসৃত হল। পুতুলেরা চমকে উঠল,

তার দিকে তাকাতেই তাদের চোখের তারায় জ্বাস ঘনাল।
এ কে? কে?

ভয়ার্ত কোলাহল তুলল তারা, “মাছুষ! মাছুষ! সাবধান হও—”
প্রহরী হাসল। পুতুলেরা ভয় পেয়েছে। তাদের ভয় দূর করার
জন্য সে কিছু বলতে গেল কিন্তু পারল না। পুতুলের তলোয়ারটা তার
হাতে এখন একটা ছুরির মত দেখাচ্ছিল, সেটাকে কেলে দিয়ে সে
সহাস্ত্রে পুতুলদের দিকে এগিয়ে গেল।

পুতুলেরা আর্তনাদ করে ডাকল, “প্রহরী—প্রহরী—প্রহরী—”
কিন্তু কোথায় প্রহরী? পুতুল প্রহরী তো ঘরে নেই। মাছুষ
প্রহরীকেই বা তারা চিনবে কেন?

“প্রহরী, তুমি কোথায়?”

প্রহরী আবার কথা বলতে গিয়ে যখন পারল না তখন সে থামল।
পুতুলেরা তাকে চিনবে না, তাকে দেখে তারা ভয় পাচ্ছে, অতএব আর
এখানে থাকার দরকার নেই। তা ছাড়া এখানে তো আর কাজ
নেই। তার কাজ তো এখন মাছুষের পৃথিবীতে।

রূপোর দরজা বন্ধ, তাই সে জানালার ওপরে উঠল, পুতুলদের
দিকে ফিরে তাকাল। শূন্য একটা বেদনা বোধ করল সে, পুতুলদের
জন্য মমতা বোধ করল। কিন্তু না, ভুগ কেন? আবার সে ফিরে
আসবে, মাছুষের জগতের সঙ্গে পুতুলের জগতের সেতু হবে সে। তা ছাড়া
পেছনে তাকানো তো মাছুষের ধর্ম নয়। তার ধর্ম এগিয়ে চলা।

হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে জানালার ঠিক বাইরে লাফ দিল।
মাটিতে পা দিতেই সে আর একবার পুতুলদের আর্তনাদ শুনল।
পুতুলেরা প্রহরীকে ডাকছে।

“প্রহরী, তুমি কোথায়, কোথায়?”

প্রহরী হাসল, মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সোজা হয়ে
সে পা বাড়াল। তরঙ্গায়িত প্রাস্তরের ওপর দিয়ে সে ঝড়ের ধাক্কা ঠেলে

এগোতে লাগল। আশ্চর্য একটা মন্দির অস্থূতিতে তার দেহ গরম হয়ে উঠল। আঃ—মাহুষের জীবন কী প্রখর ও তীব্র !

এগিয়ে চলল প্রহরী।

পায়ের নীচে ভিজ়ে মাটির কি আশ্চর্য স্পর্শ ! ঝুটিধারার আঘাত কি অদ্ভুত !

কিন্তু আর চলা যায় না। ঝড়ের বেগ প্রবল। শুধু তাই নয়, ঝড়ের বেগ যেন আরো বাড়ছে। গুম্ গুম্ গুম্ একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বাতাসে। হঠাৎ তা আরো বাড়ল, বাধ-ভাঙ্গা বজ্রার জলের মত প্রবল শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়া হঠাৎ প্রহরীকে শুকনো পাতার মত শূণ্ণে তুলল, তারপর আঘাতে আঘাতে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। মাটিতে নামবার চেষ্টা করল সে কিন্তু পারলনা না, অসহায় ঝড়কুটোর মত সে বাতাসের মুখে উড়ে চলল।

দূরে—দূরে—আরো দূরে—

বহুদূরে উড়ে গেল প্রহরী। দিগন্তকে অতিক্রম করে সে একটা ঝাড়া জমির ওপরে গিয়ে আটকে গেল, তাকিয়ে দেখল যে সেটা একটা পাহাড়ের চূড়ো, তার ওপারে গভীর ও অতলস্পর্শী খাদ। নিজেকে নামলে সে নীচে নেমে যেতে চাইল কিন্তু প্রকৃতি তাকে রেহাই দিল না। বজ্র একটা পশুর মত আবার তাকে প্রমত্ত বাতাস এসে ঠেলা দিল আর সে পাহাড়ের চূড়ো থেকে ওপারের অতলস্পর্শী খাদের দিকে পড়তে লাগল।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! পর্বতশৃঙ্গের ওপিঠের সেই শূণ্যতার মধ্যে বাতাস নেই, নেই কোন আলোড়ন ! সেখানে তার পতনের বেগও স্তম্ভীভূত হল। থমথমে একটা গুরুভার আবহাওয়া তার চেতনাকে

ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ও স্তিমিত করে তুলল। সর্বাঙ্গ প্রায় অবশ হয়ে এল তার, শুধু তার অর্ধ-নিম্নীলিত চোখের সামনেকার শূণ্যতাকে সে দেখতে লাগল। আর নীচে গড়তে লাগল সে—নীচে, আরো নীচে, আরো নীচে—

হঠাৎ যেন ইলেক্ট্রাল ঘটতে লাগল তার চোখের সামনে। প্রহরী কিছু বুঝল না, নির্বাক দৃষ্টি মেলে অসহায় ভঙ্গীতে সে শুধু দেখতেই লাগল।

বহুদূরে যেন একটা বিরাটকায় পটহ নিনাদিত হল। গন্তীর ও চেতনা বিলুপ্তকারী একটা শব্দ যেন সেই শূণ্যতার মাঝে গড়িয়ে যেতে যেতে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের স্পর্শ পাওয়া গেল। শূণ্যতা মথিত হয়ে একটা প্রদীপ্ত চকল বাষ্পের সৃষ্টি হল। শূণ্যতায় উদ্ভাপ বোধ হল। সেই অদৃশ্য পটহ-ধ্বনির তালে তালে যেন বাষ্প-মণ্ডলীর মধ্যে তেজ সঞ্চারিত হল। পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগল বাষ্পকণারা। মহাকর্ষের টানে স্থানে স্থানে বাষ্প-পরমাণুর ভীড় জমতে লাগল। হঠাৎ তা জ্বলে উঠল। তা থেকে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত নানা আকারের নীহারিকার সৃষ্টি হল, প্রবল বেগে অগ্নিমূর্তি দানবের মত ভরো শূণ্যতাকে বিমথিত করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নীহারিকারা আবার গতিবেগে টুকরো হয়ে অসংখ্য নক্ষত্রের জন্ম দিল। মহাশক্তিশালী ও সাক্ষাৎ অগ্নিমূর্তি সেই নক্ষত্র-দেহগুলো থেকে জন্মাল নানা গ্রহ ও উপগ্রহ। আশ্চর্য! বিরাট শূণ্যতার মধ্যে কোটি কোটি সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি হল।

অর্ধ-চেতন অবস্থাতেও প্রহরী বিষ্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পেল। কি ব্যাপার? কি দেখছে সে? হঠাৎ সে দেখল যে একটা ক্ষুদ্রকায় গ্রহ তার অগ্নিময় আকৃতি নিয়ে সবেগে ছুটে আসছে। প্রহরী চোখ বুজল। না, কিছু হল না তো! চোখ মেলল প্রহরী। সেই গ্রহের অগ্নিমূর্তি শাস্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড ঘর্নিবাতা, প্রবল ব্যুটিপাত, ভয়াবহ

ভূমিকম্প। ক্রমে আরো শাস্ত্র হল সেই গ্রহ। তাকে তখন চেনা
 গেল। সেই গ্রহের নাম পৃথিবী। নদ, নদী, মৃত্তিকার সৃষ্টি হল।
 সমুদ্রগর্ভে জন্মাল প্রাণের বীজ। মাটির ওপরে জন্মাল প্রাণের অঙ্কুর।
 লতাপাতা, কঁকড়ার মত প্রাণী। গাছ। অতিকার নরীক্ষণ ও
 দানবেরা। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে আবার তারা নিশ্চিহ্ন হতে
 লাগল। চতুষ্পদ জন্তুদের আবির্ভাব ঘটল। হাতী, ঘোড়া, হরিণ,
 বাঘ, গণ্ডার, গরীলা, বনমাতৃষ। হঠাৎ বিচিত্র এক জীবের আবির্ভাব
 ঘটল—তার নাম মাতৃষ। প্রাগৈতিহাসিক জগতের সেই মাতৃষ
 অরণ্যের জন্তুদের মতই হিংস্র, ভয়ঙ্কর। কিন্তু আকাশের বিজ্ঞান তার
 নশ্তিকে বুদ্ধির জন্ম দিল। সে আগুন আবিষ্কার করল। নিত্য-নব
 উদ্ভাবনী বুদ্ধি তাকে নিত্য নব পথ দেখাল। মাটি'চরে ফসল
 উৎপাদন করতে লাগল সে, বস্ত্র দিয়ে নগ্নতা পরিহার করল। কিন্তু
 অরণ্যের ছাপ তার মনের মধ্যে একটু রয়েই গেল। পৃথিবীময়
 ছড়িয়ে পড়ল মাতৃষ। যারা তাকে বাধা দেয় তাদের সে দমন করতে
 লাগল। হিংস্র জন্তু, প্রাকৃতিক দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে সে
 আত্মরক্ষার নানা উপায় বের করল। মাতৃষ সভা হল, শৃঙ্খলিত জীবন
 যাপনের প্রয়াস করতে লাগল, তার বহিরঙ্গ, মনাজ ও রাষ্ট্রজীবনের
 কাঠামো সে তৈরী করে ফেলল। মাতৃষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব
 অর্জন করল।

গ্রহরী রোমাঙ্কিত হয়ে উঠল। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকথা তার চোখের
 সামনে ছবির আকারে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। এবার উদ্ঘাটিত হচ্ছে
 মাতৃষের কথা। একের পর এক সাম্রাজ্য এল, গেল। কিছুই চিরস্থায়ী
 হল না। লৌহযুগে ভরা বিরাত সাম্রাজ্যগুলো সব একের পর এক ধুলো
 হতে লাগল। বিরাত বিরাত জাতির অভ্যুত্থান হল, কিন্তু চিরকাল কেউ
 শ্রেষ্ঠ থাকতে পারল না। পৃথিবী-শাসনকারী সম্রাটদের প্রত্নরমূর্তি ও
 অট্টালিকা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। শেষে তাও ধুলো

মিশে গেল। চিরকালের ইতিহাস। মানুষ চাইল শুধু প্রভু হতে, সাম্রাজ্য গড়তে, লুণ্ঠন ও হত্যা করে ভোগেশ্বর্য উপভোগ করতে। মাঝে মাঝে বাধা দিল কয়েকজন, তারা সবাইকে মানুষ হতে বলল, পরস্পরকে ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে বলল, নিরোভ ও সংযত হতে বলল। সেই সব জ্যোতির্ময় মানুষদের কথা কেউ শুনল না, পরিবর্তে তাদের তারা অপমান করল, হত্যা করল, বন্দী করে রাখল। এরি মাঝে দু' একজন পাগলাটে লোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে মানুষ প্রকৃতির ভাঙার থেকে শক্তি আহরণ করতে শিখল, নানা সত্যকে আবিষ্কার করল, যন্ত্র গড়ল; জীবনকে সুস্থ, উন্নত, মহৎ ও সুখী করার কথা ভাবতে শিখল। কিন্তু তার সঙ্গেই শিখল ধ্বংসাত্মক নানা অস্ত্রের নির্মাণকার্য। মানুষ পৃথিবীর সেরা জীব হয়েও—

অন্ধকার। আবার সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল।

জ্ঞান হারাতে হারাতে গ্রহরী অস্ত্রভব করল যে সে আবার শূন্যপথে দিগ্বে নীচে পড়ছে। এবার দ্রুত, অতি দ্রুত বেগে।

নীচে—নীচে—আগে নীচে—

দুই

প্রহরী চোখ মেলল।

চোখ মেলতেই সে দেখতে পেল যে গ্রামপ্রান্তে, কচুরীপানা আর শালুকফুলে ভরা পুকুরের ধারে, ঘন ছর্বা ঘাসের বিছানার ওপর সে শুয়ে আছে। 'শাশেপাশে লোকজন নেই, কেউ নেই। কেবল দূরে ছ' একটা গরু, মোষ আর ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দতা। শুধু পাখীর শিষ্ আর জলের মধ্যবর্তী পোষা হাঁসদের মাতার কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাছপালার কাঁক দিয়ে দ্রবতী কুঁড়ে ঘরগুলোকে দেখা যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে অদৃষ্ট কোন বালকের কণ্ঠনিঃসৃত ডাক ভেসে আসছে। জল, লতাপাতা, ঘাস আর মাটির একটা মৃদু স্রবাস শেষে প্রহরীর চেতনা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

হঠাৎ যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ল তার। পুকুরের জল থেকে তার মনে পড়ল যে কোথায় যেন একটা নদী আছে যার নাম রূপসী। সেই নদীর ধারে, একটা মণিমাণিকা-খচিত কক্ষে যেন অসংখ্য হুম্বর পুতুলেরা থাকে এবং তারা গান গায়, নাচে, আনন্দ-সায়রে দিনরাত অবগাহন করে। সে, সেও যেন সেখানে ছিল আর তার হাতে ছিল একটা তলোয়ার। কোথায় গেল সেটা? তারপরে হঠাৎ একদিন ঝড় উঠল, কি যেন হল। অসীম শূন্যতার মধ্যে সে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পেল, জানতে পারল মানব-সভ্যতার কথা। তারপর—তারপর—

আর কিছু ভাবতে পারল না প্রহরী। অগ্ন্যম্নস্তভাবে একটা ছোট্ট মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সে জলে ফেলল। টুপ্ করে একটা শব্দ হল। বুঝাকারে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল পানাবরা পুকুরটার বুকে।

চমৎকার। প্রহরী জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। প্রতিবিম্ব। ও কে? হাত নাড়ল প্রহরী, মাথা নাড়ল। প্রতিবিম্বও অতুলনভাবে হাত নাড়ল, মাথা নাড়ল। ওঃ, এ যে সে!

“আমি!” মুগ্ধ প্রহরী উচ্চারণ করল, “আ-মি!”

নিজের চেহারা দেখল প্রহরী। একটি বলিষ্ঠ ও স্ত্যামবর্ণ যুবক, হৃদয় দেখাকৃতি তার। পরণে একটা ছোট্ট বড়ীল ধূতি আর গায়ে একটা চাদর। বয়স কত? দেখলে পঁচিশ মনে হয় কিন্তু সত্যি কি তাই? মাথা নাড়ল প্রহরী। না, তার বয়স লক্ষ্যধিক বছর। মানুষের বয়স যে তারও বহুল। সে প্রকৃতির সবকিছু সন্তান হলেও তার বয়স কম নয়।

আলোড়িত জলের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে সে অতুলন করল যে সে কথা বলতে পারে, মানুষের যা কিছু জানবার তা জানে। নিজেকে দেখে তার মনে বিশ্বয় জন্মাল, গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়।

দাঁরে দাঁরে সে আবার উচ্চারণ করল, “গামি—গামি—আ-মি!”

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে সে রোমাঙ্কিত হয়ে উঠল, হেসে উঠল, তারপরে আবার উচ্চারণ করল, “আমি মানুষ”—

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

হঠাৎ সে শরীরের মধ্যে একটা বিচিত্র অহুত্বের সন্ধান পেল। শরীরটা বেমন বেন দুর্বল বোধ হচ্ছে, সূচীমুখ একটা যন্ত্রণা বেন নাভিকুণ্ডলের তলা থেকে বিছাৎ-তরঙ্গের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চেতনার মধ্যে স্নানিত হচ্ছে একটা অতি-ক্ষীণ বিল্লীরব। কি ব্যাপার? এর অর্থ কি? প্রহরী খুব ভাবল এবং তার মস্তিষ্কের কোর্টরে তার বুদ্ধি তাকে জবাব দিল। ক্ষুধা। প্রহরীর খাচ্ছ চাই। জীব-জগতের নিয়ম। আলো, জল ও বাতাসের মত প্রতিদিন তার খাচ্ছ চাই। তার জঠরের মধ্যে যে যন্ত্রণা এখন

সাপের মত ফণা তুলেছে তাকে নিরুত্ত ও শাস্ত করতে হলে তাকে খাচ্চ-সংগ্রহ করতে হবে। প্রহরী বুঝল সব। কিন্তু কি করে পাওয়া যাবে এই খাচ্চ? প্রহরী মানুষদের বিষয়ে যা জানবার তা জানে। সে জানে যে মানুষ গ্রাম ও সহর তৈরী করেছে, নানা জিনিষ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু মানুষের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা, সেখানকার খুঁটিনাটি সমাজরীতি, চালচলন ও আদব-কায়দা সে জানে না। সে জানেনা যে কি করলে খাচ্চ পাওয়া যায়।

প্রহরী চারদিকে তাকাল। আশে পাশে কোন ফলের গাছ কিংবা বাগান কি নেই? না, নেই। দূরে গ্রামবাসীদের পর্ণকুটীর, টিনের আটচালা। তার পিছনে ধূ ধূ ক্ষেত; দূর দিগন্তে গাছপালার ঘনশ্রাব রেখা, তারও পেছনে ধূসর পাহাড়ের সারি। কিন্তু খাচ্চের সম্ভাবন কোথায়?

বোধ হয় অল্প কোনো মানুষ তাকে সব কিছু বলে দিতে পারবে। প্রহরী ভাবল। কিন্তু সে তো কাউকে চেনে না! কেউ তো তাকে চেনে না! মুহূর্তে নিঃসঙ্গতা-বোধ ঘনিষে উঠল তার মনে, পাহাড়ের মত বিরাট, প্রান্তরের মত বিশাল একাকী-বোধ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সে একা। সম্পূর্ণ একা।

হঠাৎ প্রহরী চমকে উঠল। পেছনে স্তম্ভনো পাতার খচমচ শব্দ। সে ফিরে তাকাল। একজন বুড়ো চাষী এগিয়ে আসছে তার দিকে। তার হাতে ছোট একটা লাঠি।

প্রহরীর নুকে আশা জাগল। এট একজন মানুষ! তার রক্তের মধ্যে একটা গভীর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। তারই মত আর একজন মানুষ! রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মন, বুদ্ধি-সমবিত আর একজন মানুষ। তারই আর একটি মূর্তি। তার একান্ত আপনজন। সে তাকাল বুড়োর দিকে, তাকিয়ে হাসল।

বুড়ো খমকে দাঁড়াল, সবিন্দ্রয়ে তাকাল গ্রহরীর দিকে। তার চোখে অপরিণয়ের প্রশ্ন।

গ্রহরী আবার হাসল।

বুড়ো এবার তার কাছে এগিয়ে এল, প্রশ্ন করল,
“তুমি কে?”

গ্রহরী বুড়োর দিকে তাকাল। ঘাটের ওপর বসল হবে তার, মাথার চুল আর ভুরুজোড়া সাদা হয়ে গেছে, তবু তার দেহের কাঠামো শক্ত, পেশল। আর তার চোখে মুখে নাটির মত মোলায়েম মমতা।

“তুমি কে?” বুড়ো আবার প্রশ্ন করল।

গ্রহরী মুহূর্তে হেসে জবাব দিল, “আমি—আমি একজন মানুষ।”

বুড়োর মুখেও হাসি ছড়িয়ে পড়ল, সে ঘাসের ওপর বসে পড়ল, নাটিটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে বলল, “তুমি তো ভারী অদ্ভুত ভাই। আরে মানুষ তো সবাই, আমি তো তা জানতে চাইছি না। আমি তোমার নাম জানতে চাইছি—”

“নাম!” গ্রহরী ভাবতে বলল। তাইতো, তার তো একটা নাম চাই। নাম? কিন্তু পেটের মধ্যে সেই বিচিত্র বস্তুনা কেন রাঁড়ছে! ক্ষুধা।

গ্রহরী বলল, “নাম? আমার নাম অরিন্দম—”

“অরিন্দম কি?”

“মানে?”

“মানে তোমার উপাধি?”

“তার মানে?”

বুড়ো একটু বিরক্ত হল, “আহা তুমি বামুন, কায়ত, বন্দি, তিলি, না কি?”

“আমি কোনটাই না।”

বুড়ো এবার চটল, “তা কি হয়? একটা কিছু তো বটেই।
নামের শেষে একটা কিছু নিশ্চয়ই থাকা উচিত—”

প্রহরী হাসল। সে এখন সব বুঝতে পারছে। জাতিভেদ
নামে এক বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করেছে মানুষের। পরস্পরকে পরস্পরের
ছোট বড় শ্রেণীতে ভাগ করেছে। গুণগত শ্রেণীভেদের প্রথাটা
আজ জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র। সেই সাপটা কণা দোলাচ্ছে।
ভীক্স নখের আঘাতে তার চেতনাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে একটা
পশু। ক্ষুধা।

প্রহরী মাথা নাড়ল, বলল, “ব্যাপার কি জানো ঠাকুরদা?
আমি ঐ পূর্বদিকের পাহাড়ের ওপারের দেশ থেকে এসেছি
আর আসতে আসতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আমি সব
ভুলে গিয়েছি।”

বুড়োর চোখে সহানুভূতি দেখা দিল, “ও, ও—তা কোথায়
যাবে তুমি?”

“জানি না। কোথায় যাব বলত?”

“তুমি কি করতে চাও?”

“বাঁচতে চাই।”

“তোমার সঙ্গে কি পয়সা আছে?”

“না।”

“টাকা পয়সা না থাকলে বাঁচবে কি করে ভাই?”

টাকা পয়সা! প্রহরী কথাটা পুরো বুঝল না। সে শুধু এই-
টুকু বুঝল যে টাকাপয়সা একরকমের জিনিষ যা থাকলে বাঁচা যায়।
সে চূপ করেই রইল।

বুড়ো বলে চলল, “আমাদের গাঁয়ে তো তেমন কোনো কাজ
নেই, ফসল কাটা হয়ে গেছে কোন কালে। তা এক কাজ
করনা কেন?”



“কি?”

“তুমি আজবনগরে যাও।”

“আজবনগর!”

“হ্যা, এ দেশের রাজধানী, দক্ষিণের ঐ পাহাড়ের এপারে, গৌরী নদীর ধারে সেই নগর—মস্তবড় নগর—আজবনগর”—

“সেখানে গেলে কি করে বাচা যাবে?”

“কাজ করবে। কত লোক সেখানে, কত দপ্তর, কত কল-কারখানা! আমাদের দেশের, মানে বিচিট্রপুরের কোটি কোটি লোক থাকে সেখানে, বিদেশের জাহাজ আসে সমুদ্র পার হয়ে, গৌরী নদীর স্রোত ধরে। সেখানে কাজের অভাব কি? কাজ করবে, পয়সা পাবে, খাবে দাবে ক্ষুতি করবে।”

প্রহরী হাসল, “তাহলে সেখানে তোমরা যাওনা কেন?”

বুড়ো মাথা নাড়ল, “আজবনগরে সবাই ছাড়াই হবে কেন? আমরা এখানেই থাকব—আমাদের এখানে অনেক কাজ,—

“কি কাজ?”

“আমরা কল ফলাই—আমরা চাষী”—

“বটে!”

“হ্যা, আমরা আজবনগরের মানুষদের মুখে শুনে ভোগাই।”

“তাহলে তোমরা তো খুব ভালো লোক—খুব খাতির পাও সবাই কাছে?”

বুড়ো বিষম হেসে ঘাড় নাড়ল, বলল, “একটুও না, এ দেশে সবাই খাতির পায় না। যারা দেশকে শাসন করে শুধু তারাই খাতির পায়। আর তারা থাকে আজবনগরে”—

প্রহরী উৎসাহিত হয়ে বলল, “ঠিক, আমি আজবনগরে যাব, তা কতদূরে ঠাকুরা?”

“সে অনেক দূর। দক্ষিণের ঐ পাহাড় পেরোতে হবে

তোমাকে, তারপর অনেক হেঁটে যখন গৌরী নদীর ধারে পৌঁছবে তখন নদীর ওপারে আজবনগরকে দেখতে পাবে।”

“ওঃ—

“তা তোমার গিয়ে—মাজ্জ দুপুরে রওনা দিলে কাল দুপুর নাগাদ গিয়ে পৌঁছাবে সেখানে।”

“ওঃ—আচ্ছা—”

প্রহরী অস্বাভাবিকভাবে বলল কথাটা। পেটের মধ্যে একটা স্তম্ভীত যন্ত্রণা। একটা প্রাগৈতিহাসিক জঙ্ঘর নথরাঘাত। ক্ষুধা।

বুড়ো তার দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, “এক কাজ কর ভাই”—

“কি?”

“মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি কিছু খাওনি। তা আমার ওখানে চল, চাট্টি ভাল ভাত খেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে তারপর রওনা দিও”—

প্রহরী বুড়োর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, এই একজন সত্যিকারের মানুষ। মানুষ হওয়ার গবে তার বুক ফুলে উঠল। আশ্চর্য! লোকটা ঠিক বুঝেছে তার কষ্টের কথা!

“তাহলে ওঠ—চল আমার সঙ্গে”—বুড়ো বলল।

প্রহরী উঠে দাঁড়াল, কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, “চল।”

বেলা কত হবে? চলতে চলতে আকাশের দিকে তাকাল প্রহরী। দিনের তৃতীয় প্রহর শুরু হল বলে। আকাশে সূর্যদেব। সূর্যই তার আদর্শ। অঙ্ককারকে দূর করতে হবে। বুড়োকে অহুসরণ করল প্রহরী। পায়ের নীচে মখমলের মত নরম ঘাস। এখানে এখানে গরু মোষ। কুকুর, হাঁস, পাখী। আম জাম আর তাল গাছ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাজে পাতার ঝঙ্কার। আর বিচিত্র একটা ছবির মত দূরের অনাবৃত ধূধু ক্ষেত, দিগন্তের গ্রামরেখা, আকাশলগ্ন ধূসর পাহাড়ের সারি। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। এখানে ওখানে গোবর আর খড়

হুড়ানো। তার গন্ধ। আরো এগোল হুড়নে। এবার মাছুষ দেখা গেল—নয় ছেলে মেয়ে, বুবক বুবতী, বুড়ো বুড়ী। তাদের চোখে কোঁতুহল। প্রহরীর ছোঁচোখে আরো কোঁতুহল। এতগুলো মাছুষ! তাদের চোখে হরিণের দৃষ্টি, মুখে সরলতা। কিন্তু তারা এমন নয়প্রায় কেন? প্রহরীর মনে খটকা জাগল। কিন্তু কোন কিছুই বলল না সে, শুধু নিঃশব্দে বুড়োকে অঙ্গসংগ করেই চলল।

বুড়োর বাড়ীতে গিয়ে পামল প্রহরী। বুড়ো তাকে বদাল, বহু করল। বাড়ীতে তার বৌ, জোয়ান ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধু আর নাতিনাতি আছে। একপাশে গোদাল, সেখানে একটা হাড়-জিরজিরে গরু ও একটা বলদ আছে। বুড়ো তাকে পেতে বদাল। তার বাড়ীর সবাই কাছে এসে খাওয়া দেখতে লাগল। প্রহরীর ভারী ভালো লাগল। তার বুকের ভেতরে যেন একটা সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বুড়োর বৌ, তার মেয়ে এবং তার পুত্রবধুর দিকে তাকিয়ে তার মনটা কেমন যেন প্রশান্ত হয়ে উঠল এবং সে এই পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে যেন গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়তে চাইল। মাছুষে মাছুষে মধুস্বাদটা তো ভারী স্বন্দর, ভারী আশ্চর্য্য!

ডাল আর ভাত দেখল সে তার সামনে। এক পাশে চাট্টি শাক। এই খাবারই খেতে হয়! ডাল ভাত মেখে সে এক গ্রাস মুখে দিল। মুহূর্ত্তে একটা অনির্বচনীয় শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল তার শিরায় শিরায়। যেন একটা অদৃশ্য সাক্ষাতিক বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে গেল—খাচ্ছ! খাচ্ছ! প্রহরী গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে লাগল, চিবিয়ে তা গিলতে লাগল। আর ভয়দেয়ের সেই স্ফটিক বজ্রগাটা যেন ক্রমেই ভাঙা হয়ে মিলিয়ে গেল, সেই অদৃশ্য সাপের কণাটা যেন গুটিয়ে এল, সেই প্রাগৈতিহাসিক জঙ্ঘটা যেন হঠাৎ মরে গেল। পেটটা ভারী হয়ে উঠল, সেখানে যে অগ্নিকুণ্ডটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল তা যেন হঠাৎ নিভে ভেল। প্রহরীর চোখে তৃপ্তির গাঢ় ছায়া ঘনাল এবং সেই ছায়া

ভেদ করে ঘন বাষ্প বেরিয়ে এল। কি আশ্চর্য ক্ষমতাপালী এই
ক্ষুধা! আর তার কাছে মানুষ কত অসহায়!

খাওয়া শেষ হল। প্রহরী বিশ্রাম করল। পরিবারের ছেলেমেয়েরা
তার সঙ্গে নানা কথা বলল। প্রহরী সব কথার জবাব দিতে পারল
না, হু'একটা কথা বলে সে তাদের কথাই স্তনতে লাগল। সময় কেটে
চলল।

খানিক বাদে বুড়ো বলল, “ও ভাই অরিন্দম, এবার ওঠ”—

প্রহরী চমকে উঠল।

“এ্যা?”

“এবার আজবনগরের দিকে রওনা হও, সম্বো হওয়ার আগে পাহাড়টা
পার না হতে পারলে তো মুদ্বিলে পড়বে”—

“ওঃ—আচ্ছা”—

প্রহরী উঠে দাড়াল। কিন্তু কি হবে গিয়ে? এই শান্ত গ্রাম,
এই সব ভালো মানুষদের ছেড়ে গিয়ে কি লাভ হবে? মায়া। প্রহরী
সবার দিকে তাকাল।

হঠাৎ মিলিয়ে-যাওয়া স্বপ্নের মত তার মনে পড়ল। রূপসী নদীর
ধারে, পুতুলদের অপরূপ রাজ্য। আর সেখানে যেন তার হাতে একটা
তলোয়ার ছিল। হঠাৎ সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু সেই তলোয়ারটা
যেন এখনো অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। তাকে সংগ্রাম করতে
হবে। মানুষের পৃথিবী থেকে সমস্ত অশুভ ও পশু-শক্তিকে দূর করতে
হবে। তার অনেক কাজ। প্রহরী কেঁপে উঠল। মায়া। তার
এখানে থাকলে চলবেনা। সেই সব শত্রুদের তাকে খুঁজে বের করতে
হবে। তার অ-নে-ক কাজ।

প্রহরী পা বাড়াল।

বুড়ো বলল, “তাহলে এসো অরিন্দম। আবার যদি এপথ দিয়ে
ফেরো তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করো।”

গ্রহরী মাথা নেড়ে চলতে শুরু করল।

চলতে চলতে সে মনে মনে মাথা নাড়ল। ইয়া, তার নাম অরিন্দম।
অরিকে দমন করে যে সেই অরিন্দম। ঠ্যা, সে শত্রুদের ধ্বংস
করবে।

দক্ষিণ দিকে, যেখানে আকাশের গা ঘেঁষে বোঁচাটে রেখার আকারে
এক সারি পাহাড়ের আভাস, সেদিকে এগিয়ে চলল অরিন্দম। মধ্যগগন
থেকে সূর্যদেব তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছেন। দিনের তৃতীয় গ্রহণ
শেষ হল বলে। বহুদূরে, রূপোর পাতের মত বকবকে সেই রূপসী
নদীর ধারে, মণিময় সেই আশ্চর্য কক্ষে এখন পুতুলেরা কি করছে ?
সেই স্বকণ্ঠ গায়ক পুতুলটি এখন কোন রাগিণীর আলাপ করছে ?

এগিয়ে চল। নিজে থেকে নিজেই আদেশ করে অরিন্দম, পরিচালনা
করে। সামনের দিকে এগিয়ে চলে। পায়ের নীচে তপস্বত মাটি,
উঁচুনীচু শৃঙ্গ মাঠ, ছোট ছোট খাড়ি পার হয়ে এগিয়ে চলল অরিন্দম।
মাঝে মাঝে কয়েকটা আম, তাল আর বাবলা গাছ, কিছু কোপঝাড়,
বড় বড় বুনো ঘাসের ছটগা দেখা যায়। দেগা যায় নানা পাখী, শালিক,
ময়না, চুই, ফিড়ে। এখানে ওখানে কাক ডাকে, ঘুঘু ডাকে।
আকাশের বৃকে উড়ন্ত চিলেরা ডাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল
গাঙরে যেন আগ্নেয় জাল। তার ওপর থা থা রোদ। নিজস্ব ভূপুর
কাটে। ধতুরের মত বীক। আকাশের বৃক বেয়ে সূর্যদেব পশ্চিমে চলে
পড়েন, তাঁর আলো ক্রমশঃ সোনার মত রং ধরে। নিশ্চক্ৰতা। হাওয়া
বয়, পানী ডাকে। তবু নিশ্চক্ৰতা। প্রকৃতি নিঃশব্দে আত্ম-ঘোষণা
করে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। অরিন্দমের একা বোধ হয়।
ভারী একা। আবার কখন সে মানুষের মুখ দেখতে পাবে ? কখন ?

বেলা পড়ে আসে। কিন্তু পাহাড় তো এখন দূরে। বোঝা বায়নি, হাটতে পারছে না অরিন্দম। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে তদ্বিধি কি শরীর। অথচ থামবার সময় নেই। আর কোথায়ই বা থামবে? না, পাহাড় পার হয়ে তবেই সে থামবে। অরিন্দম এগিয়ে চলল।

ক্রমে বিকেল হল, বিকেলও শেষ হল। নীড়-প্রত্যাশী পাখীরা ডানার আঘাতে বায়ুস্তরকে মথিত ও সচকিত করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। তাতানো সোনার মত লালচে ও বড় হয়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তকে স্পর্শ করলেন। আকাশে ভাসমান মেঘের টুকরোগুলোর হঠাৎ বহুরূপী মত বর্ণাস্তর ঘটতে লাগল। সন্ধ্যা হল। একটা পাহাড়ের চূড়াকে একটা প্রচ্ছন্নিত আগ্নেয়গিরির মুখের মত ঘোর লাল করে সূর্যদেব অস্তে গেলেন। পৃথিবীর বুকে ছায়া ঘনাল, আকাশের বুকে রাত্রিলোভী বাতুড়েরা এবার চলাচল শুরু করল, পুরু একটা সোনার হাঁসুলীর মত বন্ধিন চন্দ্রদেবকে দেখা গেল পূর্বাচলে। নিস্তব্ধতা রাতের স্পর্শে ঘনীভূত হল। বাতানে যেন বেদনার স্রোত বয়ে এল। বড় একা মনে হতে লাগল। এমন সময়ে পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছোল অরিন্দম।

ক্লান্তি, গভীর ক্লান্তি। তবু থামল না অরিন্দম। পাহাড়ের গা বেয়ে সে ওপরে উঠতে লাগল। শালগাছের অরণ্য, জ্ঞান অজানা আরে কতরকমের বন্য গাছ। গায়ে গা লাগিয়ে তারা প্রাচীরের মত দুভেঁজ হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল সে। রাত বাড়তে লাগল। চন্দ্রদেব আকাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। তাতে রাতের প্রাণী কালপুরুষ। ছায়াপথের জ্যোতির্ময় রেখাটা যেন কোন সুন্দর রহস্যলোকের যাত্রা-পথ। অহুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, পাহাড়ের নীচেকার পৃথিবীকে মনে হল অপরূপ—যেন মন্ত্রমুগ্ধ কোন রূপসী। জ্বলন্ত ভেতর দিয়ে চলা যায় না। রীতিমত কষ্ট হয়, তবু এগিয়ে চলল অরিন্দম। কাঁটায় গা ছুঁতে গেল তার,

অহরী নাথা খেয়ে পা কেটে গেল, ঘামে গা ভিজ়ে গেল। আর
 চলতে চলতে আবার সুক-হল সেই হুটীমুখ ঘণাটা। কুশা। কিন্তু
 অরিন্দেয় নেই। সে ওপরে উঠতেই লাগল। গাছপালার ঘন পত্নাবরণ
 ভেদ করে ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর টুকরো পড়েছে পাহাড়ের গায়ে,
 তাতেই পথ ঠাহর করে এগোতে হল। আর ঠিক সেই সময়েই শোনা
 গেল নানা অরণ্যচর খাপদের চীংকার ও গর্জন। শেখাল, নেকড়ে,
 বাঘ। কিন্তু ভয় পেল না অরিন্দম। কালো বাঘের মত সেও নির্ভয়ে
 এগিয়ে চলল। আশে পাশে অরিন্দেহ অসংখ্য জোনাকী জ্বলছিল,
 ত্বাহেরি মত ক্ষণে ক্ষণে তার হুঁচোখের তারা জ্বলতে লাগল। ক্রমে
 মাঝরাত হল। অরিন্দম একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌছোল। তখন
 তার শীত করতে লাগল, চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়াল সে, সেখান
 থেকে চারদিকে তাকাল। আকাশ থেকে যেন একটা শক্তির প্রবাহ
 সারা পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। রাতের অবকাশে যেন নানা
 ইন্দ্রজাল ঘটছে চারদিকে। হঠাৎ তার নিজেই খুব শক্তিমান মনে
 হল, অমিট তেজে অপরাহ্নের মনে হল। সে আকাশের দিকে
 তাকিয়ে হাসল। আমি মাতৃম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টাদপি সৃষ্ট এক
 কীট, প্রকৃতির কাছে এক নগণ্য জীব—তবু আমি কম নই।
 পৃথিবীর বুকে যেন আমি তেমনি আমার বুকেও পৃথিবী আছে।
 না, আমার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। আর যে দেবতাদের মাঙ্ঘ্ষেরা
 পূজ়ে করে তারা তো আমার মধ্যেই জন্মলাভ করে। হে আকাশ,
 হে পৃথিবী, হে নগজলোক, শোন—আমি একজন দেবতা।

পাহাড়ের চূড়া থেকে অরিন্দম দেখেছিল যে, পাহাড়ের ওপিন্ঠে,
 দূরে, একটা রূপোর হারের মত নদী দেখা যাচ্ছে আর সেই নদীর

ওপারে নক্ষত্রের মত জ্বলছে অনেক আলো। বাকী সব বোঝা যায়নি, কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। কিসের আলো ওগুলো? ওই নদীই কি গৌরা নদী? আর ঐ আলোগুলি কি আত্মবনগরেই জ্বলছে? কে জানে।

পাহাড় পার হয়ে নীচে নেমে এল অরিন্দম। তখন রাতের তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে। সোজা সামনের দিকেই চলল অরিন্দম। না, সে থামবে না, কারণ থামলে সে আর চলতে পারবে না।

অনেক, অনেকক্ষণ পর সে হঠাৎ থামল। সামনেই এক নদী। চন্দ্রদেব অস্তে গেছেন তখন, অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে সব কিছু। শুধু অরিন্দম বুঝল যে সামনে একটা নদী। 'ঝি' 'ঝি' পোকাকার ডাকের সঙ্গে সে নদীর কল্লোলধ্বনি শুনে পেল। নদীর ওপারে তখন আর সেই নক্ষত্রের মত আলোগুলো বেশী জ্বলছে না, শুধু একটা দুটোকে ক্ষীণ-দ্রাতি মত নক্ষত্রের মত টিম টিম করে জ্বলতে দেখা গেল। অরিন্দম বসল। অন্ধকারে সব কিছু দেখা না গেলেও সে এটা বুঝল—যে, তার গন্তব্যস্থলে না পৌছোলেও তাকে আপাততঃ এখানে থামতে হবে। কারণ সামনেই নদী।

যেখানে অরিন্দম বসল, সেখানে ঘাস ছিল। রাতের শিশিরে ভিজ়ে উঠেছে সেই ঘাস, তার ভিজ়ে স্পর্শটা যেন শরীরকে ঠাণ্ডা করে দিল। নদীর বুক থেকে আসছে একটা বাতাসের ঢেউ, নদীর নিঃশ্বাসের মত। শরীর জুড়িয়ে গেল, ঘাসের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। আঃ। আঃ। সমস্ত চেতনা যেন আরামে মগ্নরিত হয়ে উঠল, চোখের পাতা দুটো বুজে এল, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার এসে চোখের সামনে একাকার হয়ে গেল, খাড়া পাড়ের নীচেকার নদীটা যেন ফুলে ফেঁপে সমুদ্র হয়ে তাকে গ্রাস করল আর তাকে টেনে নিয়ে চলল—তলে, অভলে, অতল তলে—। ঘুম এল।

এই গায়েব ওপর একটা উত্তাপ অনুভব করল অরিন্দম। শুষ্ক শুষ্ক একটা শব্দ আর অজস্র ভ্রমরের গুহ্বরণের মত একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে। শুনতে পেল নদীর কল্লোলধ্বনি আর মানুষের পদধ্বনি সে চোখ মেলল। 'অপূর্ব দৃশ্য!

সামনে নদী। তরঙ্গসঙ্কুল, গভীর। নদীর ওপরে অসংখ্য নৌকো, ডিঙ্গি। বিদেশাগত ছোট বড় সংখ্যাতিত জাহাজ। দূরে, নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা গগনস্পর্শী বিরাট সেতু। নিরেট ইম্পাতে তৈরী। জলের ওপর দিয়ে তা ধনুকের মত বেঁকে গেছে, জলকে স্পর্শও করেনি। আশ্চর্য। আর তার ওপর দিয়ে চলেছে মানুষের পর মানুষ, অগণন মানুষ। সব মানুষ মিলিয়ে একটা জীবন্ত স্রোতের মত মনে হল অরিন্দমের কাছে। বিস্ময়কর অহুত্বিতে তার দেহ কঁপে উঠল। এত মানুষ! মানুষের জীবনে এখানে কি প্রচণ্ড গতিবেগ! প্রত্যেকে যেন উর্দ্ধ্বাসে ছুটতে চাইছে। আর ছুটছে বহুরকমের গাড়ী। কতকগুলো গরু মোষ টানছে, কতকগুলো ঘোড়া টানছে, কতকগুলো আপনা থেকে চলছে, কতকগুলো শূন্য বিলম্বিত তারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চলছে। আর সব মিলিয়ে এক বিচিহ্ন যান্ত্রিক শব্দ উঠছে। ওদের নাম কি? অরিন্দম ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর নদীর ওপারে, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে একটা বিরাট নগর। দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েও সব কিছু বুঝতে পারেনা অরিন্দম। শুধু সে দেখে যে বিরাট অট্টালিকার পর অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আকাশের দিকে। অট্টালিকার পর অট্টালিকা। তাদের স্বউচ্চ শীর্ষদেশ যেন আকাশকে তর্জনী-সংকেতে শাসাচ্ছে। কারখানার লম্বা লম্বা ধূম্রনের ভেতর থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো ধোঁয়া। দেহ-লোলুপ দস্যুদের মত যেন তা আকাশের কুমারী-শুচিতাকে হরণ করতে চায়। পাহাড়ের

মত শব্দ, উচু সব অট্টালিকা আর সোঁধাবলী যেন আকাশের গায়ে ঝিলে গেছে। আর সেই সব অট্টালিকার অরণ্য থেকে সূর্যদেব উদ্ভিত হচ্ছেন। রাতের প্রাচীর ভেঙ্গে, মহানগরের কারাগার থেকে যেন বিজয়ী বীর বেরিয়ে এসেছে। তার স্বর্ণ-শোণিত-লিপ্ত সর্বাঙ্গে অঙ্ককার-জয়ী আশীর্বাদ। তার সেই অপরূপ কনকচ্ছটায় সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। আকাশ, অট্টালিকাশ্রেণী, নদীর জল, মাহুষ, জাহাজ, সেতু—সব কিছুই যেন স্বর্ণমণ্ডিত রূপে স্বর্গে মহিমময় হয়ে উঠল। অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, সূর্যের দিকে তাকাল, মনে মনে বলল, সূর্যদেব তোমার জয় হোক। যেখানেই যাই তুমি আছ, যেখানেই যাই তুমি যেন থাক, হৃদয় ও পৃথিবীর অঙ্ককারকে যেন তুমি চিরকাল অপহরণ কর।

দৃঢ় পদক্ষেপে সে সেতুর দিকে এগিয়ে চলল।

ক্রমেই সেতুটা নিকটবর্তী হল, অতিক্রম হয়ে উঠল। কিছুদূর গিয়ে একটা রাস্তা পেল সে। মক্ষণ কালো পাথরের মত সাদান রাস্তা। তার ওপর অজস্র নরনারী আর যানবাহন চলেছে। নদীর এপারে, অরিন্দমের ডানদিকে ও মাহুষের বসতি, বড় বড় বাড়ী। সেদিক থেকেই লোকেরা আসছে, সেতু পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে। ওপারেই কি আজবনগর? গভীর কৌতূহল জন্মাল তার মনে।

চলমান জনতার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সে পা বেশাল। আশ্চর্য একটা গতিবেগ তার দেহে সঞ্চারিত হল। চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী একজন লোককে সে প্রশ্ন করল, “একটা কথা বলবে?”

লোকটা তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল।

“ওপারের ওই সহর—ওর নাম কি?”

লোকটা হাসল, বলল, “তুমি বিনেশী?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল।

লোকটা বলল, “হ্যাঁ, সেতুর ওপারে ওই যে সহর, ওর নাম

আজবনগর। পৃথিবীর একটা সেরা মহর, সেরা বন্দর, ঐশ্বর্যে ও সমারোহে
বেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী।”

ইন্দ্রপুরী! হ্যা, তাই বটে। অরিন্দম মাথা নাড়ল। তাই বটে।
অন্তমনকভাবে সে সেতুর দিকে এগিয়ে চলল। শব্দ, কোলাহল আর
গতিবেগ তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। আর এরি মধ্যে জঠরের সেই
স্বচীমুখ বহুগাটা আবার অনুভূত হল। আবার ক্ষুধা তাকে অসহায়
করে ফেলেছে।

ইহাং সে কর্কশকণ্ঠের ডাক শুনল, তাকাল। হ্যা, তাকেই ডাকছে
দুজন লোক। তাদের মাথায় রক্তবর্ণ উক্ষীষ। বোধ হয় তারা নগর-
রক্ষী। তার পার্শ্ববর্তী লোকটি বলল, “তোমাকে রক্ষীরা ডাকছে যে—
শুনছ?”

সেই দুজন রক্ষী তাদের ভারী জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে এল কাছে,
বলল, “এই—তুমি দাঁড়াও”—

অরিন্দম দাঁড়াল, দেখল যে সেতু-মুখে প্রতিটি লোককে খামিয়ে
পরীক্ষা করছে নগর-রক্ষীরা। ব্যাপার কি?

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার সচকিত হয়ে উঠল, একজন রক্ষী তাকে প্রশ্ন
করল, “তুমি কে?”

অরিন্দম রক্ষীদের দিকে তাকাল, বলল, “আমি একজন মানুষ,
আমার নাম অরিন্দম—”

সেই রক্ষীটি মুগ্ধ বিকৃত করে কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, “ইয়াকি হচ্ছে,
না, ইয়াকি হচ্ছে? বেশী টেচিরে কথা বললে তোমাকে শালা হাডতে
নিরে যাব।”

অরিন্দম অবাক হল। রক্ষীটি এমন অভঙ্গ ব্যবহার করছে কেন?
কি হচ্ছে? আবার সে রক্ষীদের দিকে তাকাল। হুটপুট শিকারী
জন্তুর মত তাদের মুণ্ডুলো কঠিন, চোখগুলো তীক্ষ্ণ।

দ্বিতীয় রক্ষীটি বোধ হয় ব্যাপারটা বুকেছিল, সে এক পা এগিয়ে

প্রশ্ন করল, “আরে ভাই, আসল কথা বগ—তুমি কি এই প্রথম সহকে আসছ ? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে ।”

অরিন্দম মাথা নেড়ে জবাব দিল, “হ্যা—তাই ।”

“তাহলে এখানে এস”—

অরিন্দম তাদের অহুমরণ করল ।

সেতুমুখের এক পাশে চার পাঁচজন লোক চেয়ারে বসে ছিল, তাদের সামনে টেবিল । টেবিলের ওপর দোরাড কলম আর কাগজ-পতর । দেখানে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম । আরো লোক সেখানে ছিল, বোধ হয় তারই মত নবাগত, আগন্তুক ।

তিন চার জন লোকের পেছনে অরিন্দমকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল একজন রক্ষী, বলল, “লাইনে দাঁড়াও, তোমার পরিচয়-পত্র নাও—”

কয়েক মিনিট বাদে অরিন্দম গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল ।

উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে একজন তার দিকে প্রশ্ন দৃষ্টি নেলে তাকাল, প্রশ্ন করল, “তোমার নাম ?”

“অরিন্দম ।”

“কি জগে সহরে এসেছ ?”

“কাজ করতে ।”

“আগে কোথায় ছিলে ?”

“ঐ—ঐ পাহাড়ের ওপরে”—হাত নেড়ে উত্তর দিকে দেখাল অরিন্দম ।

লোকটি মাথা নাড়ল, “হঁ—গাঁয়ে ছিলে ।”

“হ্যা—”

“গাঁয়ের নাম ?”

অগ্রবর্তী লোকদের উত্তরগুলো শুনেছিল অরিন্দম তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, “চন্দনপুর”—

লোকটি একটা মোটা কাগজে কি সব যেন লিখল, তারপর মুখ

তুলে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “এবার আসল কথা বল দেখি”—

“কি?”

“দেশে তোমার জমি-জায়গা আছে?”

“না।”

“সঙ্গে টাকাকড়ি নিশ্চয়ই আছে? কত?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “কিছু না।”

“কিছু না? তাও কি হয়? কত আছে দেখাও।”

“একটা পয়সাও নেই আমার কাছে—একটাও না।”

“হু—দাঁড়াও”—

সেই লোকটি একটা হলদে রংয়ের কাগজে কি সব লিখে একটা স্টম্প করল তারপর তা এগিয়ে দিল অরিন্দমের দিকে, বলল, “এই নাও তোমার পরিচয়-পত্র, সহরের শেষ দিকে, নীচুপাড়ায় থাকবে তুমি—যাও”—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “এই কাগজ দিয়ে কি করব?”

“কি করবে? আরে এইটেইতো তোমার প্রাণ হুঁ—এইটে দেখাবো পরে রোজকার খাবার পাবে, পুরবার কাপড় পাবে। এটা না থাকলে মরবে।”

“ও—আচ্ছা”—

অরিন্দম সরে এল একপাশে। বটে! এই একটুকরো কাগজেও এত ক্ষমতা! আশ্চর্য, আজবনগরের সবই আশ্চর্য!

“গোই—গুনছ?”

সেই দু’জন রক্ষী কাছে এগিয়ে এল।

“কি বলছেন?”

“একজন রক্ষী মৃত হেসে বলল, “কিছু গমসাও বাবা?”

“কি গমসা?” অরিন্দম অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। কথাটা সে বুঝতে পারল না।

রক্ষীটি আরো কাছে এল, বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মুহূর্তে বলল,
 “কিছু পয়সা বের কর। আমরা তোমাকে তাড়িয়ে দিইনি বলেই তো
 পরিচয়-পত্র পেলে, সহরে চুকতে পারলে। তার জন্য কিছু সেলামী
 চাই। জানানো, রক্ষকেরাই যে ভক্ষক”—

“কিন্তু আমার কাছে তো ক নেই তাই।”

“আর মজাক করিসনা শালা, বের কর।”

“সত্যি কিছু নেই—সত্যি”—

রক্ষীটি সক্রোধে তার ডান হাতটা চেপে ধরল, চোখ পাকিয়ে বলল,
 “কের মিছে কথা! দেখি শালা, তোর ট্যাংক দেখি”—বলেই সে
 অরিন্দমের কোমরে হাত দিয়ে পয়সা খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না
 কিছুই। আক্রোশে, হতাশায় তার কঠিন মুখমণ্ডল কঠিনতর হয়ে
 উঠল।

অরিন্দমকে হিড় হিড় করে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল রক্ষীটি,
 তার হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সে বলল, “শালা একেবারে
 ভিখমাংগা ফকির। কিন্তু তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিচ্ছি না
 বাছাবন—নে, পা টিপে দে খানিকক্ষণ”—

দ্বিতীয় রক্ষীটি হা হা করে হেসে উঠল, “আরে ইয়ার, তুই তো কম
 নস্ দেখছি। হটা—ছেড়ে দে ব্যাটাকে”—

প্রথম রক্ষী মাথা নাড়ল, “না, তা হবে না। নে শালা, পা টেপ
 এবার”—

অরিন্দম প্রথম রক্ষীর দিকে তাকান। জন্তুর মত নির্বোধ, নিষ্করণ
 ও কঠিন লোকটার চোখমুখ। হিংস্র ও লোভী জন্তুর মত। পা
 টিপতে বলছে। পদসেবা! কেন? রক্ষী বলে, শক্তির অধিকারী
 বলে। কিন্তু কেন? হঠাৎ তার মনে পড়ল। সেও একজন প্রহরী
 ছিল। আনন্দের রাজ্যে তার হাতে ছিল একটা ক্ষুধার অসি।
 এখনো যেন তা অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। হুতরাং সে কম কিসে?

মাথা নীচু করবে কেন সে? লোভ ও হিংস্রতার কাছে সে অবনত হবে? না।

সে মাথা সোজা করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “না।”

“না!”

“না”—

“তবেরে শালা, শুয়ারকা বাচ্চা”—

শকু ও ভারী জুতো-পরা পা দিয়ে প্রথম রক্ষী অরিন্দমকে একটা লাথি মারল, বলল, “তোরা হিংস্র তো কম নয়, মুখের ওপর না বললি!”

ইম্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল অরিন্দমের দেহ, একবার তা হুলে উঠল। সে তাকাল। কি করবে সে? শোধ নেবে? কিন্তু তাতে ফল কি হবে? তার ব্রতপালনে বাধা পড়বে। না, তাকে সহ্য করতে হবে।

কিছুই করল না সে, শুধু মুখ ঘুটে বলল, “সাবধান—আমাকে আর অপমান কোরনা”—

“কি! কি বললি?” রক্ষীটি আবার পা তুলল।

কিন্তু বাধা পেল সে। দ্বিতীয় রক্ষী এসে তার হাত ধরে আকর্ষণ করল, “ছেড়ে দে ইয়ার, সময় নষ্ট করে লাভ কি? এই উল্লুকেটা না মেরে চল ততক্ষণে আরো দু'একটা লোককে পাকড়াও করিগে”—

প্রথম রক্ষী থামল, একবার কটনট করে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা চল”—

ভারী জুতোর শব্দ তুলে তারা এগিয়ে গেল।

অরিন্দম হাসল। তার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

সেতু পার হয়ে সাবধানে, সন্তর্পণে এগিয়ে গেল অরিন্দম। জনাকীর্ণ রাজপথ। বিদ্যুৎবেগে গাড়ীগুলো ছুটছে। জনতার মাঝখানে চলতে চলতে একটা উত্তেজনা বোধ হয়। মনে হয় কেন উত্তাল সমুদ্রের একটা তরঙ্গমুখে সে ভেসে চলেছে।



কোলাহল। কত রকমের নরনারী!

চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী লোকদের সে প্রশ্ন করে। আপনা থেকে চলছে যে গাড়ীগুলো, তাদের নাম কি? লোকেরা হাসে, তবু বুঝিয়ে দেয়। বাষ্পযান—গুলো বাষ্পর দ্বারা চলে, বিদ্যুৎ-যান বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। রাস্তার আলোক-স্তম্ভগুলোও বিদ্যুতের সাহায্যে এক মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছামত। আশ্চর্য! অরিন্দম অবাক হয়ে যায়। মানুষের কত শক্তি! প্রাকৃতিক জগতের দৈত্যদানবেরা মানুষের কাছে বশতা স্বীকার করেছে, তাদের সেবা করেছে! বটে! তার বুক ফুলে ওঠে, বড় বড় পা ফেলে সে বাঁধানো, ময়ূণ পথ পার হতে থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে চলে, চলতে চলতে বিশ্বয়-বিমুক্ত দৃষ্টি মেলে সে চারদিকে তাকায়।

ছোট বড় কত অট্টালিকা। ত্রিকোণ, চতুর্কোণ, গোলাকার। একতলা, দোতলা, পাঁচতলা। ছোট ছোট পাহাড়ের মত গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইট, কাঠ, লোহা, চুণ, স্ফটিক দিয়ে মানুষ ইমারত গড়েছে। প্রত্যেকটিই দর্শনযোগ্য। আর কত দোকানপাট। খাও, বস্ত্র, ফল, তরকারী, খুঁটিনাটি অজস্র জিনিষের দোকান। সেখানেও মানুষের ভীড়।

বহুরকমের মানুষ। একজনের সঙ্গে আর একজনের যেমন চেহারা মিল নেই তেমনি তাদের বেশভূষারও মিল নেই। একজন হয়ত বেশমী জামা কাপড় পরে আছে, আর একজন হয়ত ছেঁড়া ও ময়লা একটা ধুতি পরে আছে। কেন? ব্যাপারটা বুঝতে পারে না অরিন্দম। সমুপর্ণে, কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে শুধু এগিয়েই চলে।

ক্রমে বেলা বাড়ে, রাজপথের জনতা বাড়ে, সূর্যালোকের উত্তাপ-বৃদ্ধি হয়। বিরাট সহর আজবনগরটা অরিন্দমের কাছে একান্ত অপরিচিত। কিন্তু তার ওপরকার আকাশটা তার বহু-পরিচিত। আকাশের রং এখানে গাঢ় নয়, ধূসর নীল। তবু পরিচিত। সেই আকাশের দিকে

তাকিয়ে তার আর একটা পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। সেখানে সে
 আনন্দময় জীবনের শ্রোত ব্যবহার মত কিন্তু বেগে বয়ে যায়। সেই
 জীবন-শ্রোতের শব্দ শোনা যায় বাণীর ঝঙ্কারে, বেহালার তারে,
 পাখোয়াজের ধ্বনিত, কিন্নর-কণ্ঠ হুগায়কের আলাপে। জীবন লোভী
 মানুষের কর্মবাস্তবতায় এখন আজবনগর চকল হয়ে উঠেছে, কিন্তু রূপসী
 নদীর ধারে, সেই আনন্দলোভী পুতুলেরা হয়ত এখন আশাবাদীর আলাপ
 শুনেছে আর শালবনে পাতা ঝরেছে, মাটির গর্ভ থেকে তৃণাকুর মাথা
 তুলছে, কোকিল ডাকছে—

অথচ পুতুলদের সেই আনন্দের পৃথিবী তো সে দূরে, বহুদূরে
 ফেলে এসেছে। এটা মানুষের পৃথিবী। এখানেও গানে চলছে। সে গানে
 সুর নেই, মিষ্টতা নেই। যন্ত্রের শব্দ, পদধ্বনি, কোলাহল, হাসি,
 যানবাহনের আওয়াজ—সব মিলে একটা গভীর গুম্ গুম্ শব্দ—মানুষের
 সংগ্রামশীল, কঠিন জীবনের ঘোষণা। মন্দ কি? অরিন্দম হাসল।
 এগিয়ে চল।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে? তাকে তো নীচুপাড়ায় যেতে হবে।
 কোথায় তা? কতদূরে? এদিকে সে পরিশ্রান্ত বোধ করছে, জঁঠরদেশের
 সেই যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠছে। সে থামল, চারদিকে
 তাকাল।

তার ডানদিকে একটা খাবারের দোকান। কাঁচের আনন্দাশ্রমে
 নানারকমের মিষ্টি থাক থাক করে সাঁজানো আছে। দেখে অরিন্দমের
 খেতে ইচ্ছে হল। দোকানের বাইরে, রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে একজন
 বয়স্ক লোক কি যেন চিবোচ্ছিল। বেশ শক্ত জিনিষ, কড়মড় শব্দ হচ্ছিল তা
 চিবোতে। দেখে অবাক হল অরিন্দম, লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটি তাকাল।

“নীচুপাড়া কোথায় বলতে পারো ভাই?”

লোকটি মাথা নাড়ল, “পারি”—

“কোথায়?”

“সহরের পেছনদিকে”—

“ওঃ—আচ্ছা”—

“তুমি বুঝি সহরে নতুন এসেছ?”

“হ্যাঁ”—

“তাহলে তো চিনতে পারবে না, গাড়ী চড়ে যাও”—

“চড়তে দেবে আমাকে?”

“হ্যাঁ, পরস্য থাকলেই দেবে।”

পরস্য! কোথায় তা? দোকানে কত সুন্দর সুন্দর খাবার।
অথচ কি খাচ্ছে লোকটা?

“আপনি কি খাচ্ছেন?”

“ছোলাভাজা।”

“কেন, এই দোকানের খাবার খাচ্ছেন না কেন?”

“পরস্য নেই।”

অবিন্দমের মুখের ওপর যেন একটা ঘুঘি পড়ল। সব কিছুতেই পরস্য!
তাহলে হলদে রঙের ঐ কাগজটা দিয়ে কি হবে?

সে কাগজটা দেব করে লোকটিকে দেখাল, গুশ করল, “কেন, এই
কাগজ দেখালে খাবার দেবে না?”

লোকটি হেসে উঠল, “তুমি পাগল নাকি, এঁা? আরে ঐ পরিচয়-পত্র
থাকলে তুমি জিনিষ কিনতে পারবে বটে কিন্তু কিনতে গেলে পরিচয়-পত্র
ছাড়াও আর একটা জিনিষ লাগবে—তা পরস্য। পরিচয়-পত্র বাচবার
অধিকার দিল বটে কিন্তু বাচতে হলে টাকাপরস্য খরচ করতে হবে।
আর আসল কথা কি জান? টাকাকড়ি হাজার হাজার থাকলে তোমার
পরিচয়-পত্রেরও দরকার নেই, এমনিতেই সব কিছু পাবে”—

“বাঃ, তাহলে এই পরিচয়-পত্র দিল কেন?”

“ওগুলো গরীবদের জন্ত।”

“গরীব মানে ? যাদের পয়সাকড়ি নে ?”

“হ্যাঁ, যাদের টাকাপয়সা থাকে না, থাকলেও কম থাকে।”

“আর যাদের পয়সাকড়ি থাকে তারা কি ?”

“তারা বড়লোক, ধনী।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। আজবনগরের কাণ্ডকারখানা তারি জটিল মনে হচ্ছে। না, উপায় নেই। ক্ষুধার স্বর্ণা তাকে মুখ বুজেই সহ্য করতে হবে। তাকে এখন একটা কাজ সংগ্রহ করতে হবে। কাজ করলে পয়সা পাবে সে। সেই পয়সা দিয়ে খাবার কিনবে, ক্ষুধাকে দমন করবে। তারপর তার আসল কাজ।

সেই লোকটি রাস্তার পারে, একটা কল থেকে দু’তিন আঁজলা জল খেল, কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, “তুমি নীচুপাড়ার যাবে বলছিলে না ? যাবে তো চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি”—

বাগরকণ্ঠে অরিন্দম বলল, “চলুন, চলুন”—

দু’জনে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে তারা পরস্পরের পরিচয় সংগ্রহ করল। অরিন্দম নিজের বিষয়ে ভাসা ভাসা জবাব দিল। আর লোকটি বলল যে তার নাম বলরাম। বলরামের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। লম্বা, তামাটে রংয়ের চেহারা তার। পাটকলের কারখানার সে কাজ করে। রাতের বেলাতে কাজ ছিল, এখন বাড়ী ফিরছে। বাড়ীতে তার বৌ আছে, একটি জোয়ান ছেলে ও দু’টি সোমন্ত মেয়ে আছে। বড় মেয়ে বিধবা। তাছাড়াও আরো চারটি ছোট ছেলেমেয়ে আছে বলরামের। ছেলের নাম মুকুন্দ, কোন একটা মোটর কেম্পানীতে কাজ করে সে, পায় চল্লিশ টাকা। আর বলরাম পায় বিয়াল্লিশ টাকা। তাতে সংসার চলে না। ছেলেটা মদ পায়, দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। আজকাল বাজার চড়া, জিনিষ-পত্র আগুন, বাঁচা কঠিন। অল্প আরো সংসার চলেনা-চলেনা করেও চলে। নিভন্ত পিঙ্গিরের মত। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মৃত্যুর মত।

বলরাম বুড়ো হতে চলেছে, অকালে। কিন্তু অনেকেই আছে, অনেক জোয়ান ছেলেরা—তারা মাঝে মাঝে জটলা পাকায় আর কি যেন আলোচনা করে। তাদের দু'চোখে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে। ভবিষ্যতের অঙ্ককারকে তারা নাকি দূর করবে, তারা নাকি একদিন—পাগল, ছেলেগুলো সবাই পাগল।

বলরাম একটা বিড়ি ধরিয়ে হাসতে লাগল, বলল, “বেহুদ পাগল ছেলেগুলো—একেবারে হতভাগা”—

অরিন্দম হাসল না, শুধু বিড়িবিড় করে বলল, “তবু, ঐ সব পাগলদের সঙ্গেই আমি ভাব করব, আলাপ করব”—

তারা এগিয়ে চলল। বড় বড় অট্টালিকার মাঝখান দিয়ে এদিকে ওদিকে অসংখ্য রাস্তা গেছে। রাস্তাগুলো থেকে বেরিয়েছে সংখ্যাভীত গলি। ঝকঝকে তকতকে পথঘাট। চকচকে গাড়ী। হুসজ্জিত পুরুষেরা। দেখতে ভালো লাগে। আর হুসজ্জিতা মেয়েরা। রসালো কলের মত মুখ, খঞ্জনপাখীর মত চোখ, মেঘের মত চুল, ধূকের মত ঠোঁট, উন্নত বুক আর সুগঠিত অঙ্গরেখা। বূকের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত পুলক, অপূর্ণ কামনা। দেহের বিচিত্র ধর্ম। ক্ষুধা। শব্দ, কোলাহল, বাস্তব জগৎ মাগুযেরা। এ রাস্তা সে রাস্তা করে এগোল তারা। পথ যেন ফুরোবেই না। একটা রাস্তা শেষ হতেই আর একটা রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। একটা অট্টালিকার পর আর একটা অট্টালিকা। ইট, কাঠ, লোহার বসায়ণ। আজবনগর।

কিন্তু ক্রমেই পথ শেষ হয়ে আসে। সবহটা ঢালু হয়ে নীচের নিকে নেমে যায়। অট্টালিকার ঘন সারি হঠাৎ পাংলা হয়ে আসে, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। তারপরে বেশ খানিকটা ফাঁক, ছোটখাটো একটা খেলার মাঠের মত। আর তার ওপারে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর শুধু ছোট বড় আটচালা, টালি, টিন আর শণের ছাউনী দেওয়া বাড়ী। মাটির দেয়াল, কাঠের দেয়াল, হোগলা পাতার

দেয়াল। মাঝে মাঝে ডাকা ডাকা দোতলা তেতলা শাকা বাড়ী। অপরিচ্ছন্ন, মনি, ময়লা। আর এই বিরাট ও বিস্তৃত এলাকার শেষ সীমান্তে, পূর্বদিকে, দিগন্তের কোল ঘেঁষে রয়েছে বড় বড় কারখানা। তাদের গগনস্পর্শী ধূম্রনলগুলো সারিবদ্ধ লৌহদানবের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পুঞ্জ পুঞ্জ কালো নিঃশ্বাস আকাশকে বিঘাঙ্ক করার চেষ্টা করছে।

বলরাম বলল, “দেখতে পাচ্ছ?”

অরিন্দম মুগ্ধ ফেরাল, “কি?”

“ওইটেই নীচুপাড়া।”

“বটে!”

অরিন্দম তাকাল। নীচুপাড়ার চেহারাটা তো ভালো নয়। নোংরা, কুৎসিত, হতভী। পেছনে ফেলে-আসা বড় বড় অট্টালিকা ও শোকান-পাটের সৌন্দর্য এখানে নেই। প্রধানকার সব কিছুই যেন শূণ্যতার মোড়া, অন্ধকারে ঢাকা, কুৎসিত।

“তাহলে ওদিকটার নাম কি—এ সব ভালো ভালো রাস্তা আর বড় বড় বাড়ী কোথানে?”

বলরাম হাসল, “এটা হচ্ছে উঁচুপাড়া—আমরা বলি বাবুপাড়া—

“হু”—

“আরো একটি পাড়া আছে দক্ষিণে, সেটা ছোট—সেখানে যারা থাকে তারা বড়লোকও নয়, গরীবও নয়। সেই পাড়ার নাম মাঝারিপাড়া।”

অরিন্দম আবার হল, সে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা, এই তিন পাড়ার মাঝবে প্রভেদ কি?”

বলরাম জবাব দিল, “শুনে বোঝা যায় না, দেখে বুঝতে হয়। নাও, এবার তুমি নীচুপাড়ায় গিয়ে বাড়ী খোঁজগে—আমি যাই, পরে হয়ত দেখা হবে।”

“হ্যাঁ, হয়ত—”

বলরাম বাদিকে চলে গেল। অরিন্দম কি ভেবে ডানদিকে চলল।
 একটা খাকার জায়গা চাই তার। প্রথমে তা ঠিক করে সে কাজ ও
 আহ্বারের খোঁজে বেরোবে। ঢালু জমির ওপর দিয়ে সে নীচুপাড়া
 গিয়ে পৌঁছল, তারপর ঘুরতে আরম্ভ করল। এখানে রাস্তা ময়ন নয়,
 পাথর আর খোয়া-উঠা, পিচ-ভাঙ্গা। উঁচুপাড়ার মত নালি নর্দমা ভূগর্ভে
 নয়, মাটির ওপরে। উঁচুপাড়ার ময়লা ও নোংরা জল সব এখানকার
 গোলা নালি দিয়ে চলে যায়। পচা জল, তার ওপরে মরা মাছি অনবরত
 ভনভন করে। রাস্তার দু'পাশে টিনের আবর্জনা-পায়ে স্থপীকৃত আবর্জনা,
 তা উপচে রাস্তায় পড়েছে। কলাপাতা, এঁটোকাটা, ছাই, তরকারীর
 পোসা, নোংরা ক্রাকড়া, ভাঙ্গা কাঁচ, ফুটো টিন আর মরা ইঁদুর। দুর্গন্ধ।
 মাটির দেওয়াল, নোনামরা ইঁটের দেওয়াল। সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি।
 অসংখ্য। গরুর গাড়ী, রিক্সা। আশ্চর্য! মাতৃশ জন্তুর মত মানুষকে
 বয়ে বেড়ায়! চায়ের দোকান। পবিত্র ভোজনালয়। শিখাধারী
 মাহুষ, দাড়িওয়ালা লুঙ্গি-পরিহিত মাহুষ, দাড়িওয়ালা পাগড়ি-পরিহিত
 মাহুষ। বিড়ির দোঁয়া, চায়ের দোঁয়া। জ্বিজে জল আসে। ক্ষুধা।
 লোহালক্কড়ের দোকান। কামার, ছুতোর, মিস্ত্রী। বাস্তব তৈরীর কারখানা,
 দর্জির দোকান। মাংস-বিক্রেতা। এঁকেবেঁকে গেছে রাস্তা। সর্বত্র
 নাথা নাড়ে লোকে। না, খাকার জায়গা নেই। কোথাও বলে, আছে,
 দশটাকা ভাড়া, খাকা খাওয়া চল্লিশ টাকা। কিন্তু কোথায় টাকা?
 বিসপিল পথ। তবুও চলতে হবে। পান বিড়ির দোকান। বড় বাড়ী।
 অগুনতি মাহুষের ভীড়। কারখানা, দোকান, অফিস-ঘাত্রী মাহুষ।
 নানা দৃশ্য। বুড়ো বুড়ীরা বারান্দায় চটের ওপর বসে আছে। একটা ছোট
 ছেলে কুণ্ডাটো হয়ে বসে ফুটি চিবোচ্ছে। একজন লোক গোত্রাসে ভাত
 গিলছে। ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মূড়ির দোকান। জলের কল।
 তাকে কেন্দ্র করে মেয়েরা ভিড় করেছে। ঝগড়া চলছে।

“আর কত জল নিবি লা?”

“কেমন লা? এই এক কবলীই তো নিছ”—

“মর ছুঁড়ী, মিথ্যে কথা বলিসনি। বলি ঘরে কি পুতুর কাটছিল নাকি লা?”

“দেখ শৈলী, যুধ সামলে কথা বলিস—নইলে তোরা মাথার চুল টেনে তোকে নেড়ী করে দেব”—

“তব্বেরে হারামজাদী, দে দেখি”—

আরিন্দম এগিয়ে চলল। মেয়েদের ঝগড়া বড় বিনোদন ব্যাপার। একটা বটগাছ, তার নীচে কতকগুলো লোক। তারা তাস খেলছে আর ট্যাক থেকে পয়সা বের করছে। খেলার শেষে যে জিতছে সে পয়সাগুলো টেনে নিচ্ছে।

“কি খেলা হচ্ছে ভাই?”

“তিন পাতি”—

“মানে?”

“মানে জুয়া, বুড়েচ এবার?”

টাকা পয়সার খেলা। লোভ। এগিয়ে চল। একটা বাড়ীতে একজন যত্নাকৃতি লোক তার আট বছরের ছেলেকে মারছে। ছেলেটা তারশ্বরে কাঁদছে। মুরগী ডাকছে। একটা রোয়া-ওঠা কুকুর আত্মকুঁড়ের মধ্যে সবত্রে থাবার খুঁজছে। একটা পাঠা ছুটেছে একটা ছাগীর পেছনে। একজন রোগামত লোক একটি যুবতীকে মারছে, সেখানে হাশ্মুখ ভীড় জমেছে। কি ব্যাপার? এদিকে কারখানা থেকে তীব্র বাষ্পের আওয়াজ ভেসে আসে। বেলা বাড়ে। সর্বাস্থে ঘাম ঝড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় পেটের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। আর অনেক ঘুরেও এক কথা—খাকার জায়গা নেই, সহরে ভীড় বেড়েছে। কিংবা থাকতে হলে টাকা লাগবে। না, আর পায়া যায় না। আরিন্দম থামল, একটা গাছতলায় গিয়ে বসল। গাছের শুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল। মাথার ভেতরে, বন্ধ চোখের সামনে যেন বিদ্যুৎ চমকে যেতে লাগল।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল একটা মূহু শিহরণ। স্তম্ভি। স্তম্ভিকর স্তম্ভ।
স্বর্ঘ্যের এখন কোথায়? মাথার ওপরে। মধুমাধব সারসের মূহুনা কি
এখনকার বাতাসে নেই?

“ও মশাই, কি হল?”

অবিন্দম চোখ মেলল। বলরাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

“কি ব্যাপার? গাছতলায় বসে যে? জায়গা পুণি কোল?”

“না। পেলোও এখন টাকা দিতে হবে—অথচ টাকা নেই।”

“তাহলে? কি করবে?”

“ভাবছি।”

“হু”—

বলরাম অবিন্দমের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অবিন্দমের
চেহারা থেকে সে তার অন্তরকে জানতে চাইল, তারপরে কি ভেবে নিয়ে
বলল, “একটা কাজ করতে পার”—

“কি?”

“আমার বাড়ীতে বাইরে একটা খালি ঘর আছে। ঘরটা একটু
ভাঙা—তবু থাকা যেতে পারে। যাবে?”

অবিন্দম হাসল, “আমার যে টাকা নেই?”

“পরে দিও, তার জন্যে এখন আর তোমাকে ভাবতে হবে না।”

অবিন্দম খুশী হল। আজবনগরেও মানুষের মত মানুষ আছে।
সে উঠে দাঁড়াল বলল, “চলুন”—

বেশী দূরে নয় বাড়ীটা। একটা দাঁতসেঁতে ও অঙ্ককার গলির
শেষে বাড়ীটা। মেঝে আর দেয়াল বাঁশের ওপর মাটি লেপে তৈরী
হয়েছে, দরজা ডানালাগুলো কাঠের আর ছাউনিটা টালির। বাইরের
ঘরটাতে একজন মানুষ থাকতে পারে, তবে একটা কোণের টালি
ভেঙ্গে পড়ায় ভেতরে জল হাঁ দা আসে। অব্যবহৃত. অবস্থায়
বহুদিন পড়ে থাকার দরুণ ধুলোয় অঙ্ককার হয়ে আছে ঘরটা, ভিজ়ে ভিজ়ে

একটা গন্ধে ভরে আছে। কবরের গন্ধ। যেন বাড়ীটা—নীচুপাড়ার সমস্ত বাড়ীগুলোই যেন কবরের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর মানুষগুলো সবাই প্রেত। রক্ত ছিল, মাংস ছিল, এখন আর নেই। আবার রক্ত চাই, মাংস চাই, তবে তারা মানুষ হবে। তাতে যদি পুতুলের রঙীন হৃদয় যোগ হয় তবে হবে পরিপূর্ণতা। দূরে, বহুদূরে সেই মণিমানিক্য পচিত কঙ্ক। অনেক কাছ। হাতের তলোয়ার কবে বলসাবে ?

বলরাম বলল, “ঘরটা পরিষ্কার না করলে দেখছি থাকা দায় হবে, তাই না ?”

অরিন্দম হাসল, “তা নয়, তবে পরিষ্কার করলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি”—

“না, না, তা কি হয়, আমি আমার মেয়েকে ডাকছি। ললিতা—ওরে অ’ ললিতা”—

একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, “মাই বাবা”—

নারীকণ্ঠ না কোকিলের ডাক !

অরিন্দম তাকাল। দরজার গোড়ায় একটি ঘোল মতের বছরের যুবতী এসে দাঁড়াল। যেন কবরে ফুল ফুটলো। যেন জীবন এসে বলল যে মৃত্যুই শেষ নয়।

অরিন্দম দেখল যে ললিতা সুন্দরী। যেন স্নানিত রাগের ভাষা। সাধারণ ও মোটা একটা সাড়ী তার পরণে। হাতে কয়েকটা কাঁচের চুড়ী। বেশভূষা ও অলঙ্কার মাত্র এই। কারণ তার বেশী আর দরকার নেই। রূপের মধ্যে খুঁত থাকলেই তো অলঙ্কার দিয়ে ঢাকা হয়। ললিতার খুঁত নেই। বিস্কৃত কালো সমুদ্রের মত গুরুদ্বায়িত তার কেশপাশ, অর্ধচন্দ্রের মত ললাটদেশ। উড়ন্ত বাজপাখীর ডানার মত একজোড়া ভুরু নীচে তার পশ্চতাবাননত কালিন্দী-কালো চোখ। বাণীর মত নাক, রক্তিম গাল, প্রবাল-দগ্ন মত ঠোট। কণ্ঠদেশে

ছোটো রক্তিম রেখা, যেন পদ্যফুলের পাগড়ির ওপরকার লেখা। তরী,
 মৃণালভূজ, পীনোদ্ধত ঘনস্তন, ক্ষীণকটি, গুরু নিতম্ব, স্তম্ভের মত উরুদেশের
 রেখা। আর গায়ের রং যেন শিশিরে ধোওয়া আন্দের মঞ্জরীর মত।
 অপরূপ চন্দোময় একটি কবিতা। সব মিলিয়ে একটি নবমল্লিকা ফুল।
 কিন্তু রূপ শুধু তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর দেহবর্ণ নয়। আরো কিছু ছিল,
 আরো কিছু। সেই সৌন্দর্যকে বর্ণনা করা যায় না। তাকে শুধু
 অমুভব করে জানা যায়। তা অদৃশ্য আর অদৃশ্যভাবেই তা এল, নিঃশব্দে
 তা রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জার ভেতরে ছড়িয়ে গেল, সমগ্র চেতনাকে
 স্বরভিত ও পুলকিত করে তুলল এবং অরিন্দম গর্বিত হয়ে উঠল।
 মাহুষের জীবনের এই আশ্চর্য অমুভূতি কী আশ্চর্য ব্যাপার! দেহ
 থেকে দেহাতীতের অমুভূতি, স্থূল হতে সূক্ষ্মের জন্ম। অপূর্ণ।

ললিতা এসে অপরিচিত লোক দেখে একটু বিব্রত বোধ করল,
 ক্ষতকণ্ঠে সে তাই বাপকে প্রশ্ন করল, “কি জন্তে ডাকছ বাবা?
 কি চাই?”

বলরাম বলল, “এই ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দে তো মা”—

“কেন বাবা?”

“এখানে এই ডেলোটি থাকবে এখন থেকে—ওর নাম অরিন্দম”।

অরিন্দম দেখল যে ললিতা একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখটা
 ফিরিয়ে নিল, তারপরে বলল, “আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি
 বাবা—”

ললিতা ভেতরে গেল।

বলরাম বলল, “আমার মেজ মেয়ে। বড় মেয়েও আছে, নাম
 অমিতা—মাত্র উনিশ বছর বয়েস তার, দু’বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, বছর
 না পেরোতেই হতভাগী বিধবা হয়েছে—”

ললিতা একটা ঝাড়ু নিয়ে ফিরে এল। পেছনে দুটি নগ্ন ছেলেমেয়ে।
 একটি তিন বছরের মেয়ে, আর একটি পাঁচ বছরের ছেলে। এবং সবার

পেছনে আর একজনকে দেখা গেল, যাকে দেখেই অরিন্দম অস্থম্যান
করল যে সে অমিতা।

অমিতা যেন বিচ্যুত। ললিতার চেয়েও উজ্জ্বল তার গায়ের রং
—যেন আগুন। কিন্তু বোনের মত তার দেহায়ে গুপ্ত নয়, একটু
মেঘসমূহ। খান ধুতি পরাতেও তার জ্বালাময়ী রূপের বিকৃতি ঘটেনি
বা উজ্জ্বল্য কমেনি। অরিন্দম দেখল যে তার ডাঁচোখে সুরধার দীপ্তি,
প্রশ্ন ও হিংস্র তার চাহনি, যেন সে মানুষের দিকে তাকালেই তার
অন্তরদেশ পর্যন্ত দেখতে পায়। আর তার সারাদেহে মদির লাজ।
একটা নির্লজ্জ আনয়ন। অরিন্দম মুখ কিরিয়ে নিল, অমিতার দিকে
তাকিয়ে থাকা যায় না।

বহুদিনের দক্ষিত ধূলোতে আলোড়ন জাগল, উদ্ভত ধূলিকণার চাকল্যে
ঘরটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। অরিন্দম ও বলরাম দিগে বাইরে দাঁড়াল।
বাইরে ঘাবার সময় অরিন্দম আবার দেখতে পেল যে অমিতা তাকে
কৌতূহলের সঙ্গে তখনো দেখছে।

হঠাৎ অমিতা মুখটা কিরিয়ে নিল, ঘরের ভেতর ঢুকে ললিতার হাত
থেকে বাড়ুটা কেড়ে নিয়ে বলল, “আমি ঝাঁটা দিচ্ছি, তুই না হয় ভল
নিয়ে আয়গে—”

ললিতা থমকে দাঁড়াল, একবার দিমির দিকে একটা বিচিত্র
প্রতিবাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
অরিন্দম দেখল যে ললিতার গমনভঙ্গীতে শাস্ত্র প্রাপ্ত হাত আছে। যেন
সে কোন রাজবাংশের মেয়ে।

বানিকবাগেই পরিষ্কার হয়ে গেল। একটা মাথা এনে মেঝেতে
বিড়িয়ে দিল ললিতা। নারী-হস্তের কল্যাণম্পর্শে ভাঙ্গা ও নোংরা ঘরটা
হঠাৎ যেন বদলে গেল। বিষয় একটা শুচিতা দেখা দিল সেখানে।
অরিন্দম হাসল। মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী। নারীই শ্রেষ্ঠ। কারণ
নারী শুধু স্বদর্শনাই নয়, সে জ্ঞাতশিল্পী, জীবন-শিল্পী।

বলরাম বলল, “এবার ? যাওয়া দাওয়াটা—”

অরিন্দম তারাতাড়ি বলল, “সে সব হবে, আপনি ভাববেন না—
শুধু একটা ছেঁড়া জামা দিন আমাকে”—

অমিতা ও ললিতা তখনও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

অমিতা বলল, “চাট্টি ভাত চাপাব নাকি বাবা ?”

বলরাম সায় দিল, “নিশ্চয়ই, মা’কে বলগে—”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না। আপনারা ভাববেন না, আমায়
বাকী ব্যবস্থা আমি করে নেব। কেন জানেন ? যথেষ্ট সাহায্য
পেলান, আরো সাহায্য পেলে আমার আত্ম-প্রত্যয় নষ্ট হবে।”

বলরাম হাসল, “আচ্ছা বাবা, যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি
তাহলে আসি।”

“আস্থন।”

বলরাম চলে গেল। ললিতা একটা পুরোন জামা এনে দিয়ে চলে
গেল, বাচ্চারা তাকে অঙ্গুসংগ করল। সবার পেছনে গেল অমিতা।
ভেতরে যাবার দরজাটা পার হবার সময় সে হঠাৎ একবার
ঘুরে দাঁড়াল, অরিন্দমকে এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে
ভেতরে চলে গেল। সেই এক ঝলক চাহনির সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম
একটা হাসির রেখাও দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। কেন তা
অরিন্দম বুঝতে পারল না। ঘরের ভেতরে গিয়ে সে মাহুরের ওপর
বসল। ললিতা বিছিয়ে দিয়েছে। ললিতা শাস্ত নদী। অমিতা
খরস্রোতা। ললিতা সূক্ষ্ম ও অমিতা স্থূল। ললিতা গভীর, অমিতা
তা নয়। কে জানে ? তার হৃদয়ে জীবন। মাহুয হিসেবে নারী-
দের বিষয়ে তার একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্তু তা কতটুকু ?
দীর্ঘে দীর্ঘে জানতে হবে সব কিছু। নারী প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি
হর্বোধ্য, হুজুয়ে, শক্তিশালী। মাহুয প্রকৃতিকে জয় করে, পুরুষ
জয় করে নারীকে। প্রয়োজন। একে একে দুই। আবার দুই

হায়ে এক। আশ্চর্য। মাত্র দুদিনের জীবনে তার কত কাণ্ড ঘটল! কত মাহুষ এল তার জীবনে। এতো সবে শুরু। আরো কত ঘটনা ঘটবে। এখনো তো সংগ্রাম ঘোষণা করেনি দে। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। ক্ষুধা। একটাকা পয়সা? বেরোতে হবে। উচুপাড়ায় গিয়ে কাজ খুঁজতে হবে, সেখানেই নাকি তা সহজে পাওয়া যায়। বলরাম তাই বলছিল। নীচুপাড়ায় কাজ নেই। এখানকার সবাই কাজ করে। কাজ করতে হবে। কাজ করলে পয়সা আসবে। তবে খাচ্ছ। আর বেঁচে না থাকতে পারলে কোন সংগ্রামই করা বাবে না।

অরিম্ভ উঠে দাঁড়াল। ক্লান্তি। তবু যেতে হবে। বেঁচে থাক, মাহুষের কর্তব্য। আর সংগ্রামের জন্য বেঁচে থাকা একটা পবিত্র কর্তব্য। এগিয়ে চল।

নীচুপাড়ার জীবন যেন বধীর নদীর মত। উদ্‌য়, প্রোতসঙ্কল। মাহুষ, জন্তু ও বস্তুর সম্মিলিত চীৎকার ও পন্দলনিতে তার আকাশটা যেন বারংবার কেঁপে ওঠে। আর সেই আকাশকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করে, তার বুকে আগুনের আখবে অদৃশ্য ঘোষণা লিখে সূর্যদেব পশ্চিমে চলে পড়েন। তার আলোকে আলোকিত মহানগরকে মনে হয় নির্মম, কঠিন ও উজ্জল। আকাশপথে বিকশিত বিদ্যুৎ ও সংবাদবাহী তারগুলো যেন রূপের সূত্যের মত চঞ্চল করে। দ্রুতবেগে হাজার হাজার বাষ্পবান ছুটোছুটি করে। রাজপথে প্রোধিত লোহার লাইনের ওপর দিয়ে সমস্ত ছুটে চলে বিদ্যুৎ বানগুলি। স্বর্গাতপ-তপ্ত লোহার লাইনের সঙ্গে লোহার চাকার সংঘর্ষ হয়—কর্কশ অথচ চন্মোবৃত্ত শব্দ ওঠে, উগ্র একটা ধাতব ও পোড়া গন্ধ

ছড়ায় বাতাসে, বিদ্যুতের চকিত কটাক্ষে স্থালোক শিহরিত হয়।
আর প্রশস্ত রাজপথটাকে যেন উত্তপ্ত দর্পণের মত, মরিচীকায়
মরুভূমির মত নিষ্করণ মনে হতে থাকে।

অরিন্দম থামল। সামনেই একটি শাসনবিভাগীয় দপ্তরখানা,
সেখানে নাকি লোক চাই। রাস্তায় একজন বলেছিল তাকে। দেখা
যাক ভেতরে গিয়ে।

ভেতরে একজন লোক তাকে আটকাল।

“কি চাই?”

অরিন্দম বলল, “আমি কাজের খোজে এসেছি।”

“কাজ মানে? চাকরী?”

“হ্যাঁ।”

“দাঁড়াও—জুঁজুরকে খবর দিই। তোমার নাম?”

অরিন্দম নাম বলল। লোকটি ভেতরের দিকের ছোট ঘরটাতে
গিয়ে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই লোকটি বেরিয়ে এসে অরিন্দমকে
ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল।

অরিন্দম সেই ঘরটার ভেতরে ঢুকল।

ঝকঝকে ঘরটা। মাঝখানে কার্পেট বিছানো, তার ওপরে দামী
কাঠের টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের ওপর নানা কাগজপত্র সাজানো
আছে। টেবিলের ওধারে, দরজার দিকে মুখ করে, মূল্যবান পোষাক-
পরিহিত একজন প্রোট লোক বসে আছে। তার মাথায় টাক,
চোখে সোনার চশমা, হাতে দামী ধূস্রবস্ত্র। অরিন্দম দাঁড়াল।

প্রোট লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একবার অরিন্দমের আপাদ-
মস্তক নিরীক্ষণ করল, তার মোটা মোটা ঠোঁটের কোণে হাস
ও অবজ্ঞাসূচক একটা হাসি খেলে গেল, সে প্রশ্ন করল, “কি চাই
তোমার?”

অরিন্দম জবাব দিল “আমার একটা কাজ না হলোই নয়।”

“কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি?”

“মানে?”

লোকটি ভ্রুকুণ্ঠিত করল, কর্কশ কণ্ঠে বলল, “মানে উপাধি—ডিগ্রি?”

“আমার তা নেই।”

“হঁ। তুমি দরখাস্ত করেছিলে?”

“না।”

“তোমার জ্ঞান ওকালতি করার কেউ আছে? পর, কোন মন্ত্রী, কোন দেশনেতা কিংবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী?”

“না।”

প্রৌঢ় লোকটি অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল, “না! তাহলে তুমি এবার আসতে পার, তোমার চাকরী হবে না।”

“হবে না? আচ্ছা তবে আসি”—

অবিন্দম পা বাড়াল।

প্রৌঢ় লোকটির মুখ হাসিতে ভরে উঠল, বিড় বিড় করে সে আপন মনে বলল, “উল্লাদ, পুরোপুরি উল্লাদ।” হঠাৎ সে থামল, কি ভেবে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, “ওহে, শোন শোন”—

অবিন্দম ঘুরে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় বলল, “তুমি নিশ্চয়ই আবার চাকরীর চেষ্টা করবে, কেমন?”

“হ্যা।”

“তাহলে একটা উপদেশ দিচ্ছি তোমায়—মানে রাখলে ফল পাবে।”

“বলুন।”

“চাকরি পেতে হলে কোন বড় লোকের সুপারিশ দরকার— তা নইলে আমার মত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খোসামোদ করতে হয়। মানে খুব ‘হজুর’ ‘হজুর’ করে কথা বলবে, বলবে ‘হজুর,

আমি আপনার একান্ত অহুগত ভৃত্য হুজুর, আমি আপনার দাস, ভিক্ষে
বুঝলে ? তাতেও ফল না পেলে পা ধরে লেহন করবে—”

“বুঝেছি।”

অরিন্দম বেরিয়ে এল সেখান থেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে সে মনে
মনে হাসল। একটা অদ্ভুত জগতে সে এসে হাজির হয়েছে।
এখানকার চালচলন সবই বিচিত্র। কিন্তু ‘হুজুর হুজুর’ করতে হবে
কেন ? কর্মপ্রার্থীরা কি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দাস ? মাহুষ কি
মাহুষের ক্রীতদাস ? প্রৌঢ় লোকটির কথা থেকে তো তাই মনে
হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে অরিন্দমের মন কঠিন হয়ে উঠল, তার
সারা দেহের রক্তশ্রোত যেন হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে তার মস্তিষ্কে এসে
আশ্রয় নিল। আজবনগরের মাহুষেরা কি মাহুষকে শ্রদ্ধা করেনা ?

আবার হাঁটতে শুরু করল সে। রৌত্রালোকিত রাজপথকে
ভেদ করে। সারিবদ্ধ স্তম্ভাচ্ছ অট্টালিকাশ্রেণীর পাশ দিয়ে, কর্মত্যাগ
উত্তেজিত জনতার মাঝখান দিয়ে। বাধাই কালো পথটা যেন কালো
পাথরের মত গরম হয়ে উঠেছে, পায়ের তলা পুড়ে ছাই হতে চায়।
ক্লান্তিতে পা ভেঙ্গে আসতে চায়, বসে পড়তে ইচ্ছে করে, ঘামে
স্বাঙ্গ ভিজ়ে ওঠে। তবু চলতে লাগল সে। রাস্তার ডানদিকের
সম্মুখ পদপথটার ওপর দিয়ে অরিন্দম এগিয়ে চলল। একটা
কাজ চাই।

আরো কয়েকটা জায়গায় ঘুরল সে। রাস্তার লোকদের কাছ
থেকে খবর সংগ্রহ করে আরো কয়েকটা জায়গায় সন্ধান করল সে।
সর্বত্র একই ইতিহাস। না কাজ নেই। এমনভাবে দুপুর কাটল,
বিকেল কাটল, সূর্যদেব পশ্চিমদিকে আরো, আরো চলে পড়লেন,
দিগন্তের পরপারবর্তী এক অদৃশ্যলোকবাসিনী বিরহিনী কাস্তাব উচ্চ
বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের জ্বালা দূর করার কামনায় তিনি
রক্তিম-জ্যোতি হয়ে উঠলেন। নির্মম সূর্যদেবের এই স্নিগ্ধ রূপ দেখে

কলকিত হল, বিকাশোন্মুখ নানা পুষ্পকলিরা এবার নির্ভয়ে
 এদের পরাগ-কলস মেলি ধরল আর আকাশের বিবাগী মেঘেরা
 রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে নিকুন্দেশের পথে পা বাড়াল।

ক্লান্তি। আর পা চলে না, চোখের সামনে মাঝে মাঝে সব
 কৈশেপে ওঠে, কানের মধ্যে ভৌঁভৌঁ শব্দ শোনা যায়, দেহের প্রতি
 অঙ্গিতে একটা তীব্র বেদনা টনটন করতে থাকে। অরিন্দম থামল,
 চলতে চলতে রাস্তার পশ্চিম দিকস্থ বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে বসে পড়ল।
 সতেজ ও সবুজ ঘাসের ঘন আস্তরণে ঢাকা মাঠের স্পর্শটা কি
 রোমাঞ্চকর! বসতেই সারা দেহ জুড়িয়ে গেল, ঘাস ও মাটির গন্ধ-
 মাখা বাতাস এসে গায়ে ঘাম শুকিয়ে দিল। অরিন্দম চারদিকে
 তাকাল। ভ্রমণ-বিলাসীদের ভীড়ে রাস্তা জমজমাট, গাড়ীরও ভীড়
 বেড়েছে, কর্মশ্রান্ত নরনারীরা বাড়ীর দিকে ফিরে চলেছে। অশু-
 গামী সূর্যদেবের রাক্ষ। আলোর মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। অট্টালিকা
 শ্রেণীর গায়ে এবার রহস্যময় গাঙ্গুীর ছোপ লেগেছে, মনে হচ্ছে
 যেন শুক্লো পাচশো হাজার বছরের পুরোন। তাদের ওপর আকাশ।
 তার ঘননীল রং এবার কালো হয়ে এসেছে, সূর্যদেব ডুবে যাচ্ছেন,
 সারিষক পাখীর দল শনশন শব্দে উড়ে যাচ্ছে—দূরে, বহুদূরে—

কিন্তু নী। অরিন্দম নড়ে উঠল, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ
 বুলিয়ে ঢোক গিলল। তার মধ্যে একটি শক্তিশালী শব্দের আবির্ভাব
 ঘটেছে। ক্ষুধা। আগুনের মত। জঠরদেশ যেন পুড়ে যাচ্ছে,
 শরীরটাকে হালকা মনে হচ্ছে, দেহসন্ধিগুলো আলগা ঠেকছে,
 বাতাস, বহু ও ঘনবাহনের সম্মিলিত শব্দ যেন তার মস্তিষ্কে এসে
 জড় হচ্ছে। কখন থাকে সে? কাজ পেলে? কবে কাজ পাওয়া
 যাবে? কাল? মাঝখানে স্তনীর রাত। আজবনগরে তো খাম্বের
 অভাব নেই—তবে? ক্ষুধার্তদের জন্য কি কোন বন্দোবস্ত নেই?
 আলো, বাতাস আর জলের মত কি তা পাওয়া যেতে পারে না?

না, সে কারো কাছে চাইবেনা। মানুষ মানুষের কাছে ভিক্ষে করবে না। অসম্ভব। সে সহ্য করবে। কাল নিশ্চয়ই কাজ পাবে সে। তখন সে থাকবে। আঃ। কতটা থাকবে সে? এত, না এত? মাত্র এতটুকু? উহ—সে প্রচুর থাকবে। অরিন্দম মুখ বিকৃত করল। এই জৈবিক বৃত্তিটা মানুষকে অসহায় করে ফেলে, তাকে অগ্রগতির পথে বাধা দেয়। ক্ষুধাকে জয় করতে হবে। সূর্যদেব কোথায় গেলেন? কোন পৃথিবীতে? কতদূরে তা? সে কি দূরে? বহুদূরে?—

বহু-দূরে, গৌরী নদীর ওপারে, আকাশের গায়ে গা মিলিয়ে যে সব তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণী আছে তাদেরও ওপারে, কোথায় যেন সেই বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত দেশটা। সেখানে, রূপসী নদীর জল এখন কালচে হয়ে উঠছে, প্রজাপতির লতাপাতার অন্তরালে ঝিমোচ্ছে, শালবনের অন্ধকারে নিশাচর জন্তুদের চোখের তারা এখন মণি-মানিক্যের মত জ্বলছে। আর সেই কক্ষের মালোদিত জগতে এখন হয়ত সেই স্বকণ্ঠ গায়ক পুতুলটি শ্রীরাগের আলাপ শুরু করেছে। তার গম্ভীর সুরটা যেন একটা ষজ্জাগ্রিশিখার মত উর্ধ্বলোকের দিকে বাজা করেছে। সেখানে অসীম নীল শূন্যতায় কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো। নীল আগুনের মূর্তি। জন্মান্তর, স্বপ্নান্তর। আনন্দের পিপাসা। আর পূর্বাচলের ষবনিকা সরিয়ে হয়ত তুঙ্গবর্ণ চন্দ্রদেব এখন রাতের রক্তমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছেন—

কে গায়? অরিন্দম চমকে তাকাল চারদিকে। দশ পনের হাত দূরে একটা মস্ত বড় অশ্বখ গাছ, তার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটা রোগামত লোক গান গাইছে। লোকটার পরনে ছেঁড়া, ময়লা ও মোটা ধূতি, গায়ে একটা কালো রংয়ের ফড়িয়া, পাশে একটা তামাটে রংয়ের বড় খলি। চোখ বুজে, গলা ছেড়ে লোকটা গাইছিল। ভারী মিষ্টি সুরটা, বহুদূরবর্তী সেই বিচিত্র দেশের স্বকণ্ঠ পুতুলটির শ্রীরাগের

আলাপের মত। কিন্তু একটু বিষয়। তবু ভারী হৃন্দর। সে গাইছিল—দিন কেটে যায়, দিনের পর দিন কেটে যায়, যে দিন চলে যায় তা আর কোনদিনই ফিরে আসে না, লাল রক্ত ক্রমেই জল হয়ে ওঠে, পায়ের নীচেকার ধুলোয় মিশবার জন্য দেহটা উন্মুখ হয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবু তোমার দেখা পাওয়া যায় না। হে স্বহৃন্দ-লভে, হে ছলনাময়ী বহুবলতা, তবু তোমার পদধ্বনি আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় না, তোমাকে আমি পাঠ না, আমার উন্মুক্ত, তৃষ্ণার্ত বুকের মতো তোমাকে মিশিয়ে নিয়ে আমি দেবতা হতে পারি না।

একি শুধুই গান? অরিন্দমের সবাঙ্গ রোমান্সিত হয়ে উঠল। হৃন্দয়ের গভীরতম প্রদেশে একটা হৃন্দ বেন্দনাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মনে হল যেন সে একা, যেন সে কাউকে চায়, নিবিড়-ভাবে চায়।

সে উঠল, দীর্ঘে দীর্ঘে সেই লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গান শেষ হল, লোকটা চোখ মেলতেই অরিন্দমকে দেখতে পেল।

অরিন্দম হাসল, বলল, “তুমি তো ভারী হৃন্দর গায়!”

লোকটা হাসল, “আমার গাইতে খুব ভাল লাগে।”

অরিন্দম তার পাশে বসল, প্রশ্ন করল, “তোমার গানে বেন্দনা ছিল—তুমি বিরহ জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছ?”

লোকটা হেসে উঠল, “দূর, আমার কেউ নেই?”

“বিয়ে করনি?”

“তুমি বোকা।”

“কেন?”

“আমার চেহারা দেখে বুঝি বুঝতে পারছ না আমি কি চীজ? নিজের পেট চালাতে পারি না তার আবার বিয়ে? দূর—”

পেট! ক্ষমা। মুহূর্তে সমস্ত চেতনা যেন নিভন্ত দীপশিখার মত

কৈশে উঠল, বোবা একটা বস্ত্রগার চাপে দু'হাতে মাঠের ঘাস ঝাঁকড়ে ধরল অরিন্দম। কখন? কখন খেতে পাবে সে? দু'মুঠো ভাত সে কখন মুখে দেবে?

লোকটা বলে চলল, “যা দিনকাল পড়েছে, বেঁচে থাকার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মুচিগিরি করি, সারাদিনে কোনদিন চার আনা, কোনদিন আট আনা পাই। ওতে কি চলে?”

অরিন্দম নিজেকে সামলে নিল, বিন্ময়বিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুমি মুচি! কেন? তুমি গান গেয়ে বাঁচতে পার না?”

লোকটা হাসল, “ছনিয়া বড় মজার জায়গা ভাই, এখানে যে যা করে আনন্দ পায় তা করে সে বাঁচতে পারে না। এখানে সাধু চুরি করে বাঁচে, চোর রাজত্ব করে, গাইয়ে লোক ঝাড়ুদার হয় আর অন্ধম লোকেরা পাঁচতলা বাড়ীতে থাকে—”

লোকটা থামল। শুকতা নেমে এল দু'জনের মধ্যে। অরিন্দম ভাবতে লাগল। লোকটার কথার মধ্যে জালা আছে, দুঃখ আছে। আজবনগরের মাস্তুমেরা তাহলে এই! আচ্ছা দেখা যাক, দেখা যাক।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, বলল, “আসি ভাই, আমাদের বসতিটা অনেক দূরে—”

অরিন্দম মাথা নেড়ে প্রশ্ন করল, “তোমার নাম কি ভাই?”

“নাম?” লোকটা হাসল, “আমার নাম দামোদর।”

লোকটা সেই তামাটে রংয়ের খলিটা কাঁধে ফেলে সেপান থেকে চলে গেল, উত্তরদিকের রাস্তায় হনতার মাঝে সে মিলিয়ে গেল। অরিন্দম বসে রইল, সন্ধ্যা পার হয়ে গেল, রাজপথের আলোকস্তম্ভগুলি জ্বলে উঠল, অট্টালিকাশ্রেণীর গায়ে লিখিত নানাবর্ণের বিজ্ঞাপনগুলো জ্বলতে লাগল, বিদ্যুৎ ও বাষ্পযানগুলো তাদের বড় বড় চোখের তীব্র আলো দিয়ে রাজপথকে উজ্জ্বল করে ছুটোছুটি করতে লাগল।

মাঠের বুকে, ঘাসের মাঝে, ঠাণ্ডা অন্ধকারে 'ঝি' 'ঝি' পোকারা কখন
যে ভাবে শুরু করেছে তা অবিন্দম টের পেল না।

দামোদর চলে গেল। অবিন্দম ভাবতে লাগল। আজবনগরের
কাণ্ডকারখানা ভারী মজার। এখানে মানুষ সব কিছুই করেছে কিন্তু
তা মানুষের জ্ঞান নয়। বৈষম্যই এখানকার ধর্ম, পরস্পরের বিষয়ে
উদাসীনতাই এখানকার স্বাভাবিক ব্যাপার। আচ্ছা, আরো দেখা
যাক। আগে সব কিছু দেখে নেবে সে, তারপরে সে লড়াই শুরু
করবে। তার মনে আছে যে তার হাতে একটা তলোয়ার ছিল,
এখনো যেন তা অদৃশ্য হয়ে আছে তার হাতে। পৃথিবীতে যে অন্তত
পশু-শক্তি আজ মানুষকে মানুষ হতে দিচ্ছে না তাকে সে একদিন
ধ্বংস করবেই।

কিন্তু দেহ যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। পেটের মধ্যে যেন একটা ক্ষিপ্ত
পশু গৌ গৌ শব্দে গর্জাচ্ছে। জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, গলাটা খস খস
করছে, নিঃশ্বাসটা ভারী হয়ে উঠছে। ক্ষুধার জ্বালা। আজবনগরের
এই অপরিচিত পরিবেশে তাকে কে সাহায্য করবে? সেই গ্রামের
সেই বুড়োর মত কোন মানুষ কি এখানে নেই যে ক্ষুধাতকে
সম্মেহে খাওয়াবে? না আর পারা যাচ্ছে না, বাড়ী ফেরাই ভাল।
রাত কাটুক, আবার কাল কাজের চেষ্টা। কাজ পেলে পরে
খাওয়া। মানুষ কত অসহায়! না, আর পারা যাচ্ছে না। পেটের
মধ্যে যেন একটা অতিকায় রাক্ষস ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, তার লোলুপ
বসনা মেলে হিংস্রভাবে কামনা করছে পৃথিবীর সমস্ত খাদ্যকে। ক্ষুধা।

উঁচুপাড়াকে পেছনে ফেলে অবিন্দম এগোল। উঁচুপাড়ার ঘরে ঘরে
তখন বিছাতের আলো দিবসালোকের সৃষ্টি করেছে। নক্ষত্র-খচিত
আকাশ থেকে প্রবাহিত পুঞ্জ পুঞ্জ ঠাণ্ডা অন্ধকার এসে দিনের দাবদাহকে
নির্বাপিত করে কেলছে। রাজপথের আলো, আলোর প্রচারপত্র, এবং
প্রতি গৃহের আগোশ-সম্মেলন তখন উঁচুপাড়ার মাথার ওপরে একটা

হালকা জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। পূর্বাচলে উদ্ভাসের মতই চন্দ্রদেবকে মনে হচ্ছে ভারী বিবর্ণ, ভারী পাণ্ডুর। রাজপথে নরনারীর শ্রোত, স্তন্যদায়ী নারীর হাত ধরে চলেছে স্তন্যদর্শন পুরুষ। দক্ষিণেও ছুঁ ছুঁ বাতাসে তাদের দেহসৌরভ। গৃহে গৃহে, দোকানে দোকানে চলেছে বেতার-যন্ত্রের গান। বহুদূরের সেই পৃথিবীতে কি এখন নটনারাঙ্গণ রাগের আলাপ শুরু হয়েছে? এগিয়ে চল।

কিন্তু দেহ আত্মনাশ করে মাথা নাড়ে। না, আর পারি না। ক্ষুধা। তবু চল। অরিন্দম টলতে টলতে এগোল। মাঝে মাঝে চোখের সামনেকার সবকিছু যেন ঢুলে ওঠে, কঁপে ওঠে, ঝাপসা হয়ে আসে। তবু চলে সে। শেষে একসময়ে নীচুপাড়ার সীমানা শুরু হয়। ছোট ছোট চায়ের দোকানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পেয়ালায় চা-পান করছে মানুষেরা। কোথায় যেন একটা ভাঙ্গা যন্ত্রে, যন্ত্রে-লিখিত মানুষের গান বাজছে। ভারী কর্কশ। টিমটিমে বাষ্পীয় আলোগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হয়। ক্লাস্ত নরনারীরা ছায়াসূত্রের মত চলাচল করে। হাসি, কথা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা, প্রানহীন। আবছা-আলোকিত অন্ধকার গলির রহস্যময় ইশারা। একটা আবছা-পাত্রে পাশে কয়েকটা রোয়া-ওঠা কুকুর যেন কি নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে। ক্ষুধা। অসহ। এখন সেই অজানা গ্রামের বুড়োর দেওয়া ভাত ও ডাল যদি সে পেত! আশ্চর্য! খাতের কলন! করতেই যেন ক্ষুধাটা কেমন গ্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু পরমুহুর্তেই আবার রাগসীম গর্জন করে ওঠে, বলে, দাও, দাও, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা আমাকে দাও। অরিন্দম মনে মনে হাসল। বাহু বুদ্ধিমান। হবে, কিন্তু তার সমস্ত বুদ্ধিকে হরণ করে...ই ক্ষুধা।

বলরামের বাড়ী এসে পড়ল। স্নাতকস্নেহে, অন্ধকার গলির শেষপ্রান্ত। অন্ধকারেই বাইরের ঘরের দরজাটার সামনে গিয়ে সে

মাঠের বুকোড়াল। শিকল খুলে দাড়াই খুলতেই কাঁচ করে একট
বে ডাঙল।

“কে?” ভেতর থেকে বলরামের গল্প ভেসে এল।

অরিন্দম উত্তর দিল, “আমি—”

“ওঃ, অরিন্দম—”

খুলতে বলতে বলরাম ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার কোলে সেই পাঁচ
বছরের ছেলেটি।

“তারপর? কি খবর? আরে, ঘরটা যে অন্ধকার! তাইত,
তোমার সঙ্গে তো আবার কিছুই নেই—দাড়াও—ওরে ললিতা, অ’মা,
একটা পিঙ্গি জালিয়ে দে তো এঠি ঘরে—”

“দিচ্ছি বাবা—” ললিতার গলা ভেসে এল।

বলরাম আবার প্রশ্ন করল, “তারপর? কাকতকর্ম পেলে কিছু?”

অরিন্দম মুত্ হেসে মাথা নাড়াল, জবাব দিল, “না।”

বলরাম একটু খেমে সান্ত্বনার স্বরে বল, “তাতে কি হয়েছে? আজ
হয়নি কাল হবে। এত বড় নহরে কি তোমার মত জোয়ান ছেলের
একটা চাকরী জুটবে না?”

অরিন্দমের নিঃশব্দ হাসি তার মুখে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। মুখে
সে কিছু বলল না, শুধু মনে মনে বলল যে আজবনগরের কাণ্ডকারখানা
খুব আশাপ্রদ নয়, কাজ পাওয়াটা বলরামের কথার মত সহজ নয়।
সুপারিশ, শিক্ষা, কুকুরের মত পদলেহন করা—কাজ পাওয়ার পথ বড়
দুর্গম, গুরুধার।

অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল
ললিতা। তার ডান হাতে একটি তেলের প্রদীপ, প্রদীপের কস্পিত
শিখাকে সে বাঁ হাত দিয়ে সম্বল আঙ্গলে আছে। দীপালোকে
উদ্ভাসিত তার অনিন্দ্যাত্মক মুখটাকে অপাখিব মনে হল, মনে হল যেন
তার রূপের স্পর্শেই প্রদীপটা জ্বলে উঠেছে। অরিন্দম দেখে মুগ্ধ হয়ে

গেল। ললিতা যেন মূর্তিমতী বহিঃশিখা—দীপক ব্রাগের আলাপের মতই তার লালিত্য যেন অন্তর্দাহী।

প্রদীপটাকে নিয়ে সে বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকল, একপাশে বেখে দিয়ে অরিন্দমের দিকে তাকাল।

বলরাম বলল, “বেশ, তুমি তাহলে এবার জিরোও, পরে গল্প করব।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “আচ্ছা”—

বলরামের সেই পাঁচ বছরের ছেলেটি বলল, “আমায় কিন্তু এবার সেই গল্পোটা শোনাতে হবে বাবা”—

“কোন গল্প?”

“সে-ই বেঙমা বেঙমীর গল্পো”—

বলরামের মুখ মোলারেম হাসিতে ভরে উঠল, সে বলল, “বটে! আচ্ছা চ’ শোনাচ্ছি তোকে গল্প”—

বলরাম ভেতরে চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের বুকটা ফুলে উঠল। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলরামের মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা অরিন্দমের দৃষ্টি এড়ায়নি। ছেলের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলরামের কণ্ঠস্বর যে কেমন মিষ্টি ও আদ্র হয়ে উঠেছিল তাও লক্ষ্য করেছিল অরিন্দম। গবে, বিচিত্র একটা অস্থূতিতে তার চেতনা উত্তেজিত হয়ে উঠল। স্নেহ! ভালবাসা! এই ত মানুষের জীবনের ঐশ্বর্য, সঞ্চয়, মহৎ পরিচয়।

অরিন্দম ঘরের ভেতর গেল। ললিতা ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, “আপনাকে খুব ক্লান্ত যেন হচ্ছে, খুব ঘুরেছেন বুঝি?”

অরিন্দম সোজা হয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য একটা শিহরণ ছাড়ল তার দেহে। মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলছে? তার দু’দিনের জীবনে এই নারীই তো! সর্বপ্রথম তার ইন্দ্রিয়গুলোতে ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নাব তুলেছে,

আজ আবার সেই নারীই তাকে ভেঁকে কথা বলছে ! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ঘেন আজ এই নারীর রূপ ধারই তাকে আজ জীবনের একটা লোভনীয় ও বিচিত্র দিক দেখাচ্ছে ।

সে যুহু হেসে ঘাড় নাড়ল, জবাব দিল, “হ্যা, অনেক ঘুরেছি ।”

“তারপর ? কি হল ?” সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ললিতা তাকাল তার দিকে ।

সে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, “কিছু না । আবার কাল দেখা ।”

“কাল !” কথাটা উচ্চারণ করে ললিতা খামল, তারপর দীরে দীরে বলল, “আজবনগরে কাজ পাওয়া খুব সহজ নয় ।”

“তা আজ বুঝতে পেরেছি, বুকেছি যে এখানে কাজের লোকেরা কাজ পায় না ।”

“তুধু তাই নয়, কাজ পেতে হলে এখানে গাধার মত সহ্য করতে হবে, কুকুরের মত নিলজ্জ হতে হবে, বাঘের মত মিঠুর হতে হবে ।”

“কিন্তু কেন ? কেন এই অত্যাচার নিয়ম ?”

ললিতা হাসল, “কেন ? তা পরে জানতে পাবেন ।”

অরিন্দম কথা বলল না, নিঃশব্দে ভাবতে লাগল । কেন তা কি সে জানে না ? বহুদূরের সেই বিচিত্র ও আনন্দময় পৃথিবীতে কি সে জানতে পারেনি যে এখানকার বাতাসে বাতাসে ভাসছে শয়তানের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ।

“ললিতা”—

ভেতরের ঘর থেকে দুর্গাবতী এসে বারান্দা গাল, ডাকল, “শোন তো”—

“ঘাই মা”—

ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের কাছে গেল ।

অরিন্দম দুর্গাবতীর দিকে তাকাল । সন্ধ্যার রঙীন আকাশের মত প্রশান্ত ও গভীর তার চেহারা, সুন্দরী মেয়েদের উপযুক্ত মা, সংসারের

নানা দুঃখের ছাপ রয়েছে তার মমতা-মাথা মুখে চোখে। এবং ললিতা তাকে মা বলে ডাকল! হৃদয়ের গভীরে, গভীরতম প্রদেশে যেন স্রোয়ারের জল ছড়িয়ে গেল। মা, মা। তার যদি এনি একজন মা থাকত!

দুর্গাবতী মৃদুভাবে ললিতাকে যেন কি বলল।

ললিতা ঘুরে দাঁড়াল, দরজার সামনে এসে প্রশ্ন করল, “রাত্রে কি আমাদের এখানে চাটি খাবেন? মা জিজ্ঞেস করছে”—

অরিন্দম চমকে উঠল। জটরদেশের সেই রাক্ষসী অগ্নিজ্বালাটাও কথা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। ক্ষুধা। মাহুষকে তা অসহায় করে ফেলে। কিন্তু তাই বলে সে হার মানবে কেন?

সে মাথা নাড়ল, “না, তার দরকার হবেনা, আমার খাওয়া নিয়ে আপনারা চিন্তিত হবেন না”—

দুর্গাবতী স্নেহে বলল, “তুমি কিন্তু লজ্জা করো না বাবা। আমি তোমার মায়ের মত, আমাকে না হয় মাসীমা বলে ডেকো তুমি, আর যখন যা দরকার হবে আমাকে বলে”—

মাসীমা। মায়ের মত যে নারী তাকে মাসীমা বলতে হয়।

অরিন্দম হাসল, “না, আমি লজ্জা করব না মাসীমা, দরকার হলে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব।”

“তাহলে তুমি খাবেনা? আচ্চা, কিন্তু তোমার কি অত্র কিছু এখন চাই?”

অরিন্দম একটু ভেবে বলল, “চাই, কটু জল।”

“আচ্চা বাবা, ললিতা এনে দিচ্ছে।”

দুর্গাবতী মেয়েকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। অরিন্দম সেদিকে তাকিয়ে অবাক হল। মাহুষের মহত্ব এইখানেই—সে মাহুষকে ভালবাসে, স্নেহ করে। মাহুষের মধ্যে নারী সে বিষয়ে অগ্রণী। তার কাছে পরিচিত আর অপরিচিত সবাই সমান। আশ্চর্য। গর্বে তার

বুক ফুলে উঠল। মনে মনে সে আঙড়াল—‘আমি মাহুদ, আমার মধ্যে ভালবাসার কি বিচিত্র ক্ষমতা আছে!’

ধীরে ধীরে সেই মাহুদটাতে গিয়ে সে বসল। ব্যথা বেদনার তার নরীক তখন টনটন করছে, বসতেই চোখ দুটো আরামে বুজে এল। কিন্তু ক্ষুধা। নাছোরবান্দা ভূতের মত, অক্লান্ত পশুর মত শুধু গৌ গৌ শব্দে গর্জাচ্ছে, দংশনহত জীবের মত লাফাচ্ছে তার জঠরদেশের অস্থ-গুলো। এবার? সে কি করবে? কি থাকবে?

পদশব্দ। অরিন্দম তাকাল। চৌকাঠ পেরিয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়েছে একটি মোহিনীমূর্তি। অমিতা।

অরিন্দমের দৃষ্টি পড়তেই সে বলল, “আপনি যে এতক্ষণ এসেছেন তা আমি জানতেও পারিনি, মাহুদের কথা বঝতে পারলুম—”

অরিন্দম জবাব দিল না, কোন কথাই সে খুঁজে পেল না। অমিতার মেদসমৃদ্ধ দেহরেখা আর যৌবন যেন বর্ষার প্রমত্তা নদীর মত। ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা গুরুভার আবহাওয়া সৃষ্ট হল, বারংবার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে।

অমিতা তার বাক্যকে দাঁত মেলে বিচিত্র হাসল, প্রশ্ন করল, “খুব বেড়িয়েছেন, না?”

অরিন্দম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, “হ্যাঁ—”

“কি কি দেখলেন? আজবনগরের প্রমোদশালাগুলো দেখেছেন, আর শাসন-পরিষদ?”

“না।”

“দেখেন নি? তাছাড়া তো কত কি আছে দেখার—তাদের মধ্যে সবচেয়ে সেবা দেখার জিনিষ যে জন্তুশালা, তাও বুঝি দেখেন নি?”

অরিন্দম কিছুই বুঝতে পারল না, অস্বস্তিবোধ করলেও তার কৌতূহল জগ্মাল, সে জিজ্ঞেস করল, “জন্তুশালা? সেটা কি?”

অমিতার মুখে ক্ষুরধার হাসি খেলে গেল, সে বলল, “কি আবার?

গিয়ে তাদের দেখে—”

একটু

"বাঃ, আপনি জানেন না? ওমা, আপনি দেখছি একে

গেঁয়ো লোক"—নিঃশব্দ হামির তরঙ্গে অমিতার সারা দেহ জ্বলে।

ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୫ ।

অমিতা উত্তর দিল, “আজবনগরের কতাদের আশ্রয় দিত মানুষকে

অরিন্দম বিন্দুয়ে বোবা হয়ে গেল, ক্ষণকাল শুক থেকে সে বল-সুই

“সে কি কথা? কিন্তু কেন? মানুষ কি মানুষ হবে না?”

ঠোটে আঙুল দিয়ে অমিতা উচ্চারণ করল, “শ্ শ্ শ্ চুপ্”—মুহূর্তে

অবিন্দ্যের কাছে ব্যাপারটা ঢাকাধাই রয়ে গেল। তাই যে প্রশ্ন করল

“তার মানে ? কি বলছেন আপনি ?”

শ্রীমৎ প্রমোদচন্দ্র পূর্ববৎ বলল, “কিছু না, ওর বেশী আমি আর কিছু জানি না।

এ বিষয়ে আমার দাদা আর ললিতা হয়ত অনেক কিছুই বলতে পারবে।”

46-9899

অবিন্দম চূপ হয়ে গেল। মানুষকে জন্তুর মত হতে হবে? এ কেমন

কথা! আজবনগরের সবই এমন অস্বাভাবিক কেন? কিন্তু না, সমস্ত

চিন্তার আড়ালে চলেছে সুধার কৰ্মপাত। তাকে খেতে হবে। খাঙ্কি

দু'চোখের গভীর চাহনি মেলে অমিতা অরিন্দমকে কৌতূহলের

“5” —

অমিতা এক পা অগ্রন্বর হয়ে বলল, “তুমু”—

২
মধ্যে “বলুন”—

দী. “আপনার”—বলতে গিয়েই অমিতা থামল, পেছনদিকে তাকিয়ে
মর্দক তুষ ললিতা আসছে, তার হাতে এক ঘটি জল ও একটা গেলাস।

কিন্তু ক্ষুধা প্রশ্ন করল, “জল নিয়ে এলি নাকি?”

শব্দে গজাচ্ছে। দিদির দিকে অবাক হয়ে তাকাল, প্রশ্নটা তার কাছে অর্থহীন
গুলো। এবারই সে সংক্ষেপে জবাব দিল, “হ্যাঁ”—

পদশব্দ। সে ভেতরে ঢুকছিল, এমনি সময় অমিতা লম্বু চেঁসে বলল,
হেলান, “অন্ত বৃষ্টি তুই কোন কাজই রাখবি না ললিতা?”

ললিতা থমকে দাঁড়াল, গ্রীবা উন্নত করে সে জনন্য চোখে একবার
অমিতার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর ঘটির জল উপুড় করে
ফেলে নিয়ে সে অমিতাকে বলল, “এই নাহ, তোমায় কাজ দিলাম”—

বলেই সে ঘটি শু গেলাস বারান্দার ওপর রেখে দিয়ে সেখান থেকে
ক্ষতপদে চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। অরিন্দম উঠে দাঁড়াল।
ব্যাপার কি? গবিতা রাজকন্ডার মত ললিতা চলে গেল কেন? জল
দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই বা দু'বোনে ঝগড়া করেছে কেন?

অমিতা স্থির ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শাণিত খড়্গের মত
নির্মম ভঙ্গীতে, ভুরু কুচকে দু'চোখে হিংস্রতার আলো জ্বালিয়ে সে
ললিতার গমনপথের দিকে কক্ষকাল তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে
মুখটা কিরিরে নিয়ে সে অরিন্দমের ওপর দৃষ্টি নির্বাক করল। এতক্ষণ
সে ভান পায়ের ওপর ভর দিয়ে ছিল, এবার পায়ের ওপর ভর
দিয়ে দাঁড়াল। দেহ, নিতম্ব ও কনয়ুগল তাতে কঁপে উঠল। মনে হল
যেন একটা তবক উঠে দেহের বাদিক থেকে ছানদিকে চলে গেল। সেই
তবকের আঘাতে যেন ঘরের বাতাসেও আবর্ত জাগল। অরিন্দমের
দেহের মধ্যেও জাগল একটা অনাস্বাদিত, বিচিত্র উত্তাপ-তরঙ্গ। অমিতা
হাসল।

ঝকঝকে ও সুগঠিত দাঁতগুলো মেলে অমিতা হাসল। পর সেই তারপর তরলকণ্ঠে বলল, “দেখলেন, ললিতার কাণ্ড দেখলেন? চট্টো না? ললিতাটা অমনি—ওর মাথায় ছিট আছে। কেনরে বাপু, একটু ঠাট্টা তামাসাও কি করতে পারব না? থাকগে, আমি যাই—আপনার অস্ত্র জ্বল নিয়ে আসি।”

ঘটি ও গেলাস তুলে নিয়ে অমিতা চলে গেল। ঘরের বাতাস আত্মার লবু হল। কিন্তু অদ্বৈতের কাছে সব কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগল। তার দু’দিনের জীবনে অতিক্রান্ত কত ঘটনাই না ঘটেছে? কত মানুষকে সে আজ দেখল! পুরুষ ও নারী। প্রকৃতির প্রতীক নারী। ললিতা। সে যেন কোন দেবকন্টার মত, সেই অপরূপ পুতুলদের দেশের সেই সুন্দরী নর্তকীর মত। তাকে দেখে চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে, বিচিত্র একটা রসাবেশে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর অমিতা যেন নীল বিদ্যাতের শিখা, তাকে দেখে দেহে উত্তাপ জন্মায়, আশঙ্কায় মনটা কেঁপে ওঠে। একি রহস্য! প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল-মূর্তিরা যেন তাকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে। কিন্তু না, সে ভুলবে না। সে ভোলেনি। দূরে, মেঘচূষিত পর্বতশ্রেণীর ওপারে, বহুদূরবর্তী সেই রূপসী নদীর তীরে, মনিময় সেই আশ্রয় কক্ষে, পুতুলদের আনন্দময় রাজ্যে সে ছিল প্রহরী। হঠাৎ একদিন প্রকৃতি তার ইচ্ছাপূরণ করল, সে মানুষ হল। কিন্তু তার অস্তরের মনিকক্ষে এখনো সেই প্রহরী অসিহস্তে দাঁড়িয়ে আছে, প্রহরে প্রহরে এখনো সে গান গায় আর ঘোষণা করে “জাগো-ও-ও, বিশ্বস্তি ও বিশ্বাস্তি ঠেলে উঠে দাঁড়’ ও-ও-ও’—

রাত বাড়ে। নীচুপাড়ার ঘরে ঘরে কেরোদিনের বাতি নিভতে শুরু করে। আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে, বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোর আশেপাশে, অন্ধকার নিবিড় হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে নিঃশব্দতা ভারী হয়। এখানে সেখানে, আবর্জনা-পাত্রের পাশে, কুকুরেরা বসে বসে কিম্বতে শুরু করে।

বাড়ীতেও রাতের ডায়া ঘনায়। বাচ্চাদের হাসিকান্না থামে, মদ্যবতী, অমিতা ও ললিতার কণ্ঠস্বর থেমে যায়, বলরামের থুক থুক কাশিও আর শোনা যায় না।

নীচুপাড়ার রাত বাড়। শুধু এক আলো গৃহস্থ বাড়ীতে আলো জ্বলে, জ্বলে ভাটিখানায়, চা বিড়ির দোকানে, জুয়ার আড্ডায়। আর জ্বলে উচুপাড়ার। সেখানকার সারি সারি আলোকমালা—শোভিত রাজকুশল এবং অসিকান্না সৌধাবলীতে অন্ধকার পুরোপুরি জমাট বাধে না। নৃত্যগীত, ভোজ ও পান উৎসবের মাঝেই গুপ্তানকার আলোকিত রাত তরল হয়ে মিলিয়ে যায়।

অরিন্দম শূন্যে শূন্যে ছটকট করছিল। ক্ষুধা। একটা উন্নত রান্স যেন তার জঠরদেশকে তোলপাড় করছে। ঘরের ভেতর প্রদীপটা জ্বলছে, এখনো তেল আছে তাতে। ললিতা জ্বলে দিয়েছিল। ললিতার রূপের স্ফলিঙ্গ ঐ প্রদীপটা। হঠাৎ মনে হল যেন আলোটা নিভে যেতে চাইছে, অন্ধকার এসে কাপসা করে দিচ্ছে আলোর ঔজ্জ্বল্যকে আর সেই অস্পষ্ট আলো ও অন্ধকারের মাঝে আবিস্কৃত হচ্ছে একটা অতিকায় আকৃতি। দীর্ঘ ও রুক্ষ তার মাথার চুল, কুটিল কামনামাথা রক্তনেত্র, বড় বড় খারালো দাঁত ওরালা একটা বিরাট মুগাধর, লোমশ দেহ এবং হিংস্র ও লালসা-কম্পিত নখরযুক্ত হাত। অরিন্দম তাকে চিনল। রান্স, তার জঠরদেশের সেই উত্তেজিত রান্স। নিঃখাসে নিঃখাসে তার আগুন বেরোচ্ছে, বুকটা ওঠানামা করছে, শ্বসনসে জিভটা বাহ্যিক বাতাসকে লেহন করছে।

ক্ষুধা। কিন্তু একি দেখছে সে! চোখ দুটোকে রক্তাঙ্গ অরিন্দম। না, কিছু নেই, আলোটা জ্বলছে। ললিতাকে দেখতে ভালো লাগে। সাবধান—গায়েব নীচেকার মাটি যেন হঠাৎ ফেটে যাচ্ছে আর সেই ফাটলের মাঝখান দিয়ে তার ক্ষুৎকাতর হাল্কা শরীরটা পাখীর পালকের মত নীচে নেমে যাচ্ছে। অন্ধকার, অন্ধকার, সে পড়ে যাচ্ছে, সে

পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে—কেউ কি আছে? পুতুলদের দেশের সেই গুনবান গায়ক হৃদয় এখন বাহারের আলাপ শুরু করেছে—কিন্তু সে তো দূরে, বহুদূরে। অন্ধকার, অন্ধকার আবর্তিত হচ্ছে, তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে—

“কি মশাই, ঘুমোলেন নাকি?”

একটা কণ্ঠস্বর। একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর যেন সেই পাখীর পালকটাকে ধরল, টেনে তুলতে লাগল। ওপরে, ওপরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা কণ্ঠস্বর যেন তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল। অরিন্দম চোখ মেলল, উঠে বসল, দেখল যে ভেজানো দরজাটা টেলে সরিয়ে ঘরের ভেতর একজন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “কে?”

যুবকটি তার দিকে ছ’পা এগিয়ে এসে হানিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করল, “কাঁচা ঘুমটা ভাদালাম বুঝি?”

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কে যুবকটি? তাকে তো সে চেনে না, তবু যুবকটি এমন অতি-পরিচিতের মত কথা বলছে কেন? আর লোকটার কথা যেন কেমন জড়ানো জড়ানো? কেন?

সে বলল, “না, আমি ঘুমোইনি, কিন্তু আপনি—”

যুবকটি তার কথা শেষ করতে দিল না, বলল, “আমি কে তা জানতে চাইছেন বুঝি? বলছি। আমার নাম মুকুন্দ, আমার বাবার নাম বলরাম—”

“ওঃ—আপনি!”

“হ্যাঁ, আমি—অমিতা ও ললিতার দাদা।”

অরিন্দম মুহূর্তে হেসে অভ্যর্থনা জানাল, “বহু—”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, মাথা নাড়তে গিয়ে তার সারা দেহ দুলে উঠল, সে বলল, “না, এখন বসব না। বাড়ী ফিরে এসে যখন আপনার কথা শুনলাম তখন আপনি ছিলেন না, তাই এখন একটু আলাপ করতে

এলাম। তাছাড়া জমিয়ে গল্প করার মত স্থান অবস্থায় আমি এখন নেই।”

“কেন?”

“ভাবেন?”

“বলুন।”

“আমি একটু টেনেছি।”

অবিন্দম বুঝল না কিছুই, প্রশ্ন করল, “তার মানে?”

মুকুন্দ অস্থূলকণ্ঠে হেসে বলল, “মানে আমি একটু মনোপান করেছি।”

“তাতে কি হয়?”

“নেশা হয়, দুঃখকে একটু সহজ মনে হয়। কেন, আপনাকে বুঝি বাবা আমার বিষয়ে কিছু বলেনি?”

অবিন্দম মুহূর্তে হেসে মাথা নাড়ল, “বলেছে—নিম্নাত্মক কথা। কিন্তু কেন মন খান আপনি? দুঃখকে সহজ মনে হওয়ায় তো দুঃখ দূর হয় না।”

মুকুন্দ আবার ঢুলে উঠল। অবিন্দম তাকাল তার দিকে। নাভিদীর্ঘ আকর্ষিত মুকুন্দের, লোহার মত শক্ত দেহে তার থাক থাক মাংস-পেশী। মাথায় কৌকড়ানো কৃষ্ণ চুলের রাশি, শিশুর মত সরল ছোটো চোখের তারায় খেন আগুনের আভা। নেশা হয়েছে তার, ঢুলছে সে, যেন বাতাসের দাক্ষায় ঢুলছে একটা তরুণ শালগাছ।

মুকুন্দ মুহূর্তে বলল, “না, তা হয় না। যাকে দূর করার পথ সহজ নয়, তার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়, তাতে সময় লাগবে।

“তবে নেশা করেন কেন?”

“মুণ্ডে না পড়ার জন্য, দুঃখের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে সংগ্রাম করার জন্য।”

অবিন্দমের কৌতূহল হল, সে প্রশ্ন করল, “কিন্তু আপনার দুঃখ কি?”

মুকুন্দ বলল, “আমার দুঃখ আমার একার নয়, আমাদের সবার।

আমাদের দুঃখ এই যে আমরা মাহুষ হয়েও মাহুষের অধিকার বঞ্চিত।”

“কেন? কে বঞ্চিত করেছে আপনাদের?”

“মুষ্টিমের কয়েকজন লোক—তাদের আমরা ধনী বলি। তাদের চক্রান্তে এবং শক্তিমন্মত্ততায় আজ আমরা অজ্ঞ, অন্ধ, নিরানন্দ, দুঃখশোকে অভাবে, ব্যাধিতে, হিংসা ও হীনতায় আমাদের জীবন পরিপূর্ণ; তাদেরই নির্মম শোষণের ফলে আজ আমাদের সঙ্গে জন্তুদের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের দিন শেষ হয়ে এল, আমরা আমাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই।”

কুধা। তবু মুকুন্দের কথা ভালো লাগে অরিন্মের। বলরামের কথা মনে পড়ে। অনেক জোয়ান ছেলের চোখে নাকি আগুন জ্বলে—তারি নাকি মাঝে মাঝে জটলা পাকায় আর কি সব কথা আলোচনা করে। মাহুষের মঙ্গলের কথা। মুকুন্দও যেন তেমনি কথা বলছে। সে যে তারি কথা। গ্রহরীর কথা। সেই বহু দূরের মনিমর কক্ষে একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে সে তো এমনি কথাই ভেবেছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, “কি ভাবে আপনাদের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন আপনারা? আমাকে বলবেন?”

মুকুন্দ হাসল, মাথা নেড়ে বলল, “না, কিন্তু ব্যাপার কি? আপনি কি এসব কথা জানেন না?”

“না।”

“কেন?”

“পরে বলব।”

“তা হলে আমিও পরে বলব সবকথা। তার আগে আপনি সব দেখুন, দেখুন যে মাহুষ কিভাবে আছে, জাহ্নন সবকথা, তারপর আপনার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করব। আচ্ছা, আজকের মত আদি, আপনি ঘুমোন—”

“আচ্ছা।”

মুকুন্দ চলে গেল।

অবিনন্দম ঘরের ভেতরকার প্রদীপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। মুকুন্দ লোকটি কেমন যেন অসাধারণ। কি একটা জালায় যেন সে অহবহ জ্বলছে। মাতৃষের দুঃখ দূর করতে চায় সে। তারি মতো। ঠিক, মুকুন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, তার কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে হবে। রাত বাড়ছে। নীচুপাড়ার কোথায় যেন হল্লা হচ্ছে, কোথায় যেন বাজছে একটা যন্ত্রে লিখিত মাতৃষের গান। আর কোথায় যেন বাজছে একটা কুকুর। গলির অন্ধকারে, রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে চিরে যেন নীচুপাড়ার কান্না মহাশূণ্ডের দিকে উঠতে চাইছে। রাত গভীরতর হয়। কিন্তু কোথায়, ঘুম তো আসে না? প্রদীপের শিখাটা যেন মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক মাত্রায় বড় হয়ে ওঠে, অবিনন্দম-সম্মত সমস্ত ঘরটাকে যেন তা গ্রাস করে ফেলে। চোখের ধাঁধা। তার ক্ষুৎকাতর, দুর্বল দৃষ্টির বিভ্রম। জ্বলুক প্রদীপটা। ললিতার রূপের মত। প্রদীপ নিভে গেলে জাগ্রত চোখের সামনে, অন্ধকারে বয়ত সেই রাক্ষসটা আরো হিংস্র হয়ে উঠবে, তাকে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে। এই ভালো। আলোই ভাল।

কিন্তু আর পারা যায় না। যাদের বাড়ীতে খাদ্য আছে তাদের বাড়ীতে কি সে হানা দেবে? লুণ্ঠন করবে? বাধা দেবে! কে? কেউ পারবে না। সে তাহলে তারও শক্তির পরিচয় দেবে। যারা বাধা দেবে তাদের কর্ত্তরোধ করবে সে। চাট, তার খাদ্য চাই। পর্বত-প্রমাণ খাদ্য চাই। সমস্ত পৃথিবীটাকে সে অবলীলাক্রমে গ্রাস করতে পারে। হ্যাঁ, জঠরের সেই রাক্ষসের সঙ্গে এখন আর তার কোনো পার্থক্য নেই। সাবধান, হে আজবনগরের অধিবাসীবৃন্দ, সাবধান—তোমাদের মহানগরে এক রাক্ষসের আবির্ভাব ঘটেছে।

“চোর—চোর—চোর—”

হঠাৎ দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে এল। ঊংকট কোলাহল।

“চোর—চো-ও-ও-র—ধরো-ও-ও-ও—”

কোলাহল ক্রমেই কর্ণভেদী ও নিকটবর্তী হয়ে উঠল। কি ব্যাপার? অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোলাহলটা অস্বাভাবিক, উত্তেজিত। কেউ চুরী করেছে। না বলে পরের জিনিস নেওয়াকে চুরী বলে। চুরী করা অত্যাশ, পাপ। কিন্তু তা জেনেও মাহুষ চুরী করে কেন?

“চোর—হ্যাঁ, ওদিকে, ওদিকে—”

গলি দিয়ে জনকয়েক দৌড়ে চলে গেল। কি ব্যাপার? একবার বাইরে গিয়ে দেখা যাক।

অরিন্দম ঘর থেকে বেরোল।

গলির ভেতরে স্নাতসৈতে ও ভিজে অন্ধকার। ঘন কাদার মত। কিন্তু কৈ, কেউ নেই তো। নির্জন ও আঁকাবাঁকা গলিটার শেষ প্রান্তে একটা টিমটিমে বাষ্পীয় আলোক। পাণ্ডুরবর্ণ মূতের নিম্প্রভ চোখের মত। তার আলোতে আশপাশের চূণকাম-থনা বাড়ীর দেয়ালগুলোকে বীভৎস ও অপরিচিত জন্তুর কঙ্কালের মত মনে হয়।

হঠাৎ আবার কোলাহল শোনা গেল, “না, এদিকে নেই, এগিয়ে চল”—

সঙ্গে সঙ্গেই অরিন্দমের বাঁ দিকের একটা গলি থেকে একজন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। অরিন্দম একটু সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই লোকটার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। হিংস্র একটা দৃষ্টি নিষ্পেষ করে সে চলে যাবার উপক্রম করতেই অরিন্দমের সন্মুখ হল, থপ্ করে লোকটার একটা হাত ধরল সে।

“শোন”—

লোকটা ক্রুদ্ধ স্বাভাবিক মত নিম্নকণ্ঠে বলল, “হাত ছেড়ে দাও”—

“কেন? তুমি বিচলিত হচ্ছে কেন?”

“ছাড়ো বলছি—নইলে ভাল হুবনা”—লোকটা প্রাণপণে হাত ছাড়বার চেষ্টা করে চলল।

অরিন্দম হাসল, “তোমার মনে পাপ আছে বলেই তুমি আমার ওপর রাগ করছ, পালাতে চাইছ। কেন? তুমিই কি চুরী করেছ?”

জবাবে লোকটা অরিন্দমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দিল।

“ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—তা নইলে আমি নগররক্ষীদের ডাকব”—

— লোহার মত দুটো শক্ত হাত দিয়ে অরিন্দম লোকটাকে চেপে ধরল। ক্ষুৎকাতর দেহে তার বেশী শক্তি ছিল না, তবু সে লোকটাকে কাবু করল, বলল, “কোন কল হবে না। তুমি চেয়ে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব প্রতিজ্ঞা করছি।”

“কি জানতে চাও?”

“তুমিই চুরী করতে গিয়েছিলে?”

“হ্যা—”

“কি চুরী করলে?”

“কিছুই না। পারিনি।”

“চুরী করা নাকি পাপ—তা জান?”

লোকটা খাপদের হাসি হেসে জবাব দিল, “জানি, তবু চুরী করতে গিয়েছিলাম।”

“কেন?” অরিন্দম অবাক হল।

লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “তুমি কি? না বোঝার ভাণ করছ, তা হোক, তবু বলছি। কেন চুরি করি শুনবে? অভাবের দ্রুত, পেটের দ্রুত। আমি একা নই, আমার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই।”

“কেন, এই অভাব কেন?”

“কাজকর্ম পাইনা বলে, আর কাজ পেলেও পোষায় না। মানুষ

যাই করুক না কেন, তার বদলে তাকে যে বাঁচবার মত অল্পবস্ত্র দেওয়া উচিত তা মানুষেরা বিশ্বাস করে না।”

“এরপর কি করবে?”

লোকটা হাসল, “আবার চুরী করব। এইত বাঁচবার নিয়ম, দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ যারা, তারাও চুরী করে। বাঁচবার এই নিয়মটা চালু থাকে পর্যন্ত আমি মহাজনদেরই নকল করে যাব।”

“যখন ধরা পড়বে?”

“চুলোয় যাব। এই অনিশ্চিত জীবনসংগ্রামের চেয়ে তা ঢের ভাল। হয়েছে, এবার হাত ছাড়ো”—

আচম্কা একটা টান মেরে অরিন্দমের মূঠো থেকে লোকটা তার হাত ছাড়িয়ে নিল, তাপর সোজা দৌড় দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্ত তার রোপা ও লম্বাটে আকৃতি গলির বিবর্ণ আলোর পাশে দেখা গেল, তারপর সে অদৃশ্য হল, অন্ধকারে যেন মিশিয়ে গেল।

অরিন্দম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য। তার দু’দিনের মানব-জীবনে আজ কত ঘটনাই না ঘটল! না, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। অরিন্দম ভেতরে গেল। মাথাটা বিম্বিম্ব করছে, শরীরটা হাল্কা মনে হচ্ছে, জঠরের শূন্যতা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। লোকটা চোর। চুরী করে, পাপ করে সে বাঁচতে চায়। মানুষ অত্যাগকে অত্যাগ জেনেও তা করে। মানুষের জগতের এই নিয়ম। পেটের জন্ত মানুষ পাপ করে। পেট মানে ক্ষুধা। তারও ক্ষুধা পেলেছে। সে-ও কি পাপ করবে? অসম্ভব। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। মানুষ মানুষের কথা ভাবে না। প্রত্যেকেই নিজের কথা ভাবে। জন্ত জানোয়ারের মত। যতদিন এই নিয়ম প্রচলিত থাকবে ততদিন মানুষের জীবন হবে অনিশ্চিত। হিংসার বিষে কুটিল মানুষের মন। মৃত্যু, অত্যাগ ও অগত্যা রাজত্ব করছে। ভেঙ্গে ফেল। না, সে ভোলেনি। তার অন্তরের মনিমর কক্ষের সেই অসিয়ারী প্রহরীর প্রতিজ্ঞা সে বিশ্বস্ত হয়নি।



অন্ধকার! দমকা হাওয়ায় প্রদীপটা নিভে গেল। বর্ষার জলের
 মত গলির ভিত্তে অন্ধকার এসে ঘরকে প্রাবিত করল। অরিন্দম চমকে
 উঠল। প্রদীপটা নিভে গেল। ললিতা। ললিতাকে দেখতে বেশ
 লাগে। প্রদীপটা যদি আবার জলে উঠত আর তার পাশে, ঐ আলোর
 আত্মার মত যদি ললিতা এসে দাঁড়াত তাহলে কি রোমাঞ্চকর ব্যাপারই
 না হত! ললিতা সুন্দরী। কিন্তু তাকে আরো দেখতে ইচ্ছে করে।
 তার সর্বাঙ্গ। না, অমিতাকে আলোর পাশে চাই না। অন্ধকারেই
 আসতে পারে সে। তার দেহের মাংসে কি অরিন্দমের ক্ষুধা মিটবে?
 নরম নারীমাংস খেয়ে কি বাঁচা যায় না! না। ক্ষুধা। ভাত চাই তার।
 অন্ধকার কি পীড়াদায়ক! দেহটা যেন অবশ হয়ে আসছে। চোখের
 সামনে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো আলোর কণা। ললিতার রূপের কণা। সেই
 বহুদূরের পুতুলের দেশে এখন বোধ হয় বেহালাবাদক তার বাজনা
 বাজাচ্ছে আর তার বাজনার তালে তালে নাচছে সেই পেলব-যৌবনা
 নর্তকী। তাদের বাজনা আর নৃত্যচন্দ্রের মাঝে যেন ডেজী ফুলের গন্ধ,
 মারীগোল্ডের রং আর নাইটিংগেলের ডাক। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে
 দাও। শেষ হবে না, রূপ, রস ও আনন্দের শেষ নেই। ক্ষুধা। ভাত
 চাই। রাতের কোন প্রহর? বেহাগের আলোপে সেই মণিময় কক্ষ কি
 এখন কাঁপছে? ভাত চাই। আনন্দ, প্রেম ও কর্মই জীবন। জানতে
 হবে। দৃষ্টি ও শব্দ শুধু কিছু পেছনে কে আছে? ভাত চাই।
 পশুর জীবনে আশ্বাস নেই, নিশ্চয়তা নেই। মানুষকে মানুষ হতে হবে।
 ভাত চাই। ভাত চাই। মানুষ শুধু নিজের জন্য ভাবে না, পরের
 কথাও ভাবে সে। মানুষ ভালবাসে। ভালবাসার শেষ নেই। এই
 অদূরস্থ ঐশ্বর্যই মানুষের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করবে। ভাত চাই।
 অন্ধকার। অন্ধকারে আলোর ফুলঝুরি। তিমিত চেতনায় যেন
 বিল্লীরব। হিংস্র নখের আঘাত আর একটি প্রার্থনা—এক—মুঠো
 —ভাত—চাই—

মাঝামাঝি রাত কেটে গেল। নীচুপাড়ার পূর্বদিকে, দিগন্তজোড়া পর্বত-শ্রেণীর আড়াল থেকে সূর্যদেব বেরিয়ে এলেন। একটি আশ্চর্য প্রবাল-পদ্মের মত। সোনালী স্রবীর মত মাদকতাময় তার আলোর স্পর্শ পেয়ে আজবনগর চকল হয়ে উঠল। দূরবর্তী কলকারখানা থেকে ভেসে এল বাঁশীর আওয়াজ। শোনা গেল পদধ্বনি। অসংখ্যের।

বাড়ীর সবাই জেগে উঠবার আগেই অরিন্দম রাস্তায় পা দিল। আজ একটা কাজ তাকে জোগাড় করতেই হবে। ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠছে। শরীর দুর্বল মনে হচ্ছে তার, চলতে কষ্ট হয়। তবু এগিয়ে চলতেই হবে।

কর্মচকল মহানগর। জনাকীর্ণ রাজপথ। অন্ধ শ্রোতের মত চলেছে জনতা। বিদ্রোহ ও বাস্পীর যানগুলো দ্রুতবেগে ছুটোছুটি করছে। শব্দ। কোলাহল। লোহায় লোহায়, পাথরে পাথরে সংঘাত। কঠিন জীবনের ঘোষণা।

“কাজ আছে?”

“না।”

বেলা বাড়ে। জনতা বাড়ে। মাথার ওপর সূর্যদেবের আলো প্রখর হয়ে ওঠে। উদ্ধত দৈত্যের মত বিরাট অট্টালিকাগুলো তাদের বড় বড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষুধা। একটা অরপ্যচর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ধারালো দাঁত। রক্ত মাংস ও হাড়ের ভেতরে একটা বিযাক্ত যন্ত্রণা। ভাত চাই, ভাত চাই।

“কাজ আছে? কাজ?”

“না, না।”

চারদিকে শুধু শব্দগোল। বাধা ও নিষেধের প্রাচীর। না, নেই, কাজ নেই। অথচ কাজ না হলে চলবে না। খাচ্চ চাই। খাবারের

দোকানগুলোতে লোকেরা খাচ্ছে। স্বদৃশ্য হোটেলের মাহুঘেরা
হাসিনুখে খাচ্ছে। ক্ষুধাত কুকুরের মত চাইতে ইচ্ছে করে—
একটা হাড় দাও আমাকে। আবর্জনা-স্তূপের মতো লাকিয়ে পড়ে পচা
খাবারের টুকরো খুঁজতে ইচ্ছে করে। অথচ উপায় নেই। তার অন্তরে
দেহলীতে আছে এক সৌন্দর্য-পিপাসা পুতুল। সে মাথা নীচু করবে না।
এখন কোন প্রহর? রূপসী নদীর ধারে বসে বাবাবর হাঁসেরা কি এখন
স্বপ্ন দেখছে? নদীর জলে অরণ্য আর নিজের ছায়া দেখে কি কোন
মৃগশাবক এখন বিষয়ে আকুল হয়ে উঠেছে? হে বীরকার, তোমার
বহুতন্ত্রী বন্ধার তো আমার হৃদয়ে পলিত হচ্ছে না। জয়ের ক্ষুধার
ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে কি তুমি ভয়-বিহ্বল হয়েছ? ভাত চাই।

“এখানে কি কাজ আছে?”

“না।”

“আমি ক্ষুধাত—আমায় একটা কাজ দিন, দাঁচতে দিন।”

“তুমি মরলে আমাদের ক্ষতি হবে না।”

“আমি যে মাহুঘ।”

“তাহতে হয়েছে কি?”

“আমার মৃত্যু যে আপনাদের ও মৃত্যু—”

“তুমি বেরোও—”

বৌদ্ধ-তপ্ত রাজপথ যেন কালো পাথরের মত। গরম বাতাসে ধাতব
গন্ধ। পাথরের নীচে ভূমিকম্প। এগিয়ে চল। এখানে মরুভূমি,
এখানে নির্মম, নিষ্করণ উপেক্ষা। পুড়ুক পা, ক্ষুধায় ক্লান্তিতে চেতনা
অবসন্ন হয়ে পড়ুক, তবু হার নেনো না।

“এই, হটে যাও—”

ঠন্ ঠন্ শব্দ তুলে একটা মাহুঘ-চালিৎ গাড়ী আসছে তার পেছনে।
অস্বিন্দম সরে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল যে গাড়ীটা টানছে
কালকের লোকটা। দামোদর।

দামোদর তাকে দেখে হাসল, বলল, “তুমি !”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ !”

“এই রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ যে ?”

“কাজ খুঁজছি।”

দামোদরের হাসি মিলিয়ে গেল, শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, “কাজ !
খোঁজ—”

“কোথায় গেলে কাজ পাব জানো ?”

“বলা মুশ্কিল। কাজ সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু সবাব'ভাগে
জাটে না।”

“ভাগ্য !”

“ভাগ্য বৈকি। এসো, এই ছায়াতে দাঁড়াও—”

“ভাগ্য মানে ?”

“বিদ্যাতার লিখন—তার নির্দেশ অনুযায়ীই তোমার জুখ দুঃখ
নয়ত্রিত হয়।”

“বিদ্যাতা মানে ?”

“ঈশ্বর—যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন ;”

“তাহলে তো ঈশ্বর খামখেয়ারী।”

“না। কর্মানুযায়ী মানুষকে ফল দেন তিনি। যে ভাল কাজ করে
তাঁ ভাল ফল পায়, যে খারাপ কাজ করে সে মন্দ ফল পায়।”

অরিন্দম অবাক হল, “বাঃ তাহলে আমি কষ্ট পাচ্ছি কেন ? আমি
তা কোন পাপই করিনি।”

“তাহলে হয়ত আগের জন্মে পাপ করেছিলে তুমি।”

কিন্তু আগের জন্মে তো নান্দু ছিলাম না, আমি ছিলাম একটা
নিঃসন্দেহ পুতুল—পাপপুণ্য, জরামৃত্যু ও দুঃখ বেদনার উল্লেখ—”

দামোদরের চোখের তারায় পুঞ্জীভূত বিষয় ঘনাল, “কি বলছ তুমি ?”

অরিন্দম সচেতন হয়ে উঠল। এসব কি বলছে সে ! কেন বলছে !

সে মাথা নাড়ল, “না না, কিছু নয়, কিছু নয়। কিন্তু তুমি আজ
হঠাৎ এই গাড়ী টানছ কেন দামোদর?”

“মুচিগিরিতে আর পেট চলল না বলে—”

“কিন্তু গাড়ীতে মাহুশ টানা তো জানোয়ারের কাজ, ঘোষের
কাজ!”

“আমিও জানোয়ার। আকাশের জগৎ আমার নাগালের বাইরে,
তাই শুধু জন্তুর জগৎটাকেই আঁকড়ে ধরেছি, বেঁচে থাকার একটা জাস্তব
আনন্দ আছে বলেই টিকে আছি—”

“কিন্তু মাহুশের মত বাঁচার আনন্দ যে অমৃতের মত—”

“তা আমাদের জন্ত নয়—”

“কেন?”

“যারা আমাদের শাসন করে তারা এক দানবের পৃষ্ঠাধী। সেই
দানব তাদের শিখিয়েছে যে সবাইকে বক্ষিত রেখে ভোগ করাতেই
আনন্দ, সবাইকে নিখাতন করাতেই সুখ, সবাইকে দুঃখ দেওয়াতেই
বিলাস।”

“তারা ক’জন?”

“তারা মুষ্টিমেয়।”

“তবু তারা শক্তি বজায় রাখে কি করে?”

“অরণ্যের বাঘের মত, তাদের শক্তিকে যে হরণ করতে চায় তাকে
তারা ধ্বংস করে।”

“কিন্তু তুমি আমি তো সংখ্যায় কোটী কোটী।

“কোটী কোটী হয়েও আমরা বিচ্ছিন্ন, স্বীপের মত—এক হয়ে
আমরা মহাদেশ হই কোথায়? তোমার আমার স্রবার আগুন মিলে তো
দাবানল হয় না।”

দামোদরের দিকে তাকায় অরিন্দম। তার দু’চোখ তখন জ্বলছে।
মুখে কোন কথা আর সে বলল না, শুধু মনে মনে বলল যে হবে,

দাবানলের সৃষ্টি একদিন হবে। স্বীপে স্বীপে মিলে মহাদেশ হবে, নদীতে নদীতে মিলে মহাসমুদ্র হবে; কোটী কোটী সম্মিলিত মাতৃষের আঘাতে পাপের জগৎ ও মুষ্টিমেয় বাঘের অরণ্য একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। সে তাই করবে। এ তো তারি কাজ। ঈশ্বর! দামোদরের কথা কি সত্যি? তাহলে মাতৃষ বাঘ হয় কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা! তাহলে তো ঈশ্বর কুটিল।

“দামোদর”—

“বল”—

“ঈশ্বরকে কোথায় পাওয়া যায়?”

“লোকেরা বলে যে মন্দিরে, ধ্যানে, নিজের অন্তরের মণিকোঠায়।”

“মণিকোঠায়? তবে কি ঈশ্বরও পুতুল?”

“কি বলছ তুমি!”

“কিছু না, কিছু না। তুমি—তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ দামোদর?”

“না।”

“তাকে কি দেখতে পাওয়া যায়?”

“লোকেরা বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাঁকে দেখতেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমি জানি না। যাক সে কথা, আর নয়, এবার আমি যাই ভাই, এখনো বেশী রোজগার করতে পারিনি”—

“যাও। আবার দেখা হবে তো?”

“কে জানে?”

ঠন্ ঠন্ ঠন্। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল দামোদর। ভারবাহী বলদের মত। মাতৃষ মাতৃষকে বহন করে। লজ্জা। মাতৃষের ইতিহাস লজ্জাকর। ঈশ্বর। কেমন দেখতে সেই ঈশ্বর? বাঘের মত যে সব মাতৃষেরা আর সবাইকে বশীকৃত করে, নিষাতন করে, তাদেরই শাসনের কলে তো মাতৃষের দুঃখ। এখানে ঈশ্বরের নির্দেশ কোথায়? মিথ্যে কথা, ঈশ্বর কিছুই করেন না। কিন্তু মাতৃষ তাহলে সহ্য করে

কেন, কেন তারা এক হয় না? কেন? কেন? কৃধা। আর পাগ
 যায় না। এক মুঠো ভাত চাই। প্রজাপতি-পক্ষ-বাহিত যধু নয়,
 অর্ধবাতাসের তৈরী পানীয় নয়। বহুকায়র হৃদয়-নিঃডানো অন্ন আর
 জল চাই। বাচতে হবে, রঙীন বাবদের ধ্বংস করার জন্য বাচতে
 হবে।

অগ্নিদম্ব চলতে শুরু করল।

আকাশের মিড়ি বেয়ে অস্ত্রাচলের দিকে নামলেন সূর্যদেব। গোষ্ঠী
 রাগিনীর সুর যেন রঙ হয়ে লাগল মেঘের গায়ে। চারদিক অন্ধকার
 হয়ে এল। উদ্‌গম, অস্থির জীবনের ছন্দ যেন উচুপাড়ার চারদিকে
 আলো হয়ে জলে উঠল। আলো, আলো, আলোয় আলোয় চারদিক
 ঝলমল করছে।

ক্লান্তি। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বেদন। যধুধা। নিঃশ্বাস কেনচে
 কষ্ট হয়। আজো হল না, আজো কাছ পাওয়া গেল না।

আবার নীচুপাড়া। থোরা-ওঠা বন্ধুর পথ। আবর্জনা। কবরের
 গন্ধবাহী উচুপাড়ার নোংরা-জলে-ভরা নর্দমা। বরা মাড়ি। স্তিমিত
 বাষ্পীয় আলো। অপরিচ্ছন্ন চাষের নোকান। অন্ধকার। এখানে
 উজ্জল আলো নেই। এগানকার আলো গেছে উচুপাড়ার অথ
 উচুপাড়ার অন্ধকার এসেছে এখানে।

অচলনশ্বভাবে চলতে চলতে একটা গলির নব্বো ঢুকে পড়ল অগ্নিদম্ব।
 কিছুক্ষণ বাদে সে থমকে দাঁড়াল। এই গলি তার অপরিচিত।
 গলিটাতে খুব ভীড়। তার ডাঁপাশে নানা ধরনের খাবার ও মনের
 দোকান। আর দোকানগুলোর আশেপাশে, দরজার ধারে, খুলানে:
 বারান্দায় দাঁড়ানো নানা বয়সী নারীরা। উগ্রভাবে সজ্জিতা ও
 অলংকৃত। তাদের কাজল আঁকা চোখের তারায় ইস্পাতের কাঠিন্য,
 তাদের তাদুল-গাগ-গঠিত ঠোঁটের কোনে যেন কুহকিনীর হাসি। ওরা
 কারা?

“কি গো নাগর, এসো
অবিলম্বে চমকে উঠল।

ব্যাপার কি? এ কোথায় এ
ডাকছে কেন? কি চায় সে?

“কি গো, ভাবছ কি অত?

অবিলম্বে পেরেছ থেকে এক
লজ্জাকেন? ছ’চোখ বুজে হুজুং:

হাহা হিহি হাসি উঠল। দরজা
দোকানের পুরুষেরা হেসে উঠল।
তাদের দিকে। কেন, ওরা হাসল
হয়ে কিরে যাবার উত্তোগ
করল। চমকে কিরে তার

“এখানে কি করছি

“ভুলে চলে এসেছি

“চলুন।”

“দুজনে চলতে

হাসি যেন তপনো

কেন ডাকল ঐ

কি যেন একটা।

“শুধু”—

“কি?”

“ওই গলির

মুকুন্দ হাসল।

“তার মানে

“ওরা দেহকে।

“আমাকে একই

“কি ? চা খাচ্ছেন না কেন ?” ললিতা মুহূর্তে প্রশ্ন করল।

অরিন্দম বলল, “তোমাকে দেখছি।”

ললিতার মুখ রাক্ষা হয়ে উঠল কিনা তা বোঝা গেল না, ওপরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সে বলল, “আমার মধ্যে অত করে দেখার কি আছে ?”

“সৌন্দর্য।”

“আপনার মাথা ধারাপ।” ললিতা ধীরকণ্ঠে বলল।

অরিন্দম বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করল, “কেন ?”

“তা নইলে কেউ একদিনের আলাপেই এসব কথা বলে ?”

অরিন্দম মুহূর্তে হাসল, “ওঃ, এসব কথা বুঝি বলা ধারাপ ? আচ্ছা, তাহলে আর বলব না।”

চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। গরম মিষ্টি একটা পানীয়। মন্দ লাগল না তার। কিন্তু এ তো মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত। অগ্নিতে স্নাতভূতির মত। ক্ষুধার কি হবে ?

“আজ কাজ পেলেন ?” ললিতা প্রশ্ন করল।

“না।”

“চিন্তা করবেন না, পেয়ে যাবেন।” নরম গলায় বলল ললিতা। বলে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল।

আশ্চর্য। ললিতার সহানুভূতি যেন তার ক্ষুধাকাতর দেহের ভিতরে শান্তির অমৃত স্রষ্টি করল। কি অপরূপ এই নারী ! আর ওখানে, সংকীর্ণ গলির মাঝে, আহ্নার মুখে হাতচাপা দিয়ে ওয় ঝাঁপে, বাচার জন্তু দেহকে বিকিয়ে দেয়।

সময় কাটে। চায়ের ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। আগন্ধ পা তার হিংস্র নখ দিয়ে আঁচড় কাটে।

পদশব্দ।

অমিতা এল। কি চায় সে ?

লে

কু

তাজা। ব্য

“আপনার ঘরে একটু আসব ?”

“কেন ?”

অমিতা হাসল, বলল, “একটা চুলের কাঁটা কেলেছি আপনার ঘরে”—

শুককণ্ঠে বলল অরিন্দম, “নিয়ে যান।”

অমিতা ঘরের ভেতরে এল। মাদকতাময় তার দেহভঙ্গী। প্রতি পদক্ষেপে তার নিত্যম্বল তুলে ওঠে, স্তনযুগল কঁপে ওঠে। চারদিকে বারকয়েক তাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, হুঁহাত তুলে সে খোঁপাকে ঠিক করতে লাগল, উন্নত স্তনযুগল তাতে আরো উন্নত হল। হঠাৎ আঁচলটা কাঁধ থেকে খস পড়ে তার বাহুল্যকে অনাবৃত করে দিল। উত্তপ্ত কামনায় ঘরটা সজীব হয়ে উঠল। প্রদীপের শিখাটা কঁপে উঠল। অরিন্দম বুঝল। আমন্ত্রণ।

“চুলের কাঁটা পেলেন ?” সে প্রশ্ন করল।

“নাঃ, দেখছি না কোথাও ?”

“তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?”

অমিতা ভুরু কঁচকে অরিন্দমের দিকে তাকাল, প্রশ্ন করল, “আপনার শরীর খারাপ বুঝি ?”

“হ্যাঁ ?”

আঁচলটা তুলে নিয়ে ঠিকভাবে গায়ে জড়াতে জড়াতে অমিতা হাসল, “তাহলে জিরোন আপনি।”

অমিতা চলে গেল।

অরিন্দম ভাবে। অমিতার নির্বাক ভাষাকে সে বুঝতে পেরেছে। নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি এক রহস্যময় আকর্ষণ। ছুটি মিলে একটি স্বপ্ন হতে চায়। কিন্তু সে পারবে না। তার ভয়, পৈললিতা থাকতে সে অল্প কোন নারীকে কামনা করতে পারেননি ললিতা তার চিত্তকে জয় করেছে। ক্ষুধা। ভাত চাই। এখন

নটমন্টারের তানে সেই মণিময় কক গমগম করছে। ইয়া, মাহুষের
পৃথিবী বড় দুঃখের, দানবীয় শক্তির কাছে মাহুষ পরাজিত। ঈশ্বর।
কে সে? কেমন দেখতে? ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্বব্যাপী!
দুর্বোধ্য। ক্ষুধা। ললিতা আমার সামনে এসে দাঁড়াও। সেই গলির
নারীরা। টাকা। তারা টাকার জন্য শয্যাশ্রমিনী হয়। ক্ষুধা!
সব কিছু ভেঙ্গে ফেলবে সে, চুরমার করে ফেলবে—

রাত কাটে।

রাত কাটে।

ঘরের প্রদীপ নিভে যায়।

অন্ধকার। বাইরে কুকুর ডাকে, নর্দমার পাশ দিয়ে ইঁহর ও
ছুঁচোরা চলাচল করে, নীচুপাড়ার কোলাহল শুক্ন হয়ে যায়। আজব-
নগরের আকাশে নক্ষত্রেরা জলজল করতে থাকে। আর চোখের
সামনে, জোনাকীর মত বিবর্ণ আলোর কণারা জলে আর নেভে, জলে
আর নেভে।

দরজা ঠেলে কে ঘেন ভেতরে ঢুকল। অরিন্দম চমকে তাকাল।

“কে?”

জবাব দিল না লোকটা।

“কে তুমি? কথা বলচ না কেন?” অরিন্দম উঠে তার দিকে
এগোল।

গলির অস্পষ্ট আলোতে লোকটাকে দেখা গেল। মাঝারি গড়নের,
মাথায় বড় বড় চুল।

“শবরদার—আর এগিরো না”—লোকটা বলল।

“কেন?”

“ইয়া, এগিরো না—আমার হাতে ছোরা আছে।”

দুর্ভাগ্যবশত লোকটার হাতের অস্ত্র বাকবাক করে উঠল, জলে
তার চোখ দুটো।

অবিন্দক অবাক হল, “কিন্তু কেন, আমার ঘরে এসে আমাকেই শাসাচ্ছ কেন তুমি ?”

লোকটা চাপা গলায় বলল, “চুষ করো, ওরা শুনতে পাবে”—

“ওরা কারা ?”

“যারা আমার পেছা নিয়েছে।”

“কেন, কি করেছে তুমি ?”

খুন।”

“খুন !” অবিন্দম শিউরে উঠল, “মাহুষ খুন করেছে তুমি !”

লোকটা চাপা গলায় হাসল, বলল, “হ্যাঁ, না করে উপায় ছিল না।”

“কেন ?”

“অভাবের জন্ত চুরী করতে গিয়েছিলাম। টাকা পরমা নিয়ে পালাবার সময় একজন আমাকে ধরতে এল, উপায় ছিল না, তাকে সাবাড় করতে হল”—

“ওই ছোরা দিয়ে ?”

“হ্যাঁ। এই দেখনা, রক্তে কাপড় ভিজ়ে গেছে”—

“ফেলে দাও ঐ অস্ত্র—দূরে”—

লোকটা হাসল, “বেশী মামদোবাজী করোনা আমার সঙ্গে। ছোরা ফেলে দিলেই তো আমাকে ধরবে ওরা”—

দুর্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করল অবিন্দম, “মাহুষকে খুন করা যে পাপ—তা কি তুমি জানোনা।”

“জানি। আমি আমি নিরুপায়। আমি তো চুরী করতে চাইনি, খুন করতে চাইনি। আমি তো ভালই হতে চেয়েছিলাম”—

“তবে ?”

“শয়তানেরা শাসন করে আমাদের। তাদের নিয়মকানুনের চাপে পাপই করতে হয়, নইলে বাঁচা যায় না। খুন ! তারা তো প্রতিদিন খুন করে ?”

“কি ভাবে?”

“দেশ রক্ষার নামে অন্য দেশ আক্রমণ করে, রাষ্ট্ররক্ষার নামে সবাইকে বঞ্চিত করে। যুদ্ধ, ব্যাধি, অনাহার—প্রতিদিন মাতুষ মারা যায়, মারা যায় না—নিহত হয় তারা। সেই সব মহা মহিমাধিত শত্রুতানদের তুলনায় আমি কি করেছি? কিছু না। ওরা সবাইকে তিলে তিলে মারে আর আমি এক ঘায়েই শেষ করেছি—হা হা হা”—

অরিন্দমের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, সে বলল, “খামো। হেসো না। শোন—তোমরা সবাই প্রতিবাদ করোনা কেন? কেন এক হয়ে তোমরা মাথা তোল না?”

“সে কি একদিনেই হয়? হবে, সবাই একজোট হবে। মনুষ্যত্বের শত্রুদের আমরা ধ্বংস করতে চাইছি—ওরা ধ্বংস হবেই। আমাদের ইচ্ছা থেকেই আসবে শক্তি, পথ, ইচ্ছাপূরণের উপায়।”

“কিন্তু যতদিন তা না হয়?”

“ততদিন এমনভাবে চলেবে। জঙ্গলে থাকতে হলে জঙ্গলের আইনই মানতে হয়।”

“সে তো হিংসা, হিংসা দিয়ে তো হিংসাকে জয় করা যায় না।”

লোকটা হাসল, “তুমি বোকা। কাটা ছাড়া কি কাটা তোলা যায়?”

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, “জঙ্গলের আইনকে বুঝি, কিন্তু মানুষ কি পশুকে ভালোবাসতে পারে না?”

“পারে। কিন্তু সেই পশু একবার মানুষের ব্যক্তির স্বাদ পেলে আর ভালোবাসার কথা বুঝতে পারে না। তখন একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট থাকে—তাকে মেরে ফেলা।”

ভারী জুতোর শব্দ। গলি দিয়ে একজন নগর-বক্ষী যাচ্ছে।

লোকটা ফিসফিস করে বলল, “চুপ”—

নিঃশব্দতা।

রক্ষীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, দরজাটা খুলে একবার বাইরের দিকটা ভাল করে দেখে নিল, তারপরে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, “চল্লাম দোস্ত—তুমি ঘুমোও”—

অরিন্দম জবাব দিল না।

লোকটা চলে গেল।

অন্ধকার। লোকটা খুনী। লাল রক্তে ভেজা ছিল তার কাপড়। ছোরা। হিংসা। ভালোবাসো, সবাইকে ভালোবাসো। কিন্তু কি বলল লোকটা? নররক্তের স্বাদ-পাওয়া পশুদের তো জ্বর করা যায় না। ক্ষুধা। সেও কি চুরী করবে? খুন করবে? না। ওয়া হার মেনে শয়তানের নিয়মকে মেনে নেয় বলেই তো নিয়মটা পালটায় না, শয়তানের “রাজত্ব শেষ হয় না। অন্ধকার। কে? কেউ না। রাতের কোন প্রহর? অন্ধকার। আলো। আলোর কণা। জলে আর নেভে—নেভে আর জলে—দীপে, দীপে মন—মাহুঁরটা কোথায়? অন্ধকার—

সে হারবে না। তার অন্তরের গ্রহদ্বী কখনো ক্ষুধার কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না। করুণা ও দয়া ভিক্ষা করে সে অন্ন চাইবে না। তাই ভোর হতেই আবার বেরোল অরিন্দম। কাজ চাই, তার কাজ চাই।

আবার রাজপথ। জনতা। কোলাহল।

সময় কাটে।

“কাজ আছে?”

“না?”

বড় বড় অট্টালিকা। সূর্যদেবের অগ্নিবান। দ্রুত ধাবমান
গাড়ীঘোড়া। শব্দ। লোহা আর পাথরের সংঘাত। কঠিন জীবন।
ক্ষুধা। আর পারা যায় না। তবু আহত কুকুরের মত চলতে হয়।
চোখের সামনে সব কিছু মাঝে মাঝে ছলে ওঠে, নড়ে ওঠে, পায়ের
নীচেকার পথকে মনে হয় অসমান। কানের পাশে কিং কিং শোকার
ডাকের মত একটা একঘেঁয়ে শব্দ হতে থাকে। বেলা বাড়ে। না,
কাজ নেই। চারদিকে শুধু দে'য়াল।

একটা ক্যাক্টরী।

মস্ত বড় কটক।

“কাজ আছে?”

কে যেন বলল, “ভেতরে যাও, ঐ ঘরে।”

অন্ধের মত একটা ঘরে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম।

“কি চাই?” টেবিলের ওধার থেকে একজন লোক প্রশ্ন করল।

লোকটার মুখ বারংবার ঝাপসা হয়ে যায়।

“কাজ”—টেনে টেনে জবাব দিল অরিন্দম।

লোকটা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। যা মাথায় এল তাই জবাব
দিল অরিন্দম। অজ্ঞানের মত।

“পঁচিশ টাকা মাইনে পাবে—রাজী?”

“রাজী।”

একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল লোকটা, বলল, “কাল সকাল
ন’টায় হাজিরা দেবে।”

“আচ্ছা।”—

হাংড়ে হাংড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল অরিন্দম। জরী। হে
সূর্যদেব, আমি আমার ক্ষুধাকে জয় করেছি। জয় করেছি আমার
মন দিয়ে, আত্মা দিয়ে। কিন্তু তবু ক্ষুধা শক্তিশালী—সে আমার
কর্মকে হরণ করছে। এগোল অরিন্দম। পা বারংবার ভেঙ্গে যেতে

চাইল, বারংবার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়তে লাগল, বহুবার
বারংবার মুখটা বিকৃত হতে লাগল। না, আর পারা যায় না।
ওকি! বাড় আসছে বুঝি? ভূমিকম্প? অন্ধকার—অন্ধকার। সূর্যদেব,
তুনি কোথায়?

অরিন্দম টলতে লাগল, তারপর হঠাৎ রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

কোলাহল। লোকেরা ছুটে এল।

“আরে লোকটা পড়ে গেল যে”—

“গরীব”—

“নীচু পাড়ায় লোক”—

“চুক্ চুক্ চুক্—বেচারি!”—

“নাঃ, গরীবদের জন্তু এবার চাঁদা তুলতেই হবে”—

“কিন্তু লোকটা কি বেঁচে আছে?”

“দেখুনতো মশাই”—

একজন লোক এসে সন্তর্পণে অরিন্দমের গায়ে হাত রাখল, তারপর
মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে বলল, “আহা”—

“কি হয়েছে মশাই?”—

“মরে গেছে।”

“মরে গেছে! রক্ষী ডাকুন—হয়ত কোনো বিবাক্ত ব্যাধিতে
ভুগছিল লোকটা, নইলে কখনো চলতে চলতে মরে যায়?”

অরিন্দমকে স্পর্শকারী লোকটি লাফিয়ে উঠল।

“সত্যি, ভারী দুঃখের ব্যাপার।”

“লোকটার মৃত্যুসংবাদ একটা কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।”

ভীড় জমে উঠল।

হঠাৎ অরিন্দম একটু নড়ে উঠল। চোখের সামনে যেন অসংখ্য
হায়নার মুখ! ওরা কারা? সেই পুতুলের দেশে কি এখন অপরাহ্ন
নেমেছে? রূপসী নদীর ওপারে হয়ত শালবনের ছায়া এখন

দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। প্রান্তরে হরত প্রজাপতিরা এখন তাদের মধুসিক্ত
ত্বিষিত চেতনা দিবে শুনছে বীজের প্রার্থনা। আর সেই রূপবান
গায়ক হরত এখন মালবী রাগিনীকে মূর্তিমতী করে তুলেছে—
অন্ধকার—

কোলাহল। লোকেরা সরে পড়তে লাগল।

“সরে পড়ুন মশাই”—

“কেন?”

“মরেনি ব্যাটা।”

“তাই নাকি? ইস, খুব বেচেছি, আর একটু হলেই আমি জ্যান্ত
মাহুযকে দয়া করে ফেলতাম”—

“আরে বোকামী করবেন না মশাই। আজবনগরে জ্যান্ত
লোকের দয়া করতে নেই।”

“হেঁ হেঁ, বুঝেছি। মরা মাহুযেরা ঢের ভালো লোক মশাই,
কোন দাবীদাওয়া করে না তারা, শুধু চিত্তান্ত পৌছে দিলেই হল”—

“যা বলেছেন”—

“চলুন সরে পড়া যাক”—

ভাঁড় যখন কমে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সেখানে এসে দাঁড়াল
মুকুন্দ, অরিন্দমকে দেখে সে দ্রুতপদে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল,
তার হরম্পন্দন অহুভব করল, তারপর ডাকল, “অরিন্দম—
অরিন্দমবাবু”—

জ্ঞান ফিরে এল।

অরিন্দম তাকাল। সে ঘরের ভেতর শুয়ে আছে। তার চারপাশে
আছে বলরাম, দুর্গাবতী, মুকুন্দ, অমিতা, বাচ্চারা ও ললিতা।
তার দৃষ্টি থেকে যেন অমৃত বর্ষিত হচ্ছে। সেই অমৃতের স্পর্শে যেন
তার দুর্বলতা অস্থিহীত হচ্ছে।

তাকে চোখ মেলেতে দেখল সবাই।

লনিতার হাতটা এগিয়ে এল। একটা পেলাস।

“এই ছুটুকু খান”—

সবার দৃষ্টিতেই অসুৰোধ। অলিতার চোখেও। আর লনিতার
চোখে যেন আদেশ।

অলিন্দম গেলাসটাকে নিঃশেষ করল। আঃ। সমস্ত দেহে যেন
জীবনের জীবাগুরা সচল হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

কারো দিকে না তাকিয়ে মুহূৰ্ত্তে, বিড়বিড় করে সে বলল,
“বুঝলাম। মানব সভ্যতার ইতিহাস শুধু মানুষের ক্ষুধার ইতিহাস—
আর ক্ষুধা ছ’রকমের”—

একদল দানবের মত গর্জন করছে ফ্যাক্টরীর বহুগুলো। ইম্পাতের সঙ্গে ইম্পাতের সংঘাত, বাসুকী নাগের নিঃশ্বাসের মত শব্দ আর বয়লাবের ভেতরকার জাগ্রত আগ্নেয়গিরির উত্তাপে ফ্যাক্টরী উত্তপ্ত ও কম্পিত। তার মধ্যে দু'হাজার নয়নারী কাজ করছে। তাদের পরণে চুঁইড়া কাপড়, তাদের দেহে ঘাম ও কালি।

অবিন্দন ভাবছিল। হ্যাঁ, ক্ষুধাই মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে। আর ক্ষুধা দু'রকমের। জঠরের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা। কিন্তু দুই ক্ষুধার ফল আলাদা। জঠরের ক্ষুধা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, তা নিবৃত্ত করে মানুষ শুধু বেঁচে থাকে। আর নিছক বাঁচা একটা জান্তব ধর্ম। বাঘ, কুকুর, শেয়াল ও ইঁদুরেরাও সেই ধর্ম পালন করে, কারণ শুধু বেঁচে থাকারও একটা বিচিত্র আনন্দ আছে। ক্ষুধিবৃত্তি করে পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীই সেই আনন্দ ভোগ করে। আর তার ব্যতিক্রম হলেই বিপদ ঘটবে। প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই যেমন বিপদ ঘটবে তেমনি ঘটে ধ্বংস, বিপ্লব, রক্তপাত ও সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।

কিন্তু মানুষ শুধু বাঁচার জন্তে বাঁচে না। জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলেও তার ক্ষুধা মেটে না। তার আত্মা দাবী করে আরো কিছু। সাহস, বুদ্ধি, স্নেহ, ভালবাসার জন্ম হয় সেই দাবী থেকে। মানুষ তার জান্তব অস্তিত্বের গণ্ডী পার হয়, তার আত্মাকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ হয়। তখন সে সৃষ্টি করে দর্শন ও সাহিত্য, জয় করতে চায় তার চারদিকের প্রাকৃতিক বাধাকে। নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ এক রোমাঞ্চকর আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একটা চাবুকের শব্দে অরিন্দনের চমক ভাঙল। সে তাকাল।
সামনে একজন কর্মাধ্যক্ষ। ধর্মকায়, মেদবহুল, হিংস্র।

“দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কিছ, এ্যা?”

“আজ্ঞে কিছু না—

“কাজ করো—”

“আজ্ঞে হ্যা—”

কর্মাধ্যক্ষ মুখ বিকৃত করে বলল, “দশ বারো দিন হল কাজ করতে
এসেছ আর এরি মধ্যে ফাঁকি দিতে শিখেছ!”

“আজ্ঞে?”

“যাও যাও কাজ করোগে—”

অরিন্দম নিঃশব্দে কাজে হাত দিল। কাঁচা লোহার তালতুলোকে
একটা স্টেলাগাড়ীতে জড় করে একজায়গা থেকে আর একজায়গায়
নিয়ে যেতে হয় তাকে।

ফ্যাক্টরী চলতে থাকে। একদল দানবের মত যন্ত্রগুলো গর্জাতে
থাকে, তাদের পুঙ্খ পুঙ্খ বিযাক্ত কালো নিঃশ্বাস ফ্যাক্টরীর ধূম্রনল বেয়ে
আকাশকে মলিন করে। ইম্পাতে ইম্পাতে কঠিন সন্ধ্যাতের একটানা
শব্দ শোনা যায়—ধব্ ধব্—সুস্—ঠন্ ঠন্—সুস্—। সে শব্দে কানে
তালা লাগে। আগ্নেয়গিরির আগুন জলে বয়লারের গর্ভে। তার উত্তাপে
লোহা গলে জলের মত হয়। বাষ্পের ফৌস ফৌসানি শোনা যায়।
শোনা যায় গুরুভারবাহী যন্ত্র আর হাতুড়ীর শব্দ।

দু'হাজার লোক কাজ করে চলে। সমস্ত অশ্রু ক্লান্ত তাদের ভঙ্গী।
ঘামে ভিজ়ে যায় তাদের চোখালভাঙা শীর্ণ দেহ, ভিজ়ে যায় তাদের
তেল-কালি-লাগানো ছেঁড়া জামাকাপড়। যন্ত্রের চাকার মত বারংবার
গুঁটামামা করে তাদের শিরযুক্ত মাংসপেশীগুলো। আর অস্থির একটা
ঐচ্ছল্য মাঝে মাঝে তাদের ঘোলাটে চোখের তানায় চক্চক্
করে ওঠে।

কেন? আনন্দ নেই কেন? প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করতে চায়
 মানুষ, তার সেই আশ্চর্য ইচ্ছার প্রতীক এই যন্ত্রগুলো। মানুষের
 শক্তির প্রতীক। তবু মানুষ নিরানন্দ মনে কাজ করছে
 কেন?

অরিন্দম পাশের লোকটির দিকে তাকাল। তার নাম ইন্দ্র।
 ভয়ঙ্কর লম্বা ও রোগা, তার বড় বড় ছোটো চোখে বহু দৃষ্টি আর এক
 মুখ দাড়িগোঁফ।

“সুন্দর ভাই?” অরিন্দম ডাকল।

ইন্দ্র লোহার তালগুলো তুলতে তুলতেই বলল, “বলে যাও, কান
 খোলা আছে—”

“মানুষ শক্তিমান জীব—তার শক্তির নিদর্শন এই যন্ত্র, এই ক্যান্ট্রী
 —তবু এখানকার শ্রমিকেরা নিরানন্দ কেন?”

নিম্নকণ্ঠে হাসল ইন্দ্র বলল, “তুমি মাইরি একেবারে গেঁইয়া; আনন্দ
 থাকবে কি করে? যে যন্ত্র আমাদের ক্রীতদাস সে যে আজ আমাদের
 প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে—?”

“তার মানে?”

চারুকের শব্দ শোনা গেল। ভালকুস্তার মত লোলুপ সেই কর্মাধ্যক্ষ
 এসে সামনে দাঁড়াল।

“কি গুজ্ গুজ্ হচ্ছে, এঁয়া!”

বড় বড় দাঁত মেলে ইন্দ্র হাসল, বলল, “কিস্তা না হজুর—আমাদের
 পাড়ার একটা মেয়ের কথা বলছিলাম অরিন্দমকে”—

কর্মাধ্যক্ষের চোখভূটো চকচক করে উঠল, “মেয়ে? কোন মেয়ে?
 কি রকম মেয়ে?”

“এক্সে টগর—পনেরো ঘোল বছর বয়েস—কি বলব হজুর—মুণ্ড
 ঘুরে যায়। আহা—”

“তার কে আছে?”

ইন্দ্র গলার সুর নামিয়ে বলল, “মা ছাড়া তার আর কেউ নেই ছত্ৰ
আর টাকার চাহিদাও আছে খুব—”

কর্মীধ্যাক ঠোট বাকিয়ে হাসল, ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরো
ছোট করে বলল, “তোমার বাড়ীতে আজ যাবো ইন্দ্র, বুঝলে?”

“এজ্ঞে হ্যা—”

“রাতে—মটার পর—”

“এজ্ঞে হ্যা—”

“কাজ করো—”

কর্মীধ্যাক চলে গেল।

ইন্দ্র সাপের মত ফোস করে বলল “শালা—শালা লুচ্চা—”

অরিন্দম অবাক হল “তার মানে? আর কি সব বাজে কথা
বলচ তুমি?”

ইন্দ্র হাসল, বলল, “বাজে কথা! এদের কাছে ওইটেই কাজের
কথা। মেয়েছেলের গন্ধ পেলে শালারা কেপে যায়?”

“কিন্তু—রাতে যে যাবে বলল?”

“যাকনা। টগরদের অভাব নেই। শালা লুচ্চা—শালাদের
জানোয়ারের মত খাওয়া আর কুকর্ম ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।”

অরিন্দম কথাটা চাপা দিয়ে বলল, “কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা
শেষ করেনি ইন্দ্র—যন্ত্র আমাদের প্রভু হয়েছে কেন?”

ইন্দ্র কপালের ঘাম মুছে হাসল, বলল, “বুঝতে পারেনি? যন্ত্রকে
হামরা চালু রাখি এবং সেইজন্যই যন্ত্র আমাদের অনবরত ঘাটায়, শোষণ
হবে। কিন্তু যন্ত্র আমাদের ওপর প্রভুত্ব করে আর একজনের জন্য—”

“সে কে?”

“সে ধনবান। তার আর এক নাম মালিক। প্রকৃতিকে জয়
করার সমস্ত জ্ঞান ও যন্ত্রকে সে চক্রান্তবলে নিজের করতলগত করে
নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে দুর্বল করে শোষণ করে।”

“তাই সব—শোন—”

কয়, ঈর্ষাকার একটা লোক এসে তাদের পেছনে দাঁড়াল, কিস্কিন্দী
করে বলল, “আজ রাতে—মনিষকদের ওখানে আমাদের সঙ্গে
আলোচনা হবে—তোমরা এসো—বুঝলে?”

লোকটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন একটা খোলা তলোয়ারের কথা
কথা মনে পড়ল অরিন্দমের।

আর ঠিক সেই সময়েই ক্যাক্টরীর গ্রহরী বন্দুক কাঁধে আসতে আসতে
ঘোষণা করল, “হু-সিয়ার হয়ে যাও—হু-সিয়ার—হাজার হাজার নরনারীর
ত্রাণকর্তা, অন্নদাতা, প্রাণদাতা ও পরম দয়ালু মালিক শ্রীচতুরলাল
আসছেন—”

“চুপ—”

“চুপ—”

“হু-সিয়ার হয়ে যাও—হু-সি-রা-র—”

মুহূর্তে ঘরের চেহারা বদলে গেল। যে যার কাজে তপস্বীর মত
মনোযোগ দিল। অতিভক্ত কর্ণাধারের চাবুক ঘন ঘন বাতাসকে
কাটতে শুরু করল। অরিন্দম, ইন্দ্র এবং সেই রোগা লোকটাও কাজে
মন দিল।

চতুরলালকে দূরে দেখা গেল। তাকে দেখে সবাই আড়নরনে
পরস্পরের দিকে তাকাল। যেন তারা নিঃশব্দে বলাবলি করল যে
চতুরলালকে তারাই তৈরী করেছে। তাদের রক্ত মাংসকে শোষণ করেই
চতুরলালের মেদসমৃদ্ধ, নবনীত কোমল, সোনা হীরে আর মূল্যবান
পোষাকে মোড়া দেহটা গড়ে উঠেছে।

চতুরলাল কাছে এগিয়ে এল। মোটা, গৌরবর্ণ, খড়্গের মত নাক,
বাজপাখীর মত চোখ, চারটে হীরের আঙঠি ছাতে আর গলায় তার
মোতির মালা।

অরিন্দম অবাক হয়ে দেখতে লাগল। চতুরলাল এসে ধামল।

ক্যান্টরীর কর্মাক্ষেপা এবং দানবীর দানব অভিভক্তেরা এসে সমস্ত
তার চারিদিকে ইট্টি পেড়ে বসল।

চতুরলাল তাদের ওপর একবার নজর বুগিয়ে নিয়ে ডুক কুটকাল
তারপর বলল, “তোমরা সবাই শালা—”

ভক্তেরা বিগলিত হয়ে মাথা নাড়ল, “আজ্ঞে হ্যা—”

“শালায় বেটা শালা—”

“আজ্ঞে হ্যা—”

“আর বাকী সব মজুরেরা সবাই কুড়া—সুয়েদের বাচ্চা—”

“ঠিক বলেছেন হুজুর—”

চতুরলাল থামল। তারপর এদিক এদিক তাকিয়ে বলল, “আমি
খুখু ফেলব—”

অভিভক্তেরা হাত পেতে বলল, “ফেলুন হুজুর—”

চতুরলাল খুখু ফেলল, ক্রমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, “শোন
জানোগারেরা—”

ভক্তেরা হাতজোড় করল, “বলুন হুজুর, বলুন—”

চতুরলাল পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নাড়তে নাড়তে
বলল, “বিশেষ জরুরী কথা। গত বছর আমার চারটে ক্যান্টরীর
মুনাকা ছিল ছ’কোটি, এবছর আমার মুনাকা হয়েছে সাতকোটি—কিন্তু
তবু আমার লোকমান হবে। কেন জানো? আমার খরচ বেড়েছে।”
স্বতরাং সব দিক সামলাতে হলে আমাকে মুনাকা ও বাড়াতে হবে—”

“থক থক থক—থক থক থক—”

“কে কাশে?” চতুরলাল গজ্ঞে উঠল।

তবু কাশি থামল না। একটানা ভাবে কে যেন কেশেই চলেছে।

থক থক থক—থক থক থক—থক থক থক।

আবার গর্জাল চতুরলাল, “কে? কে কাশছে?”

একটানা কাসির শব্দ। সুপরিচিত কুৎসিৎ কাশি। চতুরলালের

গর্জনে সঙ্গত হবে উঠল চতুরলাল, “তোমার একাংশ একপাশে করে দাঁড়াল। হাড়-জিরজিরে পায়ের মত দেখতে, কোটরসত হঠাৎ বিকর্ণ বড় চোখে তার অস্থির কবুতি। সে-ই কাশছে।

লোকেরা সরে যেতেই বুড়োর চতুরলালের ওপর নজর পড়ল। চোখের তারায় ভয় ঘনাল তার। কাশি থামাবার জন্য সে মুখে হাত চাপা দিল। কাশি থামল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে লাল রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল, শরীরটা ধরধর করে কেঁপে উঠল।

শিউরে চীৎকার করে উঠল চতুরলাল, “বন্দা! কি সংঘাতিক কথা! শিগ্গীর সরাও ওকে—শিগ্গীর বরখাস্ত করো—জলদি—”

বুড়ো কেঁদে উঠল হাউহাউ করে, “হজুর, মানিক—দোহাই আপনার—বরখাস্ত করবেন না হজুর—চাকরী গেলে কি খাবো হজুর?”

চতুরলাল হাসল, “কি কথা! কি খাবে তা আমি কি বলব বাপু—”

“মরে যাব হজুর—”

“পৃথিবীতে কেউই বেঁচে থাকে না।”

“হজুর আমার দিকে তাকান—”

“না বাপু, তোমার দিকে তাকালে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে—”

“ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন হজুর—”

চতুরলাল হাসল, “ভগবান! আমিই তো ভগবান—না কি বলছে?”
অতিভক্তদের দিকে তাকাল সে।

অতিভক্তেরা অবগাধত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, “নিশ্চয়ই। আপনিই তো স্বয়ং ভগবান হজুর—যুগে যুগে আপনিই তো অবতার হয়ে আসেন—”

বুড়ো তবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “আপনার ক্যাঙ্করীতে কুড়ি বছর কাজ করছি হজুর—”

“তাতো করবেই। তুমি কেন হাজার হাজার লোকেরা করবে।
আমার ক্রীতদাসত্ব করার জন্তেই তো তোমরা জন্মেছ”—

“হজুর—হজুর”—

ইঠাং কিশোর মত ফ্যাক্টরী কাঁপিয়ে গর্জে উঠল চতুরলাল, “নিম্নে
বাও—ওকে ভাগাও—কুত্তারা সব দাঁড়িয়ে আছিল কেন।”

কর্মীধ্যক্ষ ও অতিভক্তেরা বুড়োর দিকে ছুটে গেল। উত্তেজিত
শিকারী কুকুরের মত।

“বেরো”—

“বেরিয়ে যা বুড়ো”—

“তুই অসুস্থ”—

“তোমার দরকার নেই”—

“তুই মর”—

বুড়োকে টানতে টানতে তারা ফ্যাক্টরীর বাইরে বেধে আবার
ফিরে এল। বুড়ো যেখানে বসে রক্তবমি করেছিল সেখানে তারা
ওষুধ তেলে দিল, ওষুধের তীব্র গন্ধটা সবার নাকে ভেসে এল।

চতুরলাল সেই কাগজের টুকরোটা নাড়তে নাড়তে আবার বলতে
শুরু করল, “হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমার মুনাকা এবারে দশ কোটি
করতে হবে। কেন শুনবে? আমার খরচ বেড়েছে। বুঝতে পারছ
না, মদ মেয়েমানুষের দাম অনেক—তাছাড়া আরো দু’তিনটে ব্যবসা
ফাঁদব, আজবনগরের কর্তা হবার চেষ্টা করব, আত্মপ্রচারের জন্য টাকা
চালতে হবে—অনেক খরচ। সুতরাং ফাঁকি নিলে চলে না—রোজ
আরো দু’ঘণ্টা করে তোমাদের বাড়তি খাটতে হবে”—

প্রমিকেরা অশ্রুটকণ্ঠে বলে উঠল, “আরো দু’ঘণ্টা!”—

চতুরলাল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, “হ্যাঁ, আরো দু’ঘণ্টা—যার পোষাবে
না—সে চলে যেতে পারে। বাজারে ক্রীতদাসের অভাব নেই—। আর
শোন, কাল থেকে শতকরা পাঁচ টাকা করে মাইনে কমল তোমাদের”—

শ্রমিকেরা আত্ননাদ করে উঠল, “না-না—আমাদের মাইনে কমাবেন না হজুর”—

“চোপ্‌রও জানোয়ারেরা”—

শ্রমিকেরা চূপ করল। শুধু অরিন্দমের পাখবত্তী সেই কণ্ঠস্বয়, শীর্ণ লোকটা উত্তেজিত হয়ে পা বাড়াল।

ইন্দ্র লোকটির হাত চেপে ধরে চাপাগলায় বলল, “পাগলামী করোনা শোন”—

লোকটা পাগলের মত হাত ছাড়িয়ে সবাইকে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল, চতুরলালের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

“হজুর, একটা কথা”—

“বল”—চতুরলাল ভুরু ঝুঁচকে তাকাল তার দিকে।

শীর্ণ লোকটার চোখে যেন তলোয়ার ঝলসাল, সে বলল, “আপনি আমাদের মানুষ মনে করেন না—তাই না?”

চতুরলাল তার দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাল, মাথা নেড়ে বলল, “মানুষ! কি সাংঘাতিক কথা! তোমরা মানুষ! কখনো না—?”

“কিস্তি কেন?”

“কারণ তোমরা মানুষ নও। গরীবেরা কখনো মানুষ হয়না”—

“শোন চতুরলাল”—

চতুরলাল লাফিয়ে উঠল, “কি বললি!”

অতিভক্তেরাও লাফিয়ে উঠল, “কি বললি!”

শীর্ণ লোকটা দাঁত মেলে হাসল, বলল, “সাবধান হও চতুরলাল, কে মানুষ আর কে জানোয়ার তার বোঝাপড়া এবার শিগ্গীরই হবে—”

কর্মাধায়েচা চাবুক চালান, বাতাসে যেন বিষাক্ত সাপের হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা গেল। শীর্ণকায় লোকটার চামড়া কেটে রক্ত বেরোল। তবু সে বলল, “চতুরলাল, তুমি জানোয়ারেরো অধম—”

“মারো, ওকে মেরো ফেলো—” চতুরলাল হিংস্রভাবে আদেশ করল।

কর্মাধ্যক্ষ ও অতিভক্তেরা ছুটে গেল শীর্ণ লোকটার দিকে, কাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ঐশ্বর্য আর পশুত্বের কাছে নর্য বিকিয়েছে যারা তারা লোকটার গলা টিপে ধরল।

“মারো—শালাকে মেরো ফেলো—”

অসহায়, রক্ত লোকটার দুর্বল প্রতিরোধ বার্থ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার দেহ নিস্পন্দ হয়ে গেল, বড় বড় চোখ দুটো যন্ত্রণায় আরো বিফারিত ও স্থির হয়ে গেল।

একজন কর্মাধ্যক্ষ মুহূর্তে ছেসে বলল, “সাক্ষ্য করেছি ছজুর—”

চতুরলাল এগিয়ে গেল শবদেহটার কাছে, তার গায়ে একটা পদাঘাত করে বলল, “শালায় কি সাহস দেখেছ! এ্যা! ঠিক আছে, রাস্তায় কেলো দাও ওটাকে আর নগররক্ষীদের একটা খবর দাও যে আমাকে খুন করতে এসেছিল বলেই প্রাণ গেল লোকটার—”

“আজ্ঞে আচ্ছা—”

“আমি, চলাম—আমার কথা মনে রেখে কাজ করো জানোয়ারেরা—”

চতুরলাল চলে গেল। তার পেছনে সেই বন্দুকধারী প্রহরী। দু'জন অতিভক্ত শীর্ণ লোকটার শবদেহকে বাইরে ফেলে দেবার জন্য টানতে টানতে নিয়ে গেল।

কর্মাধ্যক্ষেরা চানুকের ঘায়ে বাতাস কেটে বলল, “কাজ করো—কাজ করো সবাই—”

নিঃশব্দে সবাই কাজ শুরু করল। নির্বাক পাথরের মত।

অবিন্দমও কাজ করতে লাগল।

ফ্যাক্টরীর লৌহ-দানব গর্জাতে থাকে। সবাই নিঃশব্দে কাজ করে। কিন্তু তাদের অন্তরেও একটা দানব গর্জাচ্ছে।

চাপাগলায় ইন্দ্র বলল, “এবার বুঝতে পেরেছ অরিন্দম—কেন আমরা নিরানন্দ?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র বলে চলল, “ঐ সব ঐশ্বর্যবান শক্তিমদমত্তদের জন্তই আমাদের এই দুর্দশা—মাছুষের মাঝে এই অসাম্য। ক্রমেই বুঝতে পারবে সব। বুঝতে পারবে যে ওদের জন্তই মানুষ এগোতে পারছে না, পশুত্বের সীমা লঙ্ঘন করতে পারছে না—”

একজন যুবক কাছে এল, ফিফ্টিফ্টি করে বলল, “তোমার আমার চোখের সামনে একজনকে হত্যা করল ওরা সেকথা ভুলো না আজ রাত্রে সঙ্গে মণিশঙ্করের ওখানে—অবশ্যই আসবে—অবশ্যই—”

এগিয়ে গেল আর একজনের কাছে। সবাই কান পেতে শুনল সে কথা। দু’হাজার লোকের চোখে যেন ছাইচাপা আগুন দিকি দিকি জ্বলতে লাগল।

কাজ চলতে থাকে। যন্ত্রও চলতে থাকে। লৌহদানবেরা গর্জায়। বিরাট বিরাট লোহার চাকা ঘোরে, ইম্পাতের সঙ্গে কঠিন ইম্পাতের সংঘাতে ফ্র্যাক্টরী কাঁপে, বয়লারের উত্তাপে চামড়া পুড়ে যেতে চায়। দু’হাজার লোকের মাংসপেশীগুলো অতিশ্রমে অবশ হয়ে আসে, শরীর ঘামে ভিজে যায়, কালিতে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে আর গগনস্পর্শী ধূম্রনল বেয়ে যন্ত্রদানবের কালো নিঃশ্বাস আকাশকে অশুচি করে।

ঝঙ্-ঝঙ্-ঠক্-ঠক্—ঝঙ্-ঝঙ্—ঠন্-ঠন্—একটানা শব্দ হতে থাকে। ব্যস্ত, ত্রস্ত পদক্ষেপ, পকাশ মণি হাতুড়ীর শব্দ, বাষ্পের ঘোঁসঘোঁসানি—তালে তালে চলতে থাকে। যেন দ্রুতলয়ে কেউ ভৈরব রাগের আলাপ করছে। এখন ক’টা? কোন গ্রহর? রূপসী নদীর ধারে কি এখনো অপরাহ্নের রোদ রঙীন হয়ে ওঠেনি?

সন্ধান অন্ধকারে কাক্তরীর কর্কশ বাঁক বেছে উঠল। ক্রান্ত শ্রান্ত, ধর্মীক্‌ত মাহুয়েরা কাতারে কাতারে বাইরে বেরোল। মাথা বিম্বিম্ব করছে তাদের, কানের কাছে তখনো যেন লোহার দানবেরা গর্জাচ্ছে।

বেরোতেই ইন্দ্র এসে দাঁড়াল পাশে, ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশ্ন করল,
“সত্যে যাবে না?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “বাব—”

“চল—”

দুজনে এগোল। উচুপাড়ার অট্টালিকা ও আলোক-সমারোহকে পেছনে ফেলে তারা নীচুপাড়ার সীমানায় এনে পড়ল। আঁকা আঁকা গলি আর বাস্তব মধ্যে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া যেন মূর্জাহত কৃষাশার মত স্থির হয়ে আছে। তার মাঝে টিমটিমে ভৌতিক আলো। চারদিকে কবরের গন্ধ। শব্দহীনদের মত শ্রান্ত, ক্রান্ত নরনারীর মিছিল। সব অতিক্রম করে তারা নীচুপাড়ার সীমান্তে এসে থামল।

একটা কানা গলির শেষে একটা ভাঙ্গা পুরোন বাড়ী। বাস্পীয় আলোক থেকে অনেক দূরে—আবছা অন্ধকারে।

ইন্দ্র ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, “দাঁড়াও—”

বাইরের ঘরে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছিল। সেই ঘরে ছিল দু'জন লোক। অরিন্দম একজনকে চিনল। তাদের কাক্তরীর একজন যুবক সহকর্মী। অপরজন প্রোট, ইন্দ্রের মত ধারালো তার চোখমুখ, শক্ত তার দেহের কাঠামো। মাথায় টাক, মুখে ছোট দাড়ি আর গোঁফ।

ইন্দ্র বলল, “ওরি নাম মনিশঙ্কর অরিন্দম—আমাদের একজন নেতা—”

সহকর্মী যুবকটি মনিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমাদের লোক—”

মণিশঙ্কর মুহূ হেসে বলল, “সোজা ভেতবে যাও—অন্দরমহল পেরিয়ে, খিড়কির দরজা দিয়ে গেছনকার জঙ্গলে যাও—”

অরিন্দম ও ইন্দু এগিয়ে গেল নির্দেশমত।

চলতে চলতে ইন্দু বলল, “বুঝলে? দ্বীপুত্র সব খুইয়েছেন মাণশঙ্কর—শাসকদের খপ্পর থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন উনি আমাদেরই মঙ্গলের জন্য—”

তুনে অরিন্দমের চোখে প্রশ্ণার ছায়া ঘনাল। তাহলে মাণ আছে! , অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নড়াই করার জন্য প্রহরী আছে! আব্ছা আব্ছা মনে পড়ে। সে-ও যেন এক প্রহরী ছিল—তার হাতে ছিল একটা বাঁকা তলোয়ার—

“দেখে দেখ—”

অরিন্দম তাকাল। একটা জঙ্গল। বড় বড় আমজামের গাছ। আগাছা আর ঝোপঝাড়কে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে প্রায় হাজার খানিক লোক। তাদের সামনের দিকে ছোট্ট একটা বেদীর মত, তার পাশে একটা অতৃজ্জল আলো। মুহূর্তে কথা বলাবলি করছে সবাই। তাদের সেই গুপ্তজনধ্বনির সঙ্গে ‘ঝি’ ‘ঝি’ শোকাদের মধ্যম লয়ের একাতান মিশে যাচ্ছে।

অরিন্দম আর ইন্দু একপাশে বসল। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন অরিন্দমের কাঁধে হাত দিল। অরিন্দম ফিরে তাকাল। মুকুন্দ।

“তুমি!” অরিন্দম খুশী হয়ে হাসল।

“চুপ্!” মুকুন্দ ঠোটে হাত দিয়ে ‘ফিস্’ করে বলল, “আন্তে।”

“কেন?”

“সত্যের ও স্ত্রায়ের শত্রুতা বাতাসেও ভেসে বেড়ায়।”

“তাতে ভয়ের কি?”

“তৈরী হওয়ার আগেই যে ধরা পড়ে যাবে?”

“হু—”



“তুমি এসেছ দেখে খুশী হলাম।”

“কেন আসব না? সত্য জায় এবং শান্তির জগতই তো আমার জন্ম।”

“তুমি লক্ষী ছেলে।”

চারশাশ থেকে মুহুর্তের সতর্কবাণী উদ্ভিত হল, “চুপ করো—সত্য মুক হল”—

নিঃশব্দতা। বেদীর ওপর মণিশঙ্কর এসে দাঁড়াল। সমাহিত তপস্বীর মত, ধূম্রহীন আগ্নেয়গিরির মত, বজ্রগর্ত প্রশান্তির মত।

মণিশঙ্কর একবার তাকাল চারদিকে, তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, “ভাইসব, আমাদের এবার তৈরী হতে হবে। পশুশক্তির অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা আর আমাদের নেই—”

অবিন্দন তাকাল চারদিকে। সত্যাপিপাসু জনতার মুখে কি বিচিত্র আলো, কি আশ্চর্য্য জ্যোতি তাদের চোখে!

একটার পর একটা কথা বলে চলল মণিশঙ্কর। একটার পর একটা অগ্নিময় উচ্চারণ করে চলল সে। পৃথিবীতে অন্তরের রাজত্ব কায়েম হয়ে আছে। সেই সব রসগুণ থেকে মানুষ মানুষ হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শুধু মুষ্টিমেয়ের জন্ত। তারা পশুশক্তির তাড়নার চিরকাল প্রভুত্ব করার লোভে সমাজগঠন করেছে, জাতিবর্ণের সৃষ্টি করেছে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে, নীতিবাক্য রচনা করেছে, সভ্যতার নামে বিচিত্র ধন-তত্ত্বের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তাদের তারা শৃঙ্খলিত করেছে, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও ব্যাধির চাকার দিয়ে তাদের শোষণ করে চিরকাল দাসত্ব করতে বাধ্য করেছে। দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার, মহাপুরুষদের বাণীকে তারা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে প্রয়োগ করেছে। নিজেদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত তারা শান্তি বজায় রাখার নামে গড়েছে সৈন্যদল। কিন্তু মানুষ পাথর নয়। দারিদ্র, অশিক্ষা, ব্যাধি ও অত্যাচারের একটা অনিবার্য শিক্ষা আছে।

সেই শিক্ষায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের জ্ঞান চাই, তাদের অভাব দূর করতে হবে, নীরোগ হতে হবে, মুক্ত হতে হবে। তাদের চারদিকে যে বিচিত্র চক্রান্তজাল দীর্ঘকাল ধরে বিছানো রয়েছে তা তারা দেখতে পেয়েছে। তাই তারা আর সহ্য করবে না। পথ এক। যে মুষ্টিমেয় পন্থারাজেরা তাদের পশুবৎ গণ্য করছে তাদের তারা ধ্বংস করবে। কিভাবে তা জানা কঠিন নয়। কারণ মহৎ ইচ্ছার ঐক্যজালিক ক্ষমতা আছে। শূণ্যতার মধ্যেও সেই ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করতে পারে। স্বতরাং সবাইকে তৈরী হতে হবে। ইম্পাতের মত কঠিন ও নির্দয় হওয়ার ব্রত পালন করতে হবে।

একটার পর একটা অগ্নিক্ষরা কথা। দেহের মধ্যে রক্তের স্রোত যেন উদ্দাম হয়ে উঠল, পেশীগুলো যেন পাথর হয়ে উঠল, হৃদয়ের মধ্যে যেন কেউ অনেকদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠল, চোখের মধ্যে যেন মধ্যাহ্ন-স্বপ্নের দীপ্তি বলসাল। হ্যাঁ, ব্রতপালন করতে হবে, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

সভা সাদ্দ হল। কয়েকদিন পরে আবার মিলিত হবে সবাই। তাদের তৈরী হতে হবে। সবাইকে তৈরী করতে হবে। তারপর তারা মালিকদের অগ্ন্যগ্নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সংগ্রাম শুরু করবে।

নিঃশব্দে, একে একে সবাই বেরিয়ে যেতে লাগল। অবিন্দমও বেরোল।

গলিতে নামতেই মুকুন্দ এসে টাঁড়াল পাশে, বলল, “চল, আমিও যাই।”

নিঃশব্দে চলে ছ’জনে।

একটা বাষ্পীয় আলোক পার হয়ে আর একটা বাতি আসে। তাদের

ছায়া দুটো বড় হয়, ছোট হয়, বড় হয়—। ক্রান্তিতে অবয়বহীন ছায়ামূর্তির মত মানুষেরা চলে। নর্দনার পাশ দিয়ে ছুঁচোরা দৌড়ে পালায়। সস্তা মদ খেয়ে টলতে টলতে খাণ্ডী খোজে অনেকে।

“অরিন্দম—”

“উ?”

“কয়েকজন মানুষ মিলে পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝতে পারিলে?”

“বানিকটা”—অন্তমন্ডভাবে অরিন্দম জবাব দিল, পাশ্চাৎ প্রশ্ন করল, “কিছু—কিছু মানুষকে সচেতন করে, শিক্ত করে কি মানুষ করা যায় না?”

“যায়—কিন্তু তা টেঁকে না। কারণ মানুষ হয়ে বেশীদিন তুমি বাঁচতে পারবে না। সমাজব্যবস্থার এমনি মজা যে তোমাকে দয়গুপ্ত বিক্রি করে জুড় হয়ে বাঁচতে হবে। অতএব স্থায়ীভাবে মানুষ হতে গেলে তোমাকে সম্ভবতঃ হতেই হবে—সংগ্রাম করে বিশ্বব্রহ্মের শিকড়কে তুলতেই হবে—”

অরিন্দম জবাব দিল না, নিশ্চয়ই সে শুধু চলতেই লাগল।

হঠাৎ মুকুন্দ বলল, “খামো অরিন্দম—”

অরিন্দম থামল, “কেন?”

মুকুন্দ মুহূর্তে হেসে বলল, “আমার সঙ্গে একজারগায় চল।”

“কোথায়?”

“শক্তিমানদের মাইনকাচুন আর স্তায়নীদিগ আর একটা দিক দেখাব তোমাকে। এসো—”

“বাত হয়েছে—”

“হোকনা একটু, কি যায় আসে?”

“কিমে পেয়েছে—”

“কিছুমিছু খাওয়া বাবে। এসো—”

“চল”—

মুখা। অরিন্দম হাসল। সত্যি কি তাই? মোটেই না। মনের নিভতে কিন্তু আর একটা কথা। একটা আকর্ষণ পিপাসা। একটা কামনা। নীচুপাড়ার অন্ধকারে মাহুঘের আত্ম জাগ্রত হচ্ছে, সেই আত্মার ঘোষণা শোনার পরই একবার ললিতাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। যেন অজস্র পুষ্প-গরবিণী ঋতু বসন্ত। বহুদূরের সেই মনিমায়িকা খচিত আশ্চর্য জগতের এক নর্তকীর মত—যার নৃত্যরত পদক্ষেপে ফুল ফোটে, কোকিল ডাকে, তুষার গলে জল হয়—

“এদিকে এসো—”

অরিন্দম সবিস্ময়ে বলল, “আবার যে উচুপাড়ার কাছে এলে?”

“হ্যাঁ, এখানেই—ওই লাল আলোর হরফে লেখা দোকানে”—

“বাবু ভোজনালয়?”

“হ্যাঁ।”

নীচুপাড়া আর উচুপাড়ার সংযোগস্থলে একটা দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীটার একপাশ থেকে একটা সুদীর্ঘ তন্তু আকাশের দিকে উঠে গেছে তন্তুর গায়ে কেজ্জার ছবি আঁকা অসংখ্য কেজ্জা। রাস্তা থেকে অনেক গুলো প্রশস্ত সিঁড়ির সারি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। বাইরের দিকে ভাইনে বাঁয়ে সুসজ্জিত দ্বার-রক্ষী। তারা উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে হাত তুলে অভিবাদন করল।

ঢুকতেই মন্ত বড় হলঘর। তার দরজার গোড়ায় গিয়ে মুকুন্দ থামল। অরিন্দমও থামল।

“মুকুন্দবাবু—আরে ও মশাই—” হলঘরের একপাশ থেকে ডাক শোনা গেল। মুকুন্দ তাকাল সেদিকে, মুহূ হেসে এগোল।

“ওকে?” অরিন্দম প্রশ্ন করল।

“আজবনগরের একজন নামজাদা লেখক, আমার সঙ্গে আলাপ আছে—”

মুকুন্দ গিয়ে দাঁড়াল সেই লোকটির কাছে।

“নমস্কার ললিতবাবু—”

ললিতকুমার মিষ্টি করে হাসল, “আহা বহু—তারপর, কি খবর?”

মুকুন্দ বলল, অরিন্দমকে বসতে বলে সে ললিতকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, “ইনি আমার বন্ধু অরিন্দম ললিতবাবু—আপনার পরিচয় উনি জানেন—”

“বটে! নমস্কার অরিন্দমবাবু—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আদিত্য নিকেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি।”

অরিন্দম বিনীতভাবে হাসল। তার হুঁচোপে অঙ্কা ঘনাল।
লেখক! শিল্পী! মাহুষের আত্মাকে চিরজাগ্রত রাখার গুরুত্ব দায়িত্ব
যার ওপর! বাঃ!

ললিতকুমার মুকুন্দের দিকে তাকাল, “তারপর? কি খবর বলুন?”

“আর খবর—বুঝতেই তো পারছেন—”

“হ্যাঁ, তা পারছি বৈকি—সময় বড় খারাপ—মতি”—

অরিন্দম তাকাল। বিরাট হলঘর। তার মাঝে বড় বড় গুল্ম।
দেয়ালের রং হালকা নীল, তার গায়ে পাখী, ফুল আর অঙ্ক-বিবসনা
সুন্দরী নারীদের লাস্ত্রময়ী ছবি। অনেকগুলো টেবিল আর তার চারপাশে
দিকে চেয়ার। বহুরকমের নরনারী। সামনে একটি ঘুবক একটি
ঘুবতীর দিকে তাকিয়েই আছে। দু'জনেরই সামনে সোনালী চা।
ঘুবতী চা পান করছে, ঘুবক তাই নিম্পলকনেত্রে চেয়ে দেখছে, নিজের
চা খেতে সে ভুলে গেছে। হাসি, গুঞ্জনধ্বনি, হীহকার। পানীয় ও
খাদ্যবাহকদের দ্র্যস্ত চলাফেরা। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে চটুল বাগ-
যন্ত্রের ধ্বনি। বিচিত্র পরিবেশ।

“খান অরিন্দমবাবু”—ললিতকুমারের গলা শোনা গেল।

অরিন্দম তাকাল সামনে। এক পাত্র খাবার। সে বিনীতভাবে
হাসল। চমৎকার লোক ললিতকুমার। দীর্ঘকায়, সুন্দরী ঘুবক ললিত-

কুমার । তার সারা দেহে বেন তার শিল্পীমনের ব্যক্তনা । টানা টানা
চোখ, কঁকড়া নো চুল, টকটকে বং ।

হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চল নিয়ে বে উপজাতি লিখেছেন—তা
অপ্ৰব হয়েছে ললিতবাবু—মুকুন্দ মুখকণ্ঠে বলল ।

বিদগ্ধ হাসি হেসে ললিতকুমার বলল, “আপনার ভালো লেগেছে !
ধন্যবাদ”—

“আচ্ছা, আপনি কি ঐ দুর্গম অঞ্চলে কখনো গিয়েছিলেন ?”

ললিতকুমার মুহু মুহু হাসতে লাগল ।

“নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন তা নইলে ওখানকার মানুষদের নিয়ে অত
নিখুঁতভাবে লেখা সম্ভব হত না”—

ললিতকুমার একটু ঝুঁকল, চাপাগলায় বলল, “তাহলে আপনাকে
বলেই ফেলি”—

“কি ?”

“আমি ওখানে মোটেই বাই নি—”

“যান নি !”

“আপনি ক্ষেপেছেন—সত কষ্ট করার দরকার কি ?”

“সত্যের খাতিরে ?”

“সত্য ! হুঃ—আমার কল্পনাশক্তি সত্যের চেয়েও সুন্দর জিনিষ
সৃষ্টি করতে পারে । তাছাড়া কে সত্যকে চায় মশাই ? সত্যকে পরিবেশন
করলে প্রকাশক টাকা দেবে না—পাঠক বই ছোবে না । ব্যবসা মশাই,
ব্যবসা—সত্যকে শিকিয়ে তুলে রাখুন—

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ।

আরো লোক এসে যোগ দিল তাদের টেবিলে । ললিতকুমারের দুজন
সমসাময়িক সাহিত্যিক । নাগবর্ধন ও অবলাকান্ত ।

“খাওয়াতে হবে ভাই ললিতকুমার”—

“দেখা যাক্ ।”

“ওসব বুঝি না—ওহে পানীয়বাহক, নিয়ে এসো—”

“কাটগেট, কীর-তুবার, ঠাণ্ডা কাফি”—

“জী হজুর”—

গল্প জমে উঠল। অরিন্দম সকৌতুকে শুনতে লাগল সব্বার কথা। সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা। ললিতকুমার নীচুপাড়ার লোকের স্বথ হুখ নিয়ে লেখার চেষ্টা করে। নাগবর্ধন শুধু নীচুপাড়ার শ্রমিক এবং ক্যাক্টরীর মালিকদের নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী লেখে। অবলাকান্ত লেখে সাধারণ নরনারীর অবৈধ প্রেমের কাহিনী।

“তোমার হিমগিরির প্রান্তে’ বইটা চমৎকার হয়েছে ললিতকুমার—”

“আরে তোমার ‘শেকল ছেঁড়’ বইটা আরো ভালো হয়েছে—”

“না না—আমারটা অবলাকান্তের ‘অবৈধ প্রেমের’ মত হয়নি”—

“সত্যি কথা শুনবে? আমাদের প্রত্যেকটাই ভালো হয়েছে। নতুন পরিবেশ নিয়ে নতুন ভঙ্গীতে লেখা, নীচুপাড়ার নির্খ্যাতিতদের নিয়ে গরম গরম কথা আর অবৈধ প্রেমের কাহিনী—এই-ই তো চায় পাঠকেরা—”

“যা বলেছ—”

নতুন আর একজন লেখক এল এবার। নাম চিত্রসেন।

“এসো এসো—চিত্রসেন এসো—”

বেঁটে, মোটা ও কদাকার চিত্রসেন হাসল।

“তারপর, কি খবর চিত্রসেন?”

“আমার ‘শোন পতঙ্গ’ বইটা পড়েছ?”

“চমৎকার হয়েছে চিত্রসেন—”

“চমৎকার—”

“তুমি নীচুপাড়ার লোকের চমৎকারভাবে নীচু বলেছ—”

চিত্রসেন বিগলিত হয়ে বলল, “যখন যা দরকার ভাই—বুঝলে না, এখন একটু নীচুপাড়ার লোকদের গাল দেওয়া উচিত। তবে

ওরা একটু চটেছে, বুঝেছ? তাই এবার উচুপাড়ার লোকদের নীচু করে একটা বই লিখছি—নাম 'শোন ভুজ্জ'—”

“নাধু—সাধু”—

“চমৎকার”—

“ঠিক বলেছ ভাই—টাকা দিয়ে কথা। হাওয়া বদলালেই খুব বদলাবে”—

মুকুন্দ মাথাটা বাড়াল, চাপাগলায় প্রশ্ন করল, “কিন্তু সত্য?”

চারজন লেখক একসঙ্গে বলে উঠল, “সত্যকে শিকের তুলে রাখুন”—

“কিন্তু কেন?” মুকুন্দ উদ্ধতভাবে আবার বলল, “সত্যকে পরিহার করলে যে মানুষের সর্বনাশ হবে”—

ললিতকুমার হাসল, বলল, “ভাই মুকুন্দবাবু—মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যের সাধনাতেও তার সেই ধ্বংস-যাত্রা থামবে না—এ প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বতরাং আপশোব করে লাভ নেই। হাওয়া বুঝে দরকার মত মাঝে মাঝে ছ’একটা সত্য কথা বলবেন, আবার হাওয়া বুঝে উল্টো কথা বলবেন। বুঝলেন না, বাচতে হবে।”

অবলাকান্ত মুহূর্তে বন্ধুদের বলল, “আর সত্য অসত্যের দ্বন্দ্ব থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাও তাহলে আমাব দৃষ্টান্ত অম্মসরণ করে তোমরা। বুঝলে না—সমস্ত বিশ্বে নরনারীর ঐ আদিকাণ্ডটিই সব চেয়ে বড় কাণ্ড—সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত ও মধুর ব্যাপার।”

নাগবর্ধন উত্তেজিতভাবে সায় দিয়ে বলল, “যথার্থ বলেছ। যখন গোলমাল দেখি তখন তো তোমাকেই অম্মসরণ করি ভাই। ভাল চিত্রকরের ভাল ছবি যখন পয়সা টানে না তখন সে যেমন নারীদের নগ্নকাস্তি উদ্ঘাটন করে—আমরাও তেমনি করি। যেভাবেই হোক—টাকা চাই”—

ললিতকুমার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, “বখাৰ্খ। আমাদের বন্ধু মুকুন্দবাবু হয়ত প্রায় করবেন—“কিন্তু আদর্শ? আমি তার জবাবে বলব যে আদর্শ আমাদের ঠিকই আছে। আগে বাঁচি তবে তো আদর্শ?”

নাগবৰ্ধন, অবলাকান্ত ও চিত্রসেন সম্মুখে বলে উঠল, “বখাৰ্খ—বখাৰ্খ”

অরিন্দমের দম যেন আটকে আসতে চাইল। বাতাসে যেন বিষ মেশানো মনে হচ্ছে। সে চারদিকে তাকাল। অসংখ্য যুবক যুবতী আর নরনারী। হাসি, কথাবার্তা। সেই যুবক এখনো সগিনী যুবতীটির দিকে তাকিয়ে আছে। যুবতীটির শাড়ীর আঁচল বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। বক্ষবাসের অস্তুরাল থেকে তার দক্ষিণ স্তনটি যেন কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বহু পুরুষ সেদিকে তাদের লুক চোরা-চাহনি নিক্ষেপ করছে। উত্তেজিত বানরের মত। বাতাসে যেন বিষ মেশানো আছে।

“ওঠা বাক্”—ললিতকুমার উঠে দাঁড়াল।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ”—নাগবৰ্ধন এবং চিত্রসেন ও উঠে দাঁড়াল।

সবাই বেরোল। সিঁড়ির সাঁড়ি পার হয়ে কথা বলতে বলতে এগোল লেখকেরা। ইতিহাস, দর্শন এবং বৌদ্বৈশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে করতে। মুকুন্দ এবং অরিন্দম নিঃশব্দে চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

একটা গলির সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ললিতকুমার। অবলাকান্তের দিকে তাকিয়ে গলির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “যাবে নাকি হে?”

অবলাকান্ত এবং চিত্রসেন হাসল।

“যাব না মানে?”

“কি যে বল অবলাকান্ত”—

“ললিতকুমার যাবে?”

ললিতকুমার মাথা নাড়ল, “না ভাই—আমার বাড়ীতেই আছে”—

চিত্রসেন কুৎসিৎভাবে হাসল, “সেকিহে—কবে বাগালে?”

“বাগাইনি—আপনি এসে ধরা দিয়েছে”—

“সাদু—সাদু”—

অরিন্দম গলির দিকে তাকাল। গলিতে ভীড় আছে। বাড়ীর পর বাড়ীর নারি। মাঝে মাঝে বাষ্পীয় আলো। প্রতিঘরে হৃদয়ঙ্গম নারীমূর্তি। বাড়ী গুলোর ভেতর থেকে আসছে অল্লীল গান ও ঘুড়ুর শব্দ। একটা রুদ্রপঙ্খিল উত্তাপের তরঙ্গ যেন গলির ভেতর থেকে গলগল করে নেবিয়ে আসছে। বাতাসে বিষ।

“চল্লাম মুকুন্দবাবু”—অবলাকান্ত সহাস্তে বলল।

“ওই গলিতে—নরকে?”

“হ্যাঁ—তাতে কতি কি? জীবন সম্পর্কে আসল জ্ঞান তো ওখানেই পাওয়া যায়”—

ওরা তিনজনে চলে গেল সেই গলির ভেতর। সত্যি। জীবনের আসল জ্ঞান তো ওইখানেই। বহুভোগ্যা নারীর মাংসে, বহু পুরুষের ঘর্মসিক্ত শয্যাতে, মত্ত গাত্রের নিরঙ্ক অঙ্ককারে শুধু এই জ্ঞানই লাভ হয় যে জীবন একটা জৈবিক ব্যাপার।

“চলুন”—ললিতকুমার ডাক দিল।

মুকুন্দ মাড়া দিয়ে বলল, “চলুন”—

“অপদার্থ”—ললিতকুমার ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলল।

“কে?” মুকুন্দ প্রশ্ন করল।

“ঐ তিনজন। যত সব পচা লেখা লিখে পয়সা কামাচ্ছে ভাই”—

মুকুন্দ একটু হাসল, “আপনিও তো পয়সা কম কামান না?”

ললিতকুমার উত্তেজিত হয়ে উঠল, “কামাই কিন্তু ভালো লিখে। ওদের লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনাই হয় না”—

“কেন?”

“কি আছে ওদের? ভাষা, বর্ণনা, কল্পনাশক্তি, চরিত্রশক্তি, সামাজিক দৃষ্টি, বাস্তববোধ, রাজনৈতিক জ্ঞান—কোনটা আছে ওদের? অথচ কি বকম জোর গলায় আশ্বপ্ৰচার করল! অহঙ্কারে কেটে পড়ছে সবাই! শয়তানের দল!”

“কিন্তু ওরা তো আপনার বইয়ের খুব প্রশংসাই করল।”

“ছাই। আড়ালে গিয়ে ওরাই আবার আমার মুণ্ড চিবোবে, ছদ্মনামে পরস্পরকে গালিগালাজ দেবে”—

মুকুন্দ নিশ্চক্ষে হাসল শুধু। অরিন্দমের চোখাল শক্ত হয়ে উঠল।
রাত কত? ললিতার দুটো চোখে কেন রহস্যের অতল সমুদ্র।

“আমার বাড়ীতে যাবেন মুকুন্দবাবু?”

“আজ্ঞে আজ থাক ললিতাবাবু—অন্যদিন যাব?”

“আচ্ছা বেশ। আমি তাহলে যাই, মানে একটু কাজ আছে। বিজ্ঞানী কারখানায় গিয়ে বৈজ্ঞানিক পাখাটা নিয়ে যেতে হবে। বুঝলেন না, শ্রমিক আর দুঃখীদের নিয়ে লিখতে গেলে বড় পরিশ্রম হয়, তাই একটু হাওয়া দরকার হয়। তাছাড়া এই মোটা কাপড় জামাতে বড় কষ্ট হচ্ছে”—

“কষ্ট হলে পরেন কেন?”

“বাঃ নীচুপাড়ার লোকদের স্বথঃঃ নিয়ে লিখি আমি—বাইরে মিহি পোষাক পরলে লোকে অঙ্কা করবে কেন?”

“তা বটে”—

“তাছাড়া সরকারী দপ্তরের জন্য একটা গল্প দিতে হবে—বিষয়—
‘রাজভক্ত হও’”—

মুকুন্দ অবাক হয়ে গেল, “আপনি তাই লিখবেন?”

“কেন লিখব না?” ললিতকুমার আহত হল।

“রাজভক্ত হও মানে ক্রীতদাস হও—এই তো?”

“হ্যাঁ। লিখব না কেন? একশো টাকা দেবে যে মশাই—মাত্র

চারপাতার জন্ত। তাছাড়া সেটা আবার বেতার বন্ধবোগে সাঁজা
আজবনগরের জনসাধারণকে শোনানো হবে। কি সম্মান বলুন তো?
আচ্ছা চলি, নমস্কার। আসবেন, আসবেন কিন্তু মুকুন্দবাবু—আর
অরিন্দমবাবুকেও নিয়ে আসবেন—নমস্কার”—

ললিতকুমার ক্রতপদে চলে গেল সেখান থেকে।

সুকুন্ডা।

মুকুন্দ হাসল, বলল, “দেখলে অরিন্দম?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, দেখলাম, কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে
পারলাম না।”

“বুঝবে—বোঝাব সব।”

“আচ্ছা মুকুন্দ”—

“বল”—

“আজবনগরের শিল্পী সাহিত্যিকরা যদি এমনি হয়—তাহলে
জনসাধারণের অবস্থা কি হবে?”

“কি আবার হবে? যা হয়েছে। কিন্তু শোন অরিন্দম, ওরাই
সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্ধকার রাত যেমন সত্যি তেমনি তার অন্তরালবর্তী
অপেক্ষমান সূর্যও সত্যি।”

“তার মানে?”

“আমার সঙ্গে আর একজায়গায় চল”—

“আবার কোথায়?” অরিন্দমের গলায় ক্লান্তি ও বিস্ময়।

“বেথতে চাওনা?” মুকুন্দ হাসল, “তুমি কি মাহুকে মাহুস করতে
চাও না?”

মুহূর্তে অরিন্দমের শরীর মন ইচ্ছাতের মত কঠিন হয়ে উঠল,
ছুঁচোখে বিদ্যুৎ ঝলসাল, “সে বলল, চল”—

“চল”—

নীচুপাড়ার একটা গলি ধরে তারা এগিয়ে চলল। কালো,

শ্যাতনৈত, অজস্রের মত একেবেঁকে গেছে পশিত। ছ'পাশে নোন-
ধরা ইটের বাড়ী, টিনের চাল, দড়মার বেড়া। কুকুর, বেড়াল আর
দোয়া আবর্জনা। ইটর ও ছুঁচোর রাজ্য। উঁচুপাড়ার পান্ডে-ডরা
খোলা নদীয়া। অবশেষে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর দরজা।

কড়া নাড়ল মুকুন্দ।

দরজাটা খুলে গেল।

একটি নারীমূর্তি। পরনে ছেঁড়া সাড়ী। শীর্ণ তবু সুন্দরী। যেন
শঙ্করীর শীর্ণকলা চাঁদ।

“আসুন ভাই”—সম্মেহে আহ্বান করল সেই নারী।

মুকুন্দ প্রশ্ন করল, “তাপসদা কেমন আছেন বৌদি?”

সেই নারীর চোখ মুহূর্তে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল, তবু সে প্রশান্ত হেসে
বলল, “একই রকম—ভেতরে আসুন”—

“আপনার আর একটি ভাইকে এনেছি বৌদি—ওর নাম
অরিন্দম”—

“ভাই নাকি?” সেই নারী মধুমাখা হাসি হাসল, “আসুন ভাই,
আসুন”—

বাইরের ঘরে, এককোণে ছুঁটি ছেলেকে ঘুমিয়ে আছে। ককালসার।
তবু ফুলের মত। ঘর রিক্তশ্রী। অভাব। নিদারুণ অভাবের বোঝায়
দে'য়ালের চূর্ণ অনবরত খসে পড়ছে। যেন কুষ্ঠ ব্যাধিতে দেহের মাংস
খসে পড়ছে। ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া জামা কাপড়, বিবর্ণ আলো।

তারপরে দ্বিতীয় ঘর। ভাঙ্গা খাট, ভাঙ্গা বাজ, কয়েকটা বাসন,
কিছু বই আর কাগজপত্র। আর দেয়ালের গায়ে তিনটি ছবি।
দীর্ঘশ্রদ্ধা ঋষিমূর্তি একটি। দ্বিতীয়টি এক শীর্ণ বৃদ্ধের—তার মুখে
বিচিত্র এক মধুর হাসি। তৃতীয়টি এক প্রৌঢ়ের—তার চোখে বুদ্ধির
ওজ্বলা, শ্রাদ্ধ টাক, ছোট্ট দাড়ি ও গৌণ। অরিন্দম তাদের চিনতে
পারল না।

ঘরের মাঝখানে ভাঙা বাটের ওপরে, জীর্ণ, ছিন্ন, মন্দির পথের ওপরে একজন গৌরবর্ণ পুরুষ শুয়ে আছে। তার দু'চোখ মুক্ত, তিন চারদিনের কোঁরহীন মুখ। শীর্ণ, ক্লান্ত, বাদ্ধবত স্বর্ষের মত নিশ্চল।

সেই নারী একটি আসন পেতে মুহূর্তে বলল, “আপনারা বহন ভাই”—

অরিন্দম ও মুকুন্দ বসল। সেই নারী চলে গেল সেখান থেকে। ঘরের মধ্যে ব্যাধির জমাট ছায়া, মৃত্যুর শীতল নি অরিন্দম শিউরে উঠল। মৃত্যু কি?

মুকুন্দ ডাকল, “তাপসদা—তাপসদা”—

শয্যাশায়ী ব্যক্তি ধীরে ধীরে চোখ মেলল, তাকাল মুকুন্দের পথ। যেন বহুদূর থেকে চিনবার চেষ্টা করছে সে। তারপরে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি বলল, “মুকুন্দ—ভালো আছ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি কেমন আছেন?”

“আমি?” তাপসকুমার হাসল, “আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখ নেই আমার—আমার গ্রন্থও শেষ হয়ে এসেছে, জীবনের কাছে আমি পরাজিত হইনি”—

“গ্রন্থ শেষ হয়ে এসেছে?” মুকুন্দের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

“হ্যাঁ! আমার দুঃখ নেই।”

“গ্রন্থ কে ছাপবে?”

“জানিনা। হয়ত কেউই ছাপবে না। সত্যকে ওরা ভয় পায় কিন্তু কিছু যায় আসে না। আমি যে সত্যকে পরিত্যাগ করিনি—এই কথা শুনে রাখো মুকুন্দ। আমি মারা গেলে আমার গ্রন্থ নিয়ে নীচুপাড়ার ঘরে ঘরে পড়ে শুনিও সবাইকে—তাতেই আমার কাজ শেষ হবে। তাদের বুঝিও যে তাদের ভয় নেই, সত্যই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে”—

হঠাৎ অদৃশ্য একটা কাশির বেগ উঠল তাপসকুমারের, বজ্রপায় তার

ভৌম মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। পাশের ঘর থেকে ছুটে এল সেই নারী,
স্বামীর পাশে বসে ভালপাতার পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে
লাগল।

বাশি ধামল। একতাল রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে, সেই নারী
একটি মাটির সরিষা ধরল স্বামীর মুখের কাছে। তার চোখে আভিনয়
র ভালবাসা। সম্মুখে একটা গামছা দিয়ে স্বামীর মুখটা মুছে
দিল।

পক্ষ্মী

রক্তের রং কি লাল।

মুগ্ধসকুমার ধীরে ধীরে তাকাল, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে বলল, “মাকে
একটু কাবু করে ফেলে ভাই। মনটা ধারাপও হয়—আরো
বলতে ইচ্ছে করে। পৃথিবী ভারী সুন্দর—সত্য আরো সুন্দর”—

সেই নারী অহুযোগ করল, “কথা বলো না—একটু চুপ করে
থাকো”—

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, “আপনি জিরোন তাপসদল—অন্ত একদিন
দিনের বেলা আসব—আপনার গ্রন্থ পড়ব”—

তাপসকুমার বিশীর্ণ হেসে মাথা নাড়ল।

মুকুন্দ ও অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রক্তের রং কি লাল।

সেই নারী পেছন পেছন এল।

বাইরের ঘরে সেই ককালসার শিশু দু’টি ঘুমোচ্ছে। দু’টি শুকনো
ফুলের মত।

“আবার আসবেন ভাই”—

দারপ্রান্তে সেই শীর্ণা নারীর ছায়া। তার মুখের হাসিতে অমৃত।
শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও রিক্ততার ময়নাই সেই অমৃতের সৃষ্টি
অপরূপ।

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “আসব যদি—কালকেই আসব, কাল থেকে একজন কেউ তাপসদায় দেখাশোনা করার জন্তে থাকবে।”

সেই নারী হাসল। নিঃশব্দে। অরিন্দম অবাক হল। আশ্চর্য সেই হাসি। আঘাতে আঘাতে নির্ভয় হলেই বোধ হয় মানুষ ওভাবে হাসতে পারে।

সুদৃঢ়তা।

দুজনে ফিরে চলল।

আবার সেই অজগরের মত আঁকাবাঁকা গলির ম্যাতসৈতে পথ। দুর্গন্ধ। অসমান পথের ওপর দু’জনের জুতোর শব্দ।

আবার রাত।

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকাল, বলল, “বুঝতে পারলে এবার?”

অরিন্দমের ঠোটে মুহূ হাসি খেলে গেল, সে ধীরে ধীরে বলল, “পারলাম। সত্যের দিকেও লোক আছে। কিন্তু ক’জন?”

“মুকুন্দনা—ও মুকুন্দনা”—

প্রাণপণে চীৎকার করে কে যেন ডাকছে। মুকুন্দ অরিন্দমের কথার জবাব দিতে পারল না, পেছন ফিরে তাকাল। একজন যুবক তার দিকে দৌড়ে আসছে।

যুবকটি কাছে এসে হাসল, “কেমন আছেন মুকুন্দনা?”

“মন্দ না।”

যুবকটি হাঁপাচ্ছিল, বলল, “অনেকদূর থেকে আপনাকে ধরার জন্ত দৌড়েছি—চলুন না ঐ চায়ের দোকানে, এঁা?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “না ভাই শশাঙ্ক, থাক।”

যুবকটি গুনতে চাইল না সে কথা, “না না, আসতেই হবে। আমার দরকার আছে।”

সামনেই একটা চায়ের দোকান। সাত আটজন লোক বসে চা খাচ্ছিল, গল্প করছিল। সেখানে গিয়েই বসল তিনজনে।

মুকুন্দ প্রশ্ন করল, “কি ব্যাপার বলত ?”

শশাঙ্ক চাপা গলায় বলল, “আপনাদের ফ্যাক্টরীতে নাকি লোক নেবে ?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, নেবে কয়েকজন।”

শশাঙ্কের গলায় অসুരোধ ধ্বনিত হল, “তিনমাস ধরে বেকার হয়ে আছি মুকুন্দদা, একটু ব্যবস্থা করে দেবেন।”

“কি ব্যবস্থা ?”

“আপনাদের কর্মাধ্যক্ষকে একটু বলে দেবেন।”

“চেষ্টা করব।”

“কাল যাব ?”

“এসো”—

শশাঙ্ক খুসী হয়ে চোঁচিয়ে উঠল, “পানীয়বাহক, তিনপাত্র চা—”

চা থাইয়ে শশাঙ্ক চলে গেল। তার দরকারী কাজ আছে। নতুন সঙ্কেই তার আসনে এসে একটি লোক বসল।

লোকটি বলল, “মুকুন্দ, একটা কথা”—

মুকুন্দ তাকাল তার দিকে, “আরে, নরেশ্বর যে।”

নরেশ্বর মাথা নাড়ল, চাপাগলায় বলল, “তোমাদের ফ্যাক্টরীতে যে চাকরী খালি আছে তা আমি জানি। আমার জন্তে একটু চেষ্টা করতে হবে ভাই। শশাঙ্কের চেয়েও আমার দরকার বেশী”—

নতুন আর একটি লোক এসে দাঁড়াল সেখানে, কণ্ঠস্বর না করে বলল, “আমার অবস্থা আরো কাহিল মুকুন্দ। শশাঙ্ক, নরেশ্বরের চেয়েও”—

নরেশ্বর গর্জে উঠল, “কি বললে ? আমার চেয়েও ?”

“হ্যাঁ। আমি বা বাপকে খাওয়াই”—

“আমিও বৌ ছেলেকে খাওয়াই”—

“হা বাপ বৌএর চেয়েও বড়।”

“বটে! তুমি তো এখনো চাকরী করছ বইয়ের দোকানে”—

“তুমিও তো চাকরী করছ বইয়ের কলে”—

“তুমি মিথ্যাবাদী”—

“তুই মিথ্যাবাদী”—

“চোপরাও শুয়ার”—

“কি বললি! শুয়ার! তুই শুয়ারকা বাচ্চা”—

“শালা কায়েতের বেটা—চুপ থাক্”—

“বটে! বামুন বলে যুব চোখ রাঙাচ্ছিস্! ওবে আমার বামুন
রে—শালার চণ্ডালের চেয়েও তো অধম তোরা”—

পেছন থেকে একজন অস্থরের মত লোক লাফিয়ে এগিয়ে এল, কাছে,
“কি বললি রে? চাঁড়ালদের শালা বলছিস্! চাঁড়ালেরা বামুন
কায়েতের চেয়েও মানুষ ভালো”—

“আহা—কেন ঝগড়াঝাটি ভাই?” পেছন থেকে একজন বেঁটে মত
লোক উঠে দাঁড়াল, মিষ্টি গলায় ঝগড়া থামাতে চাইল।

“তুমি ফোপড় দালালি নাই বা করলে ভাই”—

“কি বললি রে বাটা!।”

“খবরদার—বাটা বাটা করিস্ না শালার ভুজিয়ার কলা—এ্যাংসা
ঝাপড় মারব কি”—

“যা যা শালার চাঁড়াল”—

“মুখ সামলে কথা বলিস রে বাড়ির বেটা”—

“মুকুন্দ, আমার জন্মে চেষ্টা করবে ভাই”—

“না, আমার জন্মে—আমার দরকার বেশী”—

“তুই মর। আমার দরকার বেশী”—

“তবেই শালা”—

হঠাৎ কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। নরেন্দ্র লাফিয়ে পড়ল তার

প্রতিবন্ধীর ওপর। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেছনের অস্বাভাবিক
লোকটি—আবার তার ওপর লাফিয়ে পড়ল সেই বেঁটে লোকটি। কিল
চড়, ঘুবি আর গালিগালাজ একটা বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করল।

অরিন্দম তাকাল মুকুন্দের দিকে।

মুকুন্দ হৃত হেসে বলল, “চুপচাপ বসে থাকো। থামাতে গেলো
মিছিমিছি কিল খাবে ওদের।”

দোকানের মালিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর
হাঁ হাঁ করে ছুটে এল, “ও মশাইবা, শুনছেন! আরে ও মশাই!”—

অস্বাভাবিক যারা বসে ছিল, তারা এগিয়ে এল কাছে, ঝগড়া থামিয়ে
সরিয়ে দিতে চাইল যুগমান বীরদের। কল উলটো হল। শান্তিকামীরাই
হুঁতিন ঘা খেয়ে ক্ষেপে মারামারিতে লেগে গেল।

“তবেই শালা”—

“মেরেই ফেলব”—

“কেটে ফেলব”—

দোকানের মালিক লাকাতে লাগল বিবর্ণমুখে, “আরে থামুন, থামুন!
শুনছেন—আমর, গুথেগোর ব্যাটারা যে আমার দোকান পাট ভেঙ্গে
ফেললি!”

চেয়ার উলটোল, টেবিল ভাঙ্গল, ভাঙ্গল কাপ প্লেট, কাঁচের গ্লাস
ছিটকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। বহু উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল
দোকান ঘরে।

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনার তার মারা দুখ লাল হয়ে উঠেছে।

“বাইরে চল অরিন্দম।”

বাইরে গেল দুজনে, হাঁটতে লাগল।

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত চেপে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “জানোয়ার—
সবাই জানোয়ার হয়ে গেছে”—

“কি হল মুকুন্দ?” অরিন্দম ঠিক ধরতে পারল না।

মুকুন্দ তার নিকে তাকাল, বলল, “ওরা যখন মারামারি করে তখন তোমার কি মনে হচ্ছিল বল ত ?”

অরিন্দমের মুখে মুহূ হাসি খেলে গেল, সে বলল, “মনে হল যেন একদল কুকুর এক টুকরো মাংস নিয়ে কাঁড়াকাড়ি করছে।”

“ঠিক বলেছ। তখন ওদের মুখের চেহারা দেখেছিলে ? কি গভীর ঘৃণা ওদের চোখে মুখে ?”

“দেখেছি।”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “মুষ্টিমেয় সবলের বিধানের এই অনিবার্য পরিণতি। সর্বনাশা পরিণতি। সবচেয়ে আগে তোমাকে সহুগ্রন্থকে বর্জন করতে হবে। শোন অরিন্দম, সভ্যতারের ক্ষুধার্তেরা হয় দুর্ভিক্ষের আশ্রানে মরে না তো বিপ্লবের আগুনে শোধন করে সভ্যতাকে। কিন্তু আজ বাদে দেখলে তারা অর্ধ-ক্ষুধার্ত জানোয়ারের দল। কেউ সাপ, কেউ বাঘ, কেউ বাদর, কেউ শেয়াল। এরা মরতে ও চায় না, মারতেও চায় না। এরা চায় শুধু জান্তব জীবনটাকে চালিয়ে যেতে। খেতে, ধুমোতে আর সন্দম করতে—এবং তারই জন্তু এরা যে কোনও একটা কাজ করে। অধিকাংশ গিল্লী সাহিত্যিকদের চেহারা দেখলে তো ? আদর্শের নাম করে এরা গনিকাবৃত্তি করে সবাইকে খুশী রাখে, অদ্যম্যের জালাতে এরা পরস্পরকে ঘৃণা করে, দ্রোণা করে, পরস্পরের নিন্দে করে, কটাকাটি করে, পরস্পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের বুদ্ধির বড়াই করে। আদর্শের কথা বলছ ? পচা ইঁদুরের মত তাকে আবর্জনা-পাত্রে ছুঁড়েফেলে দাও”—

“কিন্তু কেন ? কিসের জন্তু এমন হয় ?” অরিন্দম রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

চলতে চলতেই মুকুন্দ বলল, “কেন ? আজ মণিশঙ্করের ব্যাখ্যা কি বুঝতে পারলে না ? কেন আবার ? সমাজ-ব্যবস্থার জন্তু।”

“মানুষ কি বদলাতে পারে না ?”

“সবাই” নয় না। সাহিত্যিকদের তো দেখলে, সবাই একই রকম।
 তাদের কথা বলবে? তারাও একই ধাঁচের—পরে টের
 পাবে। ব্যাশার কি জানো? যেমন আবহাওয়ায় বাস করবে,
 সেও ঠিক তেমনি হবে।”

অবিন্দম বাধা দিতে গেল, মুকুন্দ হাত নেড়ে তাকে থামাল, মহাশয়
 বলল, “গোড়া থেকেই বলছি। পৃথিবীর সৃষ্টি হল। বুদ্ধিমান পশু
 মানুষ জন্মাল এবং জন্মাবার সঙ্গেই সে একটা শব্দ উচ্চারণ—‘আমি’।
 এক বস্তু অপর বস্তুর মত হয় না—প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যগুণে কয়েকজন
 আবিষ্কার করল যে তারা বুদ্ধি বা দৈহিক বলে অনেকের চেয়ে বড়।
 সেই কয়েকজন তখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে নিরাপদ করার জন্য নীতি, ধর্ম
 ও আইনকাহ্ন তৈরী শুরু করল। তারা প্রচলন করল টাকার।
 টাকা ছাড়া কিছুই হবে না। আর টাকা পেতে হলে খাটতে হবে।
 সবাই খাটতে শুরু করল। কিন্তু খাটাতে লাগল জনকয়েক। এবং যারা
 খাটতে লাগল তারা সবাই একই দাম পেল না, ফলে অসাম্যের সৃষ্টি হল।
 কেউ এক, কেউ দুই, কেউ দশ। একজন চাকার ওপরে, একশো জন
 চাকার নীচে, একজন ধনী, হাজার জন গরীব। আদিম যুগের সেই
 ‘আমি’টা এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু সজা এই যে যারা তলায় আছে
 তাদেরো ‘আমি’ আছে। তাদের ‘আমি’ তাদের সঙ্গে অপরের পার্থক্য
 দেখিয়ে দিতে লাগল। একজন একটা জিনিষ ভোগ করছে, আর
 একজন তা পাচ্ছে না। ফলে জ্বালো লোভ, লালসা, ঘৃণা, হিংসা।
 তারপর—” মুকুন্দ অবিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “আরো
 জানতে চাও?”

অভিভূতের মত অবিন্দম বলল, “চাই।”

“বেশ—”

অবিন্দমের সমস্ত চেতনা কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। আগ্রহে,
 জানলাভের অদম্য কৌতুহলে। মুকুন্দ যেন আজ কেনে গেছে। এদিকে

রাড হচ্ছে। কটা? তা হোক। কিন্তু ললিতা? আর ছোটো
কালিন্দী-কালো চোখ। কি আশ্চর্য! একটি নারীর মুখ কেন বারংবার
মনে পড়ে?

“বাবাগো—একটা পয়সা ছাও না বাবা—”

ভিথিরীর আহুল প্রার্থনা। অরিন্দম তাকাল সেদিকে। কৃষ্ণ-
রোগাক্রান্ত, বীভৎস দেখতে সেই ভিথিরী একটা পয়সা ভিক্ষে চাইছে।

একজন লোক দাঁড়াল, পকেট হাংড়ে একটা পয়সা বের করে
ভিথিরীর প্রসারিত হাতের ওপর আলগোছে কেলো দিল।

মুকুন্দ অরিন্দমকে ঠেলা দিল, “দেখ, পাশাপাশি অসাম্যের নিদর্শন।
একজন অসহায়, ব্যাধিতে কুৎসিত, ভিথিরী—অন্যজন মোটামুটি ভদ্রভাবে
বেঁচে আছে, যখন তখন অহুকম্পাভরে দু’একপয়সা দান করে আত্মতৃপ্তি
অহুভব করার সুযোগ পাচ্ছে।” এগিয়ে গেল সে। দাতা লোকটি
চলতে আরম্ভ করেছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, ডাকল, “ও দাদা,
শুনছেন—”

“এ্যা?” লোকটি দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মুকুন্দ বিনীতভাবে জিজ্ঞেস
করল, “দাদার কাছে কি দেশলাই আছে?”

“দেশলাই? হ্যাঁ আছে। এই নিম্—”

লোকটি দেশলাইটা এগিয়ে দিল।

বিড়ি ধরাতে টরাতে মুকুন্দ প্রশ্ন করল “দাদা বুঝি চাকরী করেন
কোথাও?”

“না তো—” লোকটি মাথা নাড়ল। “আমার কাপড়ের দোকান
আছে।”

“ও, কাপড়ের দোকান! খুব ভালো ব্যবসা। দাদা তো তাহলে
ঠাকুরের ইচ্ছে—”

লোকটি মুখ বিকৃত করল, “আমার অবস্থাটা খুব ভালো ভাবছেন

কুঁবি? মোটেই না। ছোট্ট একটা দোকান ঢালাই মশাই, এক পাল
ছেলেমেয়ে—”

“ধীরে ধীরে আরো ভালো অবস্থা হবে—”

লোকটি হাসল, “হয়ত—কে জানে।”

“কার মত বড় হতে চাইছেন আপনি বলুন তো? কিছু মনে
করবেন না—শ্রেফ কৌতুহল।”

লোকটি আবার হাসল, “না না, কিছু মনে করিনি। কার মত
আবার? আমাদের ব্যবসা করে ত্রিদিবাব্দ কত বড়লোক হয়েছেন বলুন
দেখি—বড় হলে তাঁরই মত হবে—”

“আচ্ছা, নমস্কার—”

লোকটি চলে গেল।

নুকুল বড় রাস্তায় পা দিয়ে তাকল, “এইদিকে এসো অরিন্দম—”

ছ’মিনিটের পথ।

উঁচুপাড়ার রাস্তা তখনো সবগরম। গাড়ী ঘোড়া, আলো আর
মাছষের ভীড়। আকাশে কোড়ংলী তারার মিছিল।

রাস্তার পাশে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী। বাইরে সুদৃশ্য বাস্পীয়
যান দাঁড়ানো, দ্বাররক্ষী পাগারা দচ্ছে।

দ্বাররক্ষী বাধা দিল, “কাকে চাই?”

নুকুল দ্রুতকণ্ঠে বলল, “দোকান থেকে আসছি আমরাস—জরুরী
দরকার—”

“বান—”

ভেতরে ঢুকল দু’জনে। সোজা বাইরের কামরায় গিয়ে হাজির
হল তারা।

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। চক্‌চক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করছে ঘরদোর।
মস্তণ মেঝের মাঝখানে কার্পেট, দামী চেয়ার টেবিল, মূল্যবান কাপড়ের
পর্দা, দেয়ালে টাঙানো সুন্দর সুন্দর ছবি। আর মাঝখানে একজন

অর্ধ-শ্রোত হ্রবেশ লোক বসে বসে ধূমপান করছেন ও কাগজপত্র দেখছেন। ত্রিদিবাবু।

ত্রিদিবাবু তাকালেন, “কে! আরে, মুকুন্দবাবু যে! কি ব্যাপার? হঠাৎ এত রাত্তিরে যে?”

মুকুন্দ হাসল, “আজ্ঞে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ত্রিদিবাবু তাই একবার শ্রদ্ধা জানাতে এলাম—”

ত্রিদিবাবুর তেল চুকচুকে গোলগাল মুখে হাসির তরঙ্গ খেলে গেল। তিনি বললেন, “তা বেশ করেছেন বন্ধু—”

“কেমন আছেন?”

“খুব ভালো না।”

“কেন?”

“আর বলেন কেন? একসের ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করে অথচ আধসেরের বেশী খেতে পারছি না—পেটটা শক্ততা করছে।”

মুখে চোখে দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে তুলে মুকুন্দ বলল, “সত্যি, ভারী দুঃখের কথা—”

ত্রিদিবাবু সমবেদনা পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, “দুঃখের ব্যাপার নয়?” গলার স্রবটা হঠাৎ নীচু ও ভারী করে ত্রিদিবাবু আবার বললেন, “সত্যি, মনটা বড় খারাপ যাচ্ছে আজকাল—”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “সত্যি—”

ত্রিদিবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ফোঁস করে।

“ব্যবসাপত্র কি রকম চলছে ত্রিদিবাবু?” মুকুন্দ আলগোছে প্রশ্নটা করল।

ত্রিদিবাবু হাঁই তুললেন, “খুব ভালো না—”

মুকুন্দ হাসল, “কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না—”

ত্রিদিবাবু তাকালেন, দু’চোখ বড় করে প্রশ্ন করলেন, “মনে হচ্ছে না! তার মানে?”

“মানে দেখেছেন তো ভালই মনে হচ্ছে।”

ত্রিদিববাবু ঠোট উলটে বললেন, “হঁ—আপনারা এতেই ভালো বলছেন! কি আর ব্যবসা করলাম মশাই। শুধু মস্ত বড় একটা দোকান করেছি। তাতে কি অভাব মেটে? পুণ্ডরীকবাবুর মত চারপাচট কাপড়ের কলের মালিক হতে পারলেট না বৃদ্ধি!”—

“আপনি পুণ্ডরীকবাবু হতে চান?”

“চাই-ই তো!”—

মুকুন্দ হাসল, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের খাদ মিশিয়ে বলল, “আজ্ঞে তা আপনি হতে পারবেন—আজ তাহলে উঠি—”

“উঠছেন?”

“আজ্ঞে হ্যা, অল্প একদিন আসব। আমাদের লগা করে মনে রাখবেন—”

ত্রিদিববাবু বিগলিত হয়ে গেলেন, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—মাঝে মাঝে আসবেন, মনে রাখবার চেষ্টা করব। ঠে হে—আহুন—”

মুকুন্দ ও অরিন্দম বাইরে বেরোল।

“এবার?” অরিন্দম প্রশ্ন করল।

মুকুন্দ হাসল, “এবার পুণ্ডরীকবাবুর কাছে। গোলকধাঁধা বলে মনে হচ্ছে, তাই না? পাবে, ধাঁধার উত্তর পাবে।”

এবার চার পাচ মিনিটের পথ।

অবশেষে একটা বড় বাগানওয়ালো মস্ত বড় একটা অট্টালিকা। পাঁচতলা। বড় বড় স্তম্ভ, খেতপাথরের মেঝে, মেহগিনীর খাট পালক, চেয়ার টেবিল, রূপোর বাসন, ঝলমল জরি এখানে পোষাক-পরা মানুষ, উদ্দি পরিহিত চাকরের দল, আগ্নেয়াস্ত্র-বাহী ঘায় বক্ষীরা।

অরিন্দম বলল, “এখানে হয়ত একেবারেই আটকে দেবে”—

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, “দেখনা কি করি—”

একজন দ্বাররক্ষীর কাছে সে এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করল, “হুজুর
আছেন?”

দ্বাররক্ষী গোঁফে চাড়া দিয়ে ভুরু কঁচকে প্রশ্ন করল “কি চাই?”

বিনীতভাবে মুকুন্দ বলল, “হুজুরের দর্শন চাই—তাকে আমরা ভক্তি
জানাতে এসেছি। হুজুরকে গিয়ে খবর দাও যে মুকুন্দ তাঁর পায়ে ধুলো
নিতে এসেছে—তা নইলে তার ক্ষতি হবে—”

“না না, দেখা হবে না।”

“হ্যাঁ করে খবর দাও রক্ষীঠাকুর—আমি তোমার কেনা গোলাম
হয়ে থাকব—”

“হাঁ? গোলাম হয়ে থাকবে?”

“হ্যাঁ বাবা।”

দ্বাররক্ষীর গোঁফের আড়ালে বিগলিত হাসির আভা দেখা গেল,
সে বলল, “তবে দাঁড়াও, দেখি হুজুরের কি মজ্জি হয়।”

এক মিনিট কাউল।

দু’মিনিট। তিন মিনিট।

দ্বার-রক্ষী ফিরে এল, বলল, “বান মশাইরা সোজা বাইরের ঘরে
বান—”

যেতে যেতে মুকুন্দ বলল, “আমি যা করি, তুমিও তাই করো বুঝলে?”

অবিন্দয় মাথা নাড়ল, “বুঝেছি।”

মস্ত বড় বাগানের মাথখান দিয়ে পথ। চারদিকে নানারংগের
অজস্র পুষ্পসমারোহ। বাতাসে তাদের মদির গন্ধ। বাগানের
শেষে প্রশস্ত সিঁড়ির সারি। তারপর ডানদিকের একটা মস্তবড় কক্ষ।
সেখানে বৈদ্যুতিক পাখা চক্রাকারে ঘূর্ণমান। দামী কার্পেটে মোড়া
মেঝে। দামী পোষাক পরিহিত একজন বছর চল্লিশের লোক। তিনিই
পুণ্ডরীকবাবু। দীর্ঘ গৌরবর্ণ, দোহারা গড়ন। মাথার কোঁকড়ানো
চুল সবুজে পাট করা, চোখে সোনার চশমা, শুকপাখীর নাকের মত ঝাঁক।

নাক আর একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখে যেন ছোরার ধার। বসে বসে তিনি
যেন কি লিখছেন।

মুকুন্দ গিয়ে পুণ্ডরীকের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল, তার
পায়ের ধুলো নেবার অছিলা করে মাথায় হাত রাখল। অরিনমণ
ভাই করল।

পুণ্ডরীক তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকালেন, তার ছোটো
ঠোঁঠের কোণে একটু হাসি খেল গেল। তিনি বললেন, “ধাক্ ধাক্
অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ মুকুন্দ”—

মুকুন্দ যুক্তকরে বলল, “আজ্ঞে না হজুর। চোর মাথ্রেই অতিভক্ত
হয় বটে কিন্তু আমরা তো চোর নই, আমরা গরীব”—

“গরীব! গরীবেরাই তো চোর হয়”—

“আজ্ঞে হয়—সিঁদেল চোর। কিন্তু তারা পুঁকুর চুরি করতে পারে
না।”

“তা যা বলেছ”—পুণ্ডরীক মৃদু হাসলেন, “তোমার বুদ্ধি আছে,
কোনদিন হয়ত তোমাকে সরকারের অতিথিশালায় যেতে হবে।”

“আজ্ঞে সেই ভয়ে তো বোকা বনেই থাকি—তবু মাঝে মাঝে”—

পুণ্ডরীক হাসলেন, “তারপর? কি পবন?”

“অপনার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।”

“হু”—

“কেমন আছেন হজুর?”

“ভাল না।”

“কেন? কি হল?”

পুণ্ডরীক ঝকুটি কুটিল মুখে বললেন, “চতুরলালের নাম শুনেছ তো?
সেই চতুরলালের সঙ্গে আজ আমার কগড়া হয়েছে। বেটার কি দেমাক!”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ”—দাঁতে দাঁত চেপে পুণ্ডরীক বললেন, “মনটা ধারাপ।”

ছ' মাসের মধ্যে চতুরলালের চেয়েও যদি বড় না হয় তো আমার নাম
বদলে ফেলব"—

স্বকতা।

মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, "তাহলে আমি হজুর।"

পুণ্ডরীক অন্তমনস্কের মত বললেন, "উ? আচ্ছা এসো।"

মুকুন্দ ও অরিন্দম বেরিয়ে এল।

বাগানের ফুলের চারাগুলো হাওয়ায় ঢুলছে। পুণ্ডরীকের পাঁচতলা
বাড়ীর প্রতিটি কক্ষে উজ্জল আলোর সারি। কোন এক কামরায় যেন
বাজনা বাজছে। কে যেন গাইছে। কে যেন হাসছে। আর
আনাচে কানাচে বাইরে ভেতরে ছায়ায় মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে
পুণ্ডরীকের দাসদাসীরা।

রাত কটা? আকাশে কটা তারা? মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি?
অরিন্দম চলতে চলতে হোঁচট খেল।

মুকুন্দ বলল, "আজকের মত আমার গুরুগিরি শেষ হল—আর না,
তোমায় এবার ছাড়ব।"

অরিন্দম হাসল, "কিন্তু ব্যাখ্যা?"

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, "করছি। কোথায় যেন থেমেছিলাম? ই্যা—
বর্তমান নমাজ-ব্যবস্থা কি করে জন্মাল। আগে যা বলেছি তা নিশ্চয়ই
বৃদ্ধিতে পেরেছ। পৃথিবীর সর্বত্র দুটো শ্রেণীর সৃষ্টি হল ক্রমে—ধনী ও
দরিদ্র। আজবনগরে আরো মন্ত্রার ব্যাপার হল। বৃত্তি অগ্রযাত্রী
মানুষকে এক সময়ে কয়েকটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। বুদ্ধির কাজ
যে করত সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে চিহ্নিত করার জন্ত অমুক দেবতা এই
বলেছেন, সেই বলেছেন বলে সৃষ্টি করল উচ্চনীচ বর্ণভেদ। দিন কাটতে
লাগল। মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটতে লাগল, তার বুদ্ধি বাড়তে থাকল,
বাড়তে লাগল তার মনের জটিলতা। সেই জটিলতা ক্রমেই সমাজব্যব-
স্থার হ্রাস নিয়ে জটিলতায় রূপান্তরিত হল। যতদিন এই অসাম্য দ্ব

না হবে, যেতদিন রাম ও ক্রামের জৈবিক চাহিদা সমভাবে তৃপ্ত না হবে ততদিন তার মানসিক পরিবর্তন হবে না, তার লোভ, লালসা, ঘৃণা ও হিংসা কমবে না। ততদিন রাস্তার ভিখারী চাইবে তোমার মত হতে, তুমি চাইবে ত্রিদিব হতে, ত্রিদিব চাইবে পুণ্ডরীক হতে, পুণ্ডরীক চাইবে চতুরলাল হতে, চতুরলাল চাইবে—”

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলল, “আমি জানি—”

মুকুন্দ তার দিকে তাকাল, “কি?”

“চতুরলাল চার বিচিত্রপুর তথা আদ্রবনগরের কর্তা হতে—”

মুকুন্দ উত্তেজিতভাবে বলল, “ঠিক। তারগরে বিচিত্রপুরের কর্তা চাইবে পৃথিবীকে। অথচ বিচিত্রপুরই তো পৃথিবী নয়। রূপনগর, উত্তটনগর, বিরাটনগর, নিবেধনগর—সব জায়গাতেই এমন শত শত ত্রিদিব, পুণ্ডরীক আর চতুরলাল আছে। সবাই চাইছে পৃথিবীকে একা ভোগ করতে। ফলে কি হয়? নতুন নতুন মারণাস্ত্রের উদ্ভব হয়, আসে বুদ্ধ, মড়ক, হুভিক, দাঙ্গা, স্বার্থপরতা, নীচতা, শঠতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা। তখন জীবন আর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পদের মত তার সমস্ত পাশড়িগুলো মেলেনা, তখন মানুষ আর সবাইকে ভালবেসে দেবতা হতে পারে না। কিন্তু আসল কথাটাই তোমাকে বলিনি—”

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল, “আরো কথা আছে?”

“ধাকবে না? পৃথিবীটা কি দু’দিনের?”

“কি কথা বল।”

“মানুষ কেন এমন করে। মানুষের মাঝে মানুষ বারো থাকে তারা বলে, ‘চুরী করো না,’ ‘হিংসা করো না,’ ‘লোভ পাপ’—তবু কেন মানুষ ঠিক উলটো কাজ করে, একটুকরো রুটির জন্য কুকুরের মত ঝগড়া করে?”

“কেন?”

মুকুন্দ ধীরে ধীরে বলল, “কারণ প্রতিটি মানুষ একা—কারণ প্রতিটি মানুষ জানে যে কোন নিরাপত্তা নেই তার জীবনের। যে সমাজ-ব্যবস্থায়

মাহুষ কখনো নিরাপদ হতে পারে না, সেখানে কেউ কারো দিকে তাকায় না। ফলে প্রত্যেকে একা—ভয়ঙ্কর একা। সব সময়েই সে কেন কুমারসিংহ পাহাড়ের চূড়ায় ঝাড়িয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে সে। অভাব, ব্যাধি, কত বিপদ আছে জীবনে। কে তার জন্ত ভাবছে? তাই আজকের সমস্তা মিটলে কালকের জন্ত ভয় হয়, কালকের ব্যবস্থা থাকলেও পরশুর জন্ত ভয় থাকে। ফলে প্রত্যেকে চেষ্টা করে নির্ভয় হবার জন্ত টাকা পেতে। যে ভাবে হোক। টাকা হলে সে শক্তি অর্জন করে, শক্তির স্বাদ পেয়ে সে মত্ত হয়, মত্ততায় ধ্বংস আসবেই—”

শুনতে শুনতে অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল; বাধা দিয়ে বলল, “সমাজ ব্যবস্থা না বদলানো পর্যন্ত যদি এমনি চলে তাহলে তা বদলানো যাবে কি করে?”

মুকুন্দ যেন প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল, “উপায় একটিনাহি। যারা নিষ্পেষিত হয়েও জানোয়ার হয়নি তাদের সম্মিলিত করতে হবে—যারা জানোয়ার তাদের আত্মাকে জাগাতে হবে, যারা জাগবে না তাদের উচ্ছিন্ন করতে হবে—এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে।”

অরিন্দম একটু হতাশার স্বরে বলল, “কিন্তু তেমন মাহুষ ক’জন? প্রায় সবাই তো একই রকম—”

মুকুন্দ হানস, “প্রায় সবাই বটে কিন্তু সবাই নয়। অসত্যে পৃথিবী ছেয়ে গেছে কিন্তু সত্যের পতাকা’র নীচেও মাহুষ আছে। আজ কি তুমি তা দেখলে না? মণিশঙ্কর, তাপসকুমার, সভার হাজার লোক, তুমি, আমি—এমনি আরো অনেকে। সত্যের, গ্রামের জয় হবেই। আমাদের জয় হবেই হবে—কারণ আমরা তা চাই।”

“চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়!”

“যায়। ইচ্ছে করলেই সব কিছু পাওয়া যায়, কারণ ইচ্ছে থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি।”

ইচ্ছে থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। কোথায় যেন শুনেছে সে এই কথা।

অরিন্দম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “তা তো বুঝলাম কিন্তু এতে তো সময় লাগবে—দীর্ঘ কাল—”

মুকুন্দ অসহিষ্ণু হয়ে হাত নাড়ল, বাধা দিয়ে বলল, “কি যায় আসে ? ইচ্ছা এবং ইচ্ছানুযায়ী কৰ্ম করে যাওয়া—এই আমার তোমার কতব্য। তাতেই ফল হবে। এর বেশী ভেবে লাভ নেই। ক্ষুদ্র বীজ থেকে বিশাল মহীকহ জন্মায়—কিন্তু সে কি একদিনে হয় ?” হঠাৎ থামল মুকুন্দ, অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, “কিন্তু আর না—তোমার সঙ্গে বন্ধু করে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে—আমি চললাম—”

অরিন্দম হাসবার চেষ্টা করল, “কোথায় ?”

“গোল্লায়—সস্তা মদ গিলতে।”

“তা যাও তুমি গোল্লায় কিন্তু বাড়ীতে যে ভাববে ?”

“আমার জন্মে ? আমার অত্যাচারে সবাই অভ্যস্ত আছে। চললাম—”

ক্রতপদে হঠাৎ বাঁ দিকের একটা গলিতে মুকুন্দ মিলিয়ে গেল।

অরিন্দম তার দিকে তাকিয়ে মুহূ হাসল। মুকুন্দ চমৎকার লোক। সাত্যকাবের মানুষ। সৈনিক। রাত কাটা ? অনেক। চলা যাক। অরিন্দম পা বাড়াল।

গলি। আঁধার-দাঁকা। শিরা উপশিরার মত জটিল, সংযুক্ত। জীবনের মত। মনের মত। সামনে একটা গ্যাস-লাইট। আলোক-তন্তের দীর্ঘ ছায়া। বিবর্ণ আলো। জরাগ্রস্ত ঝাঁকুণ্ডলো। মানুষের মন এক বিচিত্র যন্ত্র। বাতাসে কাঁপে, উত্তাপে কাঁপে, শব্দে কাঁপে, দৃশ্বে কাঁপে। কাঁপে আর অদৃশ্য অন্ধরে সমস্ত অল্পভূতির ইতিহাস লিখে চলে। কিছুই অগ্রাহ্য করে না। অরিন্দমের মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে। ছোট্ট একটা দানব যেন গর্জাচ্ছে তার ভেতরে। ভাদ্রো

—ভাঙ্গে—ভাঙ্গে। একটা লৌহদানবের মত। ফ্যাক্টরী। বয়লার, আঙন, গলিত ইস্পাত, বড় বড় লোহার চাকা। ভাঙ্গে। আমাকে ভেঙ্গে, জুড়িয়ে, গলিয়ে নাও। হে আমার সাংগিক আত্মা—আমাকে তোমার স্বপ্নের মত রূপ দাও। এখনো যেন হাতুড়ী'র শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইন্দ্র। আমরা যন্ত্রের ক্রীতদাস। বাতাসে কি চারুকের শব্দ? চতুরলাল। মুনাকা বাড়াবে সে। খাটো, মর, মর জানোয়ারেরা, চতুরলালের খুখুকে হাত পেতে গ্রহণ করো। মুনাকা চাই। চাই নারীদেহ। নারীদেহ দেখতে কেমন? কি আছে নারীদেহে? ওঠ, স্তন, যোনিদেশ, মাংসল উরুযুগল? সব মিলিয়ে সে কী? শুধুই প্রয়োজন? আর মাতৃহ? রাতটা উচুনীচু। অসমান। অসাম্য। চতুরলালের মদ চাই। মদ খেলে পশুর চক্ষু লজ্জা উড়ে যায়। মদ আর মেয়েমাহুষ। মুনাকা চাই। জানোয়ারেরা রক্তবমি করে মরলেই বা কি? রক্তের রং কী লাল! আর সেই শীর্ণ, রোগা লোকটা? জলন্ত অঙ্গারের মত। সত্য মৃত্যু আনল। সত্য কি ভয়ঙ্কর? সত্য কাকে বলে?

“হাঃ হাঃ হাঃ—”

অরিন্দম তাকাল। একটা বৃড়ো মাতাল। নর্দমার পাশে, অন্ধকারে, একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাসছে তাঁর দুচোখ মূর্তিত, কণ্ঠস্বর জড়িত।

“অতৃপ্তিই জীবনের শেষ কথা—একদিন বাঁচলে দু'দিন বাঁচতে চাই—
চিরকাল বাঁচতে চাই—”

ইহুরেরা যেন কোথায় কিচ্‌কিচ্‌ করছে। কোথায়, কোন্‌ নিভৃত
স্থলভে।

“কিছুই মনে থাকে না। আমার চারদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্য-
বনিকা। অতীতের কথা আজ মনে থাকে না, আগামীকালের কথা
ভেবে পাই না। বিশ্ব্তির বনিকা। আমি এক রাজার মত স্বাধীন

হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম—কিন্তু আজ? হাঃ হাঃ
হাঃ—”

স্বরার বৃন্দ। প্রলাপ। কিন্তু শুধুই কি প্রলাপ? এগিয়ে
চল। আর কত দূরে? ললিতা কি এখন ঘুমিয়েছে?

নিজের পায়ের শব্দ। ছ'পাশের দে'য়ালে তা ঠোঁড়ের খেয়ে ফিরে
আসে, পেছু নেয়। আর কী অন্ধকার! গ্যাসের আলোটা অনেক
দূরে। অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারের মাঝেই আলো আছে। নির্ভীক
মানুষ আছে। মনিশ্বর, তাপসকুমার, হাজার হাজার লোক। বীজ
আছে। পৃথিবী হৃন্দর, উর্বর। কোন বীজকে প্রত্যাখ্যান করে না
পৃথিবী। সেই বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে বৃক্ষ,
বৃক্ষ থেকে মহীকহ হবে। ফুল ফুটবে। সত্য, স্নায়, ভালবাসা। সাম্য।
তোমার আমার পৃথিবী—সবার পৃথিবী। অম্ম, বন্ধ, আশ্রয়। আলো,
জল ও বাতাস। কোন কিছুই কারো একচেটিয়া নয়। শুধু 'আমি'
নয়। 'আমি' বলবে 'আমরা'। 'আমি' তখন প্রভু হ'তে চাইবে
না, চাইবে কর্মের দ্বারা সবার ভালবাসা পেতে। তখনো কি অসাম্য
থাকবে না? রাম আর শ্রাম কি কখনো এক হবে? না, কি বলছ? সে
তো সাংঘাতিক কথা! তাতে আবার ধ্বংস হবে। না, তা হবে না।
চান্দ আর সূর্য দুই-ই তো প্রয়োজনীয়। সে অসাম্য তো প্রাকৃতিক
বৈচিত্র্য। কেউ শিল্পী, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ যন্ত্রবিদ, কেউ কৃষক।
তখন প্রতিযোগিতা চলবে আত্মিক উন্নতির জন্য। আজ আত্মা
পরাজিত, দেহ বিজয়ী। তখন দেহ পরাজিত হবে আর আত্মা বিজয়ী
হবে। আঃ। আকাশের তারাগুলো কাঁপছে। শুনছ—শুনছ নক্ষত্র-
দল। তোমরা হৃন্দর। জাগো। আজকের দিনটা বিচিত্রভাবে
কাটল। ক-ত জ্ঞান লাভ করল সে! কত মানুষ দেখল! আশ্চর্য
আশ্চর্য সব মুখ। চতুরলাল, কর্মাধ্যক্ষেরা, ললিতকুমার, নাগবর্দ্ধন,
অবলাকান্ত, চিত্রসেন। শশাঙ্ক, নরেশ্বর আর সেই লোকেরা। তারা

সবাই মিলে বেন সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করল আজ। বিরোগান্ত সভ্যতা।
 ধর্মোন্মুখ। বিরোগান্ত সমাজ-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় আত্মাকে
 নির্বিচারে সমাধিস্থ করা হয়, ভালোকে পিড়িয়ে মন্দ করা হয়, আলোকে
 নিভিয়ে অন্ধকারে পরিণত করা হয় আর শান্তিকে উড়িয়ে দিয়ে উদ্ভাস
 অশান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভাঙ্গো—

“গুনছেন—অ’মশাই—অ’দাদা—”

অবিন্দন থামল, তাকাল। ডানহাতের গলিটার মুখে অন্ধকারে
 একটি খর্বকায় লোক। বদল বোঝা গেল না—দ্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশও
 হতে পারে। ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়, ভাঙ্গা গাল আর বড় বড়
 ক্ষুধার চোখ।

“দাদা ইয়ে চাই ?—”

অবিন্দন বুকল না, প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে আবার ভালো করে
 তাকাল।

লোকটা চাপা গলায় বলল, “ঘোল বছর বয়েস—মাইরি বলছি।
 যেমন রং তেমন গড়ন—আর ইয়েগুলো ঠিক এমনি—” ডান হাতটা
 হুলে ছুটি স্তনের আকৃতি বোঝাল লোকটা, একটু হেসে বলল
 “বাজারের চিজু নয়—আসুন—মাস্তর দু’টাকা—”

অবিন্দন শিউরে উঠল, প্রশ্ন করল, “টাকার দরকার কি ভাই ?”
 লোকটা পেছিয়ে গেল এক পা, বলল, “টাকার দরকার কি !
 আচ্ছা ইয়ার্কি করছেন তো—অভাবের জন্তেই মাহুষ টাকা চায়—”

“মেয়েটি আপনার কে ?”

“কেউ না—তুমি চুলোয় যাও—”

লোকটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার পদধ্বনি।

আঁকাবঁকা গলি। চায়ের দোকানে ভাঙ্গা যন্ত্রের গান। টিমটিমে
 আলো আর দড়ম’র বেড়ার গায়ে কোলানো অভিনেত্রীদের ছবি।

গলির একপাশে একটা ঘুমন্ত কুকুর। ধাবমান রিক্সা গাড়ীর ঠন ঠন শব্দ।

টাকা। সবাই টাকা চায়। রক্তের রং কী লাল! জীবন কি। মৃত্যু কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? আর কী আশ্চর্য সেই নারী। যেন তপস্বিনী।

টাকা। টাকার জন্তই মানুষের লোভ, লালসা, পাপ। টাকার জন্তই অসাম্য। কেউ নিরাপদ নয়, কেউ স্বস্তি পায় না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, কারো জন্তে কেউ ভাবে না। অরণ্য। গভীর অরণ্য এই আজবনগর। আলোকরশ্মিহীন দুঃভেদ অরণ্য। রক্তলোভী স্বাপনদম্বুল। বাঘ, সাপ, অজগর, নেকড়ে, কুমীর। হত্যা সেখানকার আইন, হিংসা সেখানকার নীতি, লোভ সেখানে স্বভাব, লালসা সেখানে স্বাভাবিক। অরণ্যে পথ হারিয়েছে শান্ত মেঘপাল। পথ কোথায়? মুক্তির পথ কোথায়?

কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। তার হিংস্র ও আকস্মিক গর্জনে এই প্রায় নিঃশব্দ গলিটার আচ্ছন্নতা যেন থান থান হয়ে গেল।

পথ চাই। পথ বের করতেই হবে। শব্দশক্তিকে ধ্বংস করতেই হবে। উঠে দাঁড়াও। জাগো। ভাদ্রো। ইচ্ছে করলেই সব হয়। কে বলেছিল? মুকুন্দ? না, আরো কেউ বলেছিল। মনে পড়ে। বিস্মৃত স্বপ্নের মত একটা রূপালী নদী। গলিত রূপোর পাতের মত। তার পাশে এক প্রাচীন বাড়ী। তার মনিময় কক্ষে এক বিচিত্র জগতের কুরাশাচ্ছন্ন আকাশ। আনন্দময় পুতুলের দেশ। ঋষির মত একজন লোক তাদের স্রষ্টা। একজন শিল্পী? হ্যাঁ? সে বলেছিল যে ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। বলেছিল তাকেই। সে তখন প্রহরী ছিল। পাপ, অত্যাচার ও অসত্যের বিকক্ষে লড়াই করার জন্ত তার হাতে ছিল একটা বাঁকা তলোয়ার। ইচ্ছে করেছিল বলেই সে আজ নাহয় হয়েছে। এখন ক'টা? রাতের কোন প্রহর?

শালবনের অন্ধকার ছায়ায় হৃদয় দীর্ঘশ্বাস মুগ্ধবৃত্তেরা এখন স্বপ্ন দেখছে।
 অনিবার্ণ ইলেকাস্ত মনির মত জ্বলছে নক্ষত্রেরা আর ঘূর্ণমান পৃথিবীর
 আদিধ্বনি শুনছে। মনিমণিকোর আলোক হৃদয় সেই রূপবান গায়ক
 এখন বাগ বসন্তের তান ধরেছে, পাখোয়াদের তালে তালে নাচছে
 সেই উন্নতশ্রুনা লাস্তসেহী নর্তকী। আছে, সেই গ্রহরী অসিহস্তে
 এখনো তার অন্তরে আছে। সে যেন ঘোষণা করে বলছে—‘জাগো-
 ও-ও-ও—বিস্মৃতি ও বিব্রাতি ঠেলে উঠে দাঁড়াও-ও-ও-ও—’

শ্রীধর লেনের শেষ প্রান্ত।

সেই ভিজ়ে ভিজ়ে গন্ধ। কবরের গন্ধ।

বারান্দার ওপর উঠে দাঁড়াতেই ভেতরের দরজাটা খুলে গেল।
 লণ্ঠনহাতে ললিতা এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য একটি স্বপ্নের মত।
 অবিখ্যাত সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন অরিন্দমের সমগ্র চেতনাকে বোমাক্রান্ত
 পুলকিত ও স্তম্ভিত করে তুলল। স্থির হয়ে সে তাকে দেখতে
 লাগল।

ললিতার কালিন্দী-কালো চোখে বহ্নিম কটাক্ষ, তার প্রবাল-ধনুর
 মত দুটি ঠোঁট যেন শর-নিষ্কপে উত্তত।

অরিন্দম উচ্চারণ করল, “ললিতা!”

ললিতা প্রশ্ন করল, “এত দেরী করলেন বে! জানেন না বে
 আপনারা না এলে আমাদের বসে থাকতে হয়?”

“আপনারা মানে?” অজ্ঞতার ভাণ করল অরিন্দম।

ললিতা বলল, “দাদা আর আপনি।”

অরিন্দম তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল ললিতার দিকে, কপট গাঙ্গীধ্বের
 সঙ্গে বলল, “দাদার জন্ত বসে থাকার কারণটা বুঝতে পারি, কিন্তু আমি
 কে? আমার জন্ত কেন বসে থাকো বল তো?”

মুহুর্তে ললিতার মুখে যেন আবির্ভূত হইয়া গেল। ললিতার কণ্ঠ
আলোতেও তার সেই বস্ত্রের লক্ষ্যকে টের পাওয়া গেল।

মুহুর্তের অন্তর অরিন্দমের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা নীচু
করে ললিতা বলল, “কেন আবার ? অতিথি বলে।”

অরিন্দম মুখ টিপে হাসল, “অতিথি ! তার মানে তুমি চাওনা যে
আমি এখানে বেশীদিন থাকি ?”

ললিতার মুখের আবির্ভূত এক নিমেষে অন্তর্হিত হল, বিবর্ণমুখ তুলে
আহত কণ্ঠে সে বলল, “আমি চাই না ! তার মানে ?”

“তা নয়তো কি ? দু’দিনের অন্তর যে থাকে সেই তো অতিথি।”

ললিতা ক্ষণকাল অরিন্দমের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে
বইল, তারপর হঠাৎ জরতকণ্ঠে বলল, “আমি আর আপনার সঙ্গে তর্ক
করতে পারব না আমার ঘাট হইছে, দয়া করে এবার খেতে আসুন—”

বলেই জরতপদে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অরিন্দম তার
সহাস্ত্রে অনুসরণ করল।

আসন পাতাই ছিল। ললিতা নিঃশব্দে ভাত বাড়তে বসল।
অরিন্দম তার দিকে তাকাল। মেয়েরা আশ্চর্য জীব। সেই নারী !
রক্তের বং কী অদ্ভুত লাল ! ললিতা রাগ করেছে।

“ললিতা”—মুহূ গলায় ডাকল অরিন্দম।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

“ললিতা—”

এবারেও জবাব এল না, শুধু একটা ভাতের থালা এসে সামনে
হাজির হল।

অরিন্দম হাত ওঠিয়ে বলল, “আমি কিছু খাবো না ললিতা—”

ললিতা একটা চুক্তিচুক্তি নিক্ষেপ করে বলল, “কেন ? খাবারের
ওপর রাগ করছেন কেন ?”

“তাহলে তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন ?”

ললিতা মাথা নেড়ে অন্তরিকে মুখ কিরিয়ে বলল, “রাগ করিনি তো—”

“গতি বলছ?”

“হ্যাঁ।” ললিতার ঠোঁটে একটু হাসি ঝিলিক মাবল।

“তাহলে ঝাচ্ছি।”

অরিন্দম ভাতে হাত দিল।

বড় বড় লাল চালের ভাত, একটা শাক ও ডাল—এই খাবারের তালিকা।

শাক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অরিন্দম একটু হেসে বলল, “রাগ করো না—এত রাত পৰ্বন্ত আমাদের জন্ত বসে থাকার দরকার কি বল দেখি? খাবার ঢেকে রাখলেই পায়ে।”

ললিতা মাথা নাড়ল, “না, পারিনা। ইঁদুর ছুঁচোতে এসে প্রসাদী করে রেখে দেবে তা আমার সহ্য হবে না।” একটু থেমে আবার সে বলল, “আমি কেন? কোন মেয়েরই তা সহ্য হবে না—মেয়েদের স্বভাবই অমনি।”

অরিন্দম সহাস্তে ভাত মুখে দিল। মোটা লাল চালের ভাত আর শাক আর ডাল। তবু কি আশ্চর্য সুকোমল স্নিগ্ধতা তার ভেতরে! কি ঐন্দ্রজালিক প্রাণরসে রসালো! মুহূর্তে তার মনে পড়ল। এই প্রাণের জন্ত কী আকুল কামনা! বেঁচে থাকার জন্ত কি নিষ্ঠুর সংগ্রাম! রক্তের রং কী লাল!

“আজ এত দেরী হল যে?” ললিতা প্রশ্ন করল।

অরিন্দম মুখ তুলে বলল, “মুকুন্দের সঙ্গে জীবনকে দেখেছিলাম—
দেখেছিলাম স্বর্গ আর নরককে।”

“তারপর?”

“অনেক কিছুই শিখলাম।”

“কি শিখলেন?”

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, ললিতার দিকে ছুটো জলন্ত চো-
মেলে সে বলল, “শিখলাম যে বীরভোগা বহুদর”। আর বীর কে
সত্যাপ্রয়ী, পরহিত-ব্রতী, চ্যাপরায়ণ ও প্রেমিকেরা নয়। যে সমাজ
ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মানুষ আজ জঙ্গলের হাজা
হাজার জানোয়ারের মত পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত—সেই ব্যবস্থা
ফলে বীর বলে পরিগণিত হবে সে—যে বাথের মত হিংস্র হবে
শাপের মত ক্রুর হবে, পাথরের মত হৃদয়হীন হবে।”

ললিতা গলা নামিয়ে বলল, “আহে—আহে—”

“কেন?”

“সত্য আগুনের মত—ছড়িয়ে পড়ে। তাই অসত্যের অসংখ্য
চোখ আর কান চারদিকে সদা-জাগ্রত হয়ে আছে—”

অরিন্দমের মুখে তিক্ত হাসি দেখা গেল, “কিন্তু কি করে থামবে
সত্য? আগুনকে জল দিয়ে নেভায় মানুষ কিন্তু জলেও তো বাড়-
বানল থাকে—”

ললিতা চঞ্চল হয়ে উঠল, বিবর্ণমুখে বলল, “ওসব কথা থাক, আপনি
এখন খান দেখি —”

“হু—খাচ্ছি। অনেক ঘুরেছি আজ—স্বাকারাকা কত গলির
অন্ধকারে, অত্যাঙ্কল কত আলোর সমারোহে। কিন্তু অস্বস্তি বোধ
করছিলাম—শেষে বাড়ীতে এসে বাঁচলাম।” অরিন্দম মুখ তুলে
নরম হাসি হাসল, “কেন জানো?”

ললিতা অন্ধদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিশ্চুপকণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল,
“কেন?”

“তোমার জন্ত। তোমাকে দেখে বাঁচলাম।”

আগের মতই মুখ ফিরিয়ে রেখে ললিতা আবার প্রশ্ন করল, “কেন?”

“তোমাকে দেখতে ভালো লাগে।”

আবার সেই প্রশ্ন হল, “কেন?” কণ্ঠস্বরে একটু চাপা উত্তর,
ভীকু কাঁশন-লাগা বীণার তারের মত।

অরিন্দমের হুঁচোখে যেন বাষ্প ঘনাল, আবেগের আতিশয্যে চাপা
কণ্ঠস্বরটা মাঝে মাঝে কঁপে উঠতে লাগল, সে বলল, “কেন? জানিনা।
হয়ত তুমি ভালো বলে, সুন্দর বলে। তোমাকে দেখতে ভালো লাগে—
তোমাকে দেখার ইচ্ছাটা যেন একটা পিপাসার মত—প্রতি মুহূর্তে
প্রতি দিনে, তা শুধু বাড়ছেই, বাড়ছেই। তোমাকে না দেখলে মনে
হয় বুঝি দেখলেই পিপাসা মিটেবে—কিন্তু তা মেটে না।”

“কি হয়?” ললিতার বেন ঘুম পেয়েছে। আধো আধো, জড়ানো
জড়ানো তার কথা।

“দেখলেও পিপাসা মেটেনা—পিপাসা আরো বেড়ে যায়—আমার
সমস্ত কর্ম আর চিন্তার মাঝেও সেই পিপাসার বৃদ্ধ বারংবার উঠতে
থাকে—”

ললিতার মুখকে অরিন্দম সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায়না—ললিতা মুখটা
ধুরিয়ে নিয়েছে অন্ধদিকে। কিন্তু অরিন্দম তাকে না দেখলেই বা কি?
তার মুখে সিঁহুরের মত লাল হয়ে উঠেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার
চিবুকে আর নাসাগ্রে, মুহূ হাসির জোয়ারে কাঁপছে তার ঠোঁট দুটো।

হরিণীর মত ঘাড়টা ঈষৎ বেকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অরিন্দমের দিকে
তাকাল ললিতা, তারপর হঠাৎ নড়ে উঠল, বলল, “বন্ধুতা বন্ধ করুন
দেখি এবার”—

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল, “বন্ধুতা! কি বলছ!”

“বলছি যে গান—আরো ভাল দেব?”

“হ্যা—না”—

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। হুঁচোখে তার সঙ্কোচ, শঙ্কা।

ললিতা একটু হাসল, বলল, “আপানি পাগল হয়ে গেলেন—নিম্ন
তাড়াতাড়ি খান, আমাদের ঘুম নেই বুঝি?”

অরিন্দম আশস্ত হল। না, ললিতা রাগ করেনি। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে লাগল।

রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে, ঠিক সেই সময়েই অমিতা সরে গেল। একটু আগেই সে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মেলে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে অরিন্দম ও ললিতার কথা শুনছিল আর উত্তেজনায় অতিক্রান্ত ওঠানামা করছিল তার বুক।

ললিতার কথা শেষ হতেই অমিতা সরে গেল।

খাওয়া শেষ করে অরিন্দম হাত ধুতে গেল। ললিতা অরিন্দমের ঘরে গিয়ে প্রদীপটা জ্বেলে দিল।

রাত অনেক হয়েছে। বলরাম ও বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছাকাছি কোন্ একটা বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। নারীর কান্না। ভারী করুণ।

অরিন্দম ঘরে ঢুকে বলল—“বাতিটা আমিই তো জ্বালিয়ে নিতে পারতাম—তুমি আবার”—

ললিতা মাথা নেড়ে বলল, “তাতে কোনই লোকমান হয়নি আমার। আর কিছু দরকার আছে আপনার?”

“না।”

আবার সেই কান্নার শব্দ ভেসে এল। দমকা হাওয়ার মত। বিষণ্ণ, করুণ, ঠাণ্ডা। কবরের মত। মৃত্যুর মত।

“কে কাঁদছে ললিতা?”

খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ললিতা বলল, “আমাদের পাশের বাড়ীর হরেকৃষ্ণবাবু মারা গেছে—তারই বৌ কাঁদছে”—

“ওঃ”—

“বেচারী!” ললিতা সমবেদনার স্বরে বলল, “চারটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে

নিয়ে বিপদে পড়েছে—তাছাড়া স্বামীকেও ভালবাসত খুব! এবার
অকুল পাথারে পড়ল।”

“কেন?”

“বাচ্চাদের খাওয়াবে কি? হরেক্ষণবাবু তো টাকাকড়ি কিছুই রেখে
যেতে পারেনি, তাছাড়া কোন কুলেই কেউ নেই।

“হু—”

“আমি যাই।”

“আচ্ছা”—

ললিতা চলে গেল। ললিতার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল অরিন্দম।
রাজকন্য়ার মত গর্বিত পদক্ষেপে ললিতা চলে গেল। ঘরটা যেন ফাঁকা
হয়ে গেল, বুকটা যেন শূণ্য হয়ে গেল। আর থোলা জানালা দিয়ে ঘরের
ভেতর এল বাইরের নর্দমার গন্ধ। এল কান্নার শব্দ। পদশব্দ। কে?
অরিন্দম তাকাল। অমিতা। আশ্চর্য্য তার মন বলেছিল এই ভয়ের
কথা, সে জানত যে অমিতা নিভুলভাবে আসবে। প্রতিদিনকার মত।
ললিতা গেলেই অমিতা আসে, ললিতার স্থানকে সে অধিকার করতে
চায়। ছুঁচোখে বাসনার দীপ জ্বালিয়ে সে অর্থহীন কথা বলে বারংবার
তাকে উত্তপ্ত, শঙ্কিত, সন্তুষ্ট করে তোলে।

“জ্বালাতে এলাম—” ঝকঝকে দাঁত মেলে মুহূ হেসে বলল অমিতা।

দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল, তার ধারে একটা নড়বড়ে পুরোন
চেয়ার, তারি ওপর বসল অমিতা। টেবিলের ওপর তেলের প্রদীপটা
জলছে, মুহূ বাতাসে থরথর করে কাঁপছে তার শিখাটা। সেই প্রদীপের
আলোতে অমিতাকে অদ্ভুত দেখাল, অদ্ভুত রূপসী। চঞ্চল কটাক্ষ তার,
সারা দেহে মদির ঘোবন-তরঙ্গ, মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি। আকর্ষণ করে,
তবু ভয় হয়। অমিতার চোখে মুখে ক্ষুধা। দেহের আদিম রাক্ষসী ক্ষুধা।

অরিন্দম মুহূ হেসে বলল, “বেশ করলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ জ্বালাতে
পারবেন না—ঘুম পাচ্ছে।”

অমিতা হাসল, ঘাড় বঁকিয়ে বলল, “ঘুম তো পাবেই, ঘুমের দোষ কি? তা এত রাত পর্যন্ত ঘোরেন কেন?”

“ভালো লাগে।”

“তাঁহলে একটু কষ্ট করুন এবার, আমার যে আবার গল্প করতে ভালো লাগে।”

“গল্প করার লোকের অভাব কি?” অরিন্দমের কণ্ঠস্বর রসহীন।

অমিতা স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল অরিন্দমের দিকে, বলল, “অভাব আছে বৈকি। যার তার সঙ্গেই কি কথা বলে আশ মেটে?”

“হুঁ”—

শুক্রতা। অজগরের মত দৃষ্টি মেলে কেন দেখছে অমিতা? কি চায় সে? বোকা যায় তার কামনা। অতৃপ্তি। রক্ত আর মাংসের উন্নততা। তা হয়না। সে এখন বলিতার। বিদ্ধ কি আশ্চর্য! দেহ বলে, ‘না’। দেহ বলে দেহই সত্য। কি আশ্চর্য! মানুষের দুটো মন। একটা স্থল মন—তা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর একটা হৃদয় মন তা আত্মার সঙ্গে যুক্ত। একজন অস্থির আর একজন দেবতা। চিরকাল তাদের সংগ্রাম চলে আসছে, চিরকাল চলবে। জড় প্রকৃতি আর চেতন প্রাণশক্তির শাস্ত্রত্ব দ্বন্দ্ব। সে কি হার মানবে? না। তার অনেক কাজ। নারী মাংসের নিছক লালসা মানুষের মনে বিন্দুটি আনে, আনে আলস্য, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা। প্রহরী—সাবধান—

“আচ্ছা অরিন্দমবাবু”—

“বলুন”—

“দেশে আপনার আর কে কে আছে?”

“কেউনা।”

“কেউনা!” সহানুভূতি-মাখা গলায় অমিতা বলল, “আ-হা! একা মানুষের ভারী দুঃখ।”

হ্যাঁ।”

স্বস্ততা। থেকে থেকে হরেক্ষবাবুর বৌ এখনো কাঁদছে। আঁচলটা নিয়ে বারংবার পাকাচ্ছে আর খুলছে অমিতা। বারংবার তার ব্লাউজ আর উন্নত শুনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বারংবার মেহের মধ্যে একটা উত্তাপের ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

অমিতা হাসল, চাপাগলায় প্রশ্ন করল, “আপনি বিয়ে করেননি অরিন্দমবাবু?”

অরিন্দম শক্ত হয়ে বলল, “না।”

“বিয়ে করবেন না?”

“জানিনা।”

অমিতা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট একবার কামড়ে বলল, “জানেন না? তাহলে কাউকে ভালবাসেন বোধ হয়?”

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, “না।”

“ভালবাসেন না! কিন্তু কাউকে না ভালবেসে কি খাকা যায়? পারা যায়?”

হঠাৎ প্রদীপটা নিভে গেল। ঘরে দমকা হাওয়া আসেনি, তবু নিভে গেল তা।

অরিন্দম বলল, “কি হল? পিদিমটা নিভে গেল যে!”

অন্ধকারে অমিতার অল্প হাসি শোনা গেল, “নিভুক না, কি যায় আসে? অন্ধকারে কি আপনার ভয় লাগে?”

“না।”

“তবে? বলুন না, কাউকে ভাল না বেসে কি বাঁচা যায়? আপনি কি কাউকে ভালবাসবেন না?”

“আমার ঘুম পাচ্ছে অমিতা দেবি—”

“আচ্ছা, আপনি আমাকে ‘আপনি’ বলেন কেন?”

“আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি?”

“প্রজ্ঞা! কি কবর তা নিয়ে? আপনি আমাকে ‘তুমিই বলবেন—
আমি তো ললিতার চেয়ে মাত্র দু’বছরেও বড়—”

“আমার সঙ্কোচ হয়?”

“কেন?” তিক্ত হয়ে উঠল অমিতা’র কণ্ঠ, “কেন? আমি ললিতা
নই বলে?”

কস্ম করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। অরিন্দম প্রদীপটার
দিকে এগিয়ে এসে তা আবার জ্বলিয়ে দিল। সেই আলোতে অরিন্দম
দেখল যে অমিতার হুঁচোখে ঘৃণা আর হিংস্রতা।

“দিদি—”

হুঁজনে চমকে দরজার দিকে তাকাল। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে।
কখন এসেছে সে কেউ তা জানতেও পারেনি।

ললিতা মুছ হেসে বলল, “যুন্মতে চল দিদি—মা ডাকছে—”

অমিতা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, বড় বড় পা কেলে দরজার দিকে এগিয়ে
গেল, তারপর হঠাৎ দাঁড়াল। বোনের দিকে তাকাল সে, ললিতাও
তাকাল তার দিকে। অমিতা’র চোখে সেই ঘৃণা আর হিংস্রতা,
ললিতা’র চোখে প্রশান্তি। মুহূর্তকাল। তারপরেই অমিতা ক্ষতপদে
চলে গেল ঘর থেকে।

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। ললিতা কায়ক মুহূর্ত তার দিকে
নিশ্পলকনেত্র তাকিয়ে থেকে ভারী মিষ্টি করে হাসল। তারপর
নিঃশব্দেই চলে গেল সে।

অরিন্দম এবার নিশ্চিতমনে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে
বসল।

অন্ধকার। অন্ধকারের ঠাণ্ডা ডেউ এসে দেহে, মনে আঘাত করে।
অন্ধকারে ভয় করে না—কিন্তু অমিতা থাকলে গা ছমছম করে। রাত
ক’টা? কোন প্রহর? আজ তার অনেক কিছু দেখা হয়েছে, অনেক
জানলাভ হয়েছে। জ্ঞান দুঃখ আনে। তবু জ্ঞান মহৎ। দুঃখ সম্বন্ধে

সচেতন করে সে। কত মুখ! মানুষের মত দেখতে তারা কিন্তু তাদের
 মানুষের স্বয়ং নেই। তাদের স্বয়ং পশুর আবাস। তারা খাদ্য সংগ্রহ
 করে, খায়, ঘুমায়, বিলাসে মত্ত হয়। আটটি প্রহর তাদের এমনি
 কাটে। এমনি কাটে দিন রাত মাস বছর। তারা মানুষ হয় কখন,
 ক'টি মুহূর্ত? কে কাদে? কান্নার ঢেউ ভেসে আসছে। সেই বোটি
 কান্না। তার স্বামী মারা গেছে, অক্ল-সমুদ্রে তার তরী ডুবে গেছে।
 কেন কান্না বোটি? ভালবাসার লোক চলে গেল বলে! না।
 কান্না খাওয়াবে কে সেই কথা ভেবে। টাকা চাই। টাকার জন্যই
 লোভ, লালসা ও পাপের উদ্ভব। দশজনের ওপর প্রভুত্ব করার প্রতীকই
 এই টাকা। বোটি কান্না। কি খাবে, কে খাওয়াবে—সেই ভেবে
 তার কান্না পাচ্ছে। নিরাপত্তাহীন নিঃসঙ্গতা তার ভালবাসাকে হত্যা
 করেছে। ভাঙ্গো, ভেঙ্গে চুরমার করো। মতের পতাকা তলেও লোক
 আছে। রক্তের রং কী লাল! সেই নারী। বলিতা যেন রূপসী,
 অমিতা যেন অগ্নিকুণ্ড। বাতাসে কবরের গন্ধ, হুড়ক-প্রবাসী ইহরের
 শব্দ আর সেই বোটের কান্না। আজবনগরের লক্ষীর কান্না, আত্মার
 কান্না। তিলে তিলে কয়ে যাওয়ার আর্তনাদ। সোহিনীর আলাপ
 না বেহাগের বিলাপ! প্রহরী দাবধান—ঘুমিয়ে না, ঘুমিয়ে না,
 হুঁচোখে মশাল জ্বলে তুমি জেগে থাকো, তলোয়ারের ওপরে হাত
 রাখো—তোমার চারদিকেই শত্রুর শিবির—

কয়েকটা দিন কেটে গেল। প্রতিদিনকার নিময় পালন করে
 জ্বাকুহুমসঙ্কশ সূর্য্যদেব উদিত হলেন, অস্তে গেলেন; পীতবর্ণ চন্দ্রদেব
 রাতের আকাশকে পরিক্রমা করে ক্ষীণকায় হলেন। দিন আর রাতের
 আলোতে পাখীরা গাইল, বাতাস বইল, ঘাসবনের মৌমাছিরা গুনগুন
 করে পাখনা নাচাল। আর নগরীর পাড়ায় পাড়ায় নরনারীর জীবনশ্রোত

আগের মতই প্রবাহিত হল। উচুপাড়ায়—আলো, হাসি, কোলাহল, আর ভোগেশ্বরের উন্নত গতিবেগ। নীচুপাড়ায়—কবরের গন্ধ আর অন্ধকার, মৌন বিষন্নতা, আর আর্দ্রনাদ, কারা আর অভাবের নিষ্ঠুর নথরাঘাত।

কয়েকটা দিন। ললিতার চোখের তারার আশ্চর্য আলোকে আলোকিত দিন। কয়েকটা রাত। অমিতা'র চোখের তারার অন্ধ কামনার মত। তার মাঝে ফ্যাক্টরীর যন্ত্রদানবের গর্জন, ঘাম আর কালি। আগ্নেয়গিরির নিঃশব্দ উত্তাপের মত সহস্রের নিঃশব্দ গুঞ্জন। অরিন্দমের চিন্তায় ঘুম আসে না। আজবনগরের জীবন, মুকুন্দ ও বই পুথির জীর্ণ পাতা থেকে জানের করুণ ঐশ্বর্যকে বুকের শিলাতে খোদাই করে নেয় সে আর মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে, শয়তানকে কেটে কুচি কুচি করার একটা হিংস্র সংকল্পে কাঁপে, বহু ব্যাধির বীজাণু-ভরা সভ্যতার প্রাচীন ভিত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার একটা প্রাণদাহী পিপাসায় ছটকট করে। কবে? কবে তার হাতের তলোয়ার বলসাবে?

কয়েকটা দিনের পর সেদিন—

দূরে ফ্যাক্টরীর বিরাট লোহার ফটকটা দেখা গেল। একটা ঐতিহাসিক দৈত্যের পঙ্কজের মত তার মোটা মোটা শিকগুলো। দুর্জয়ার গোড়ায় উজ্জত আগ্নেয়াস্ত্রধারী চারজন দ্বার-রক্ষী। তাদের সামনে জন পঞ্চাশেক লোকের একটা জনতা। ব্যাপার কি?

“বাবা—বাবা গো—”

পেছন করে তাকাল অরিন্দম। একটি জরাগ্রস্ত ঐশ্বর্যী। শীর্ণ, কঙ্কালসার। দেহের কঁকড়ে বাওয়া চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা কালো হয়ে আছে।

“একটা পয়সা ছাও গো বাবা—ভগমান তোমাকে রাজা কইরবেন—ঈশ্বর তোমাকে রাজা কইরবেন—”

ভগবান! অরিন্দম জামার পকেটে হাত দিয়ে পয়সা খুঁজতে
খুঁজতে প্রস্থ করল, “তোমাকে একটা পয়সা দিলেই ঈশ্বর আমাকে
রাজা করবেন!”

ভিথিরী মাথা নেড়ে কাতরভাবে বলল, “হ্যাঁ বাবা।”

“ঈশ্বরের এত ক্ষমতা!”

“হ্যাঁ বাবা—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান—”

অরিন্দম হাসল, “হঁ—তাহলে সেই ঈশ্বর তোমাকে রাজা করেন
না কেন?”

ভিথিরী শুকনো গলায় বলল, “মুখ্য নোক ওর বেশী তো জানি
না বাবা—”

“হঁ—”

অরিন্দম পা বাড়াল। না, তার পকেটে পয়সা নেই। ঈশ্বর।
ভগবান। সর্বশক্তিমান! ফ্যাক্টরীর ফটকে দ্বাররক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র
উত্তত কেন? ঈশ্বর কি? জনতা উত্তেজিত কেন? কি হয়েছে?
ঈশ্বর কে?

ফ্যাক্টরীর ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম। জনতা। সবাই
ফ্যাক্টরীর শ্রমিক। পরিচিত। সবাই উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে
নিজেদের মধ্যে।

জনতার চীৎকার শোনা গেল, “মালিকের সঙ্গে দেখা করব আমরা
—দেখা করব—”

দ্বার-রক্ষীরা গর্জে উঠল, “পেছু হটো—ভাগো—”

ইন্দ্র ছিল সেই ভীড়ের মধ্যে, অরিন্দম তাঁকে টেনে আনল একপাশে।

“কি হয়েছে ভাই?” অরিন্দম প্রশ্ন করল।

ইন্ড্রের মুখ চোখ লাল, সে দাঁতে দাঁত চেপে ফ্যাক্টরীর দিকে তাকিয়ে
গালিবর্ষণ করল,—“শালা—শালার বেটা শালা—”

“কি হয়েছে ইন্দ্র—বলনা?”

ইন্দ্র অরিন্দমের দিকে তাকাল, বলল, “কটকের ওপর নামের তালিকা বুলছে—চেয়ে দেখ—”

“কিসের তালিকা? কিসের নাম?”

“পঞ্চাশজন লোকের নাম—তাদের চাকরী গেছে—পঞ্চাশজন লোক বরখাস্ত হয়েছে—”

অরিন্দমের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, “চাকরী গেছে! তাহলে তারা খাবে কি?”

বুড়ো আঙুলটাকে তুলে ধরে নাচাল ইন্দ্র, বলল, “কচু—”

“সে আবার কি?”

“ও ছাই—তাও জানো না তুমি?”

“তোমার—তোমারো কি চাকরী গেছে?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু কেন?”

“মালিকের ইচ্ছে।”

“কি করবে তোমরা?”

“নজর যা স্থির করবে—”

“আমরা কি করব?”

“আপাততঃ ধানি ঠেলগে—তারপর ডাক আসবে—”

পঞ্চাশজন বেকারের জনতা চীৎকার করে উঠল, “মালিকের দেখা চাই আমরা, বোঝাপড়া করতে চাই—”

দ্বাররক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে গর্জে উঠল, “পেছুহটো—নইলে গুলি করব—”

জনতা ভয়ঙ্কর হয়ে পাল্টা গর্জন করল, “না—”

পশুর মত নির্দয় দ্বার-রক্ষীরা হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অগ্নিবর্ষণ করল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। দু'জন লোক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তের রং কী লাল! জনতা

নিঃশব্দ হল, ভয় পেল, দ্রুতগতিতে চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল তারা।

দ্বার-রক্ষীরা অরিন্দমের দিকে আগ্রহোন্মত্ত উঠিয়ে এল।

পেছন থেকে একজন কর্মাধ্যক্ষের গলা শোনা গেল, “ওকে মেরে না—ও বরখাস্ত হয়নি—”

দ্বার-রক্ষীরা থামল। অরিন্দম ভেতরে ঢুকল।

প্রাত্যহিক কাজ। ঘড়ির কাঁটার মত, যন্ত্রের চাকার মত। দানবের মত যন্ত্রগুলো গর্জাতে থাকে। ইম্পাতের সঙ্গে ইম্পাতের সংঘাতের শব্দ, উত্তাপ, বাষ্প। ঘাম, কালি, বেদনাতুর শ্রান্ত পেশী। আর ভারী বাতাসে শাপের মত কুটিল চাবুকের ক্রুদ্ধ গর্জন।

এত শব্দ, তবু যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। নিঃশব্দ, নির্বাক, ক্রুটি-কুটিল শ্রমিকেরা। তাদের পঞ্চাশ জনসহকারীর চাকরি গেছে। পঞ্চাশজন লোক আজ থেকে দারিদ্রের ও মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াল। দু’জন লোক মারা গেল। রক্তের রং কী লাল!

একটি যুবক এসে কানে কানে বলে গেল সবাই, “আজ রাতে আবার সংঘ্রাম হবে—জরুরী আলোচনা আছে—”

হ্যাঁ। ভয় নেই। কিন্তু কেন? কেন পঞ্চাশজনের চাকরী গেল?

কেন? হাতুড়ীর আঘাতের মত প্রশ্নটা যেন বারবার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কেন পঞ্চাশ জনের চাকরী গেল? কেন?

নীচুপাড়ার আঁকাবাঁকা গলি তখন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। অন্ধ-মনস্কভাবে চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে হেঁচকি খেতে হয়। ঘুঁটে আর কয়লার ধোঁয়ায় গলির বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিতে বীভতিমত কষ্ট হয়। কেন? দৈশ্বর কে?

চলতে চলতে এদিক ওদিক তাকায় অরিন্দম। নীচুপাড়া আজ, যেন শব্দ আর কোলাহল বড় কম। কি ব্যাপার?

মাহুষদের মুখের দিকে তাকায় অস্বস্তিকর। বড় বিষম, বড় চিন্তিত
তাদের চোখ মুখ!

হঠাৎ দু'একটা কথাবার্তা তার কানে আসে। সে তা উদ্গ্রীব
হয়ে শোনে।

“কি খবর ভাই?”

“খুব ভালো—আজ আমার চাকরী গেছে।”

“হু—”

“আর তোমার খবর কি?”

“আমিও আজ থেকে বেকার—”

“কোন দোষে?”

“জানিনা।”

“শুধু তুমি আমি নই—সারা আজবনগর জুড়েই নাকি আজ
ছাটাই হয়েছে—”

“কি হবে?”

“মরব।”

“না গেয়ে?”

“হ্যা—”

“শুধুই মরব?”

“চূপ—”

মাহুষদের ক্রান্ত পদক্ষেপ। যুবকদের বুড়ো মনে হয়, বুড়োদের আরো
বুড়ো দেখায়। আর বোবা চোখ মেলে জুলজুল করে তাকায় জ্বাংটো
ছেলেমেয়েরা। অকারণে হাড়-বেগ-করা কুকুরেরা দাঁত ফেল করে গজায়,
ইঁদুরেরা কিচমিচ করে। জীবনের উদ্দেশ্য কি? মায়া? সবই কি
মায়া? বাতাসে থমথমে ভাব, চাপ চাপ উত্তেজনা, ইম্পাত-কঠিন সংকল্প।
‘চাকরী গেছে—কি হবে?—মরব।’ মৃত্যু কি?

কান্না গলির শেষ প্রান্ত। অস্বস্তিকর থামল। সজয়। মানব সজয়।

মনিষকরের উজ্জল, ধারালো চোখ।

আবার সেই আমবাগান। আজ শুধু হাজার লোক নয়। হাজার পাঁচেক লোক। সংখ্যা বেড়েছে। সত্যের পতাকা নীচে লোক বেড়েছে। আরো বাড়বে। আরো। অসত্য, অন্যায় আর অত্যাচার যত বাড়ে ততই তাদের প্রতিরোধ ও ধ্বংস করার জগৎ শক্তি বাড়ে, লোক বাড়ে।

জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশের নীচে, ছারিকেনের স্তিমিত আলোতে অগ্নিময় উচ্চারিত হতে থাকে। পিপাসার্ত হৃদয় শোনে তা। অনেক হৃদয়। বীরভোগ্যা বহুস্বরা। আর বীর কে? সত্যের সেবক যে। জাগো। উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ करो, চীৎকার করে বলো 'না,' সিংহের মত নিউয়ে এগিয়ে যাও। যদি তোমাদের কথার কেউ কান না দেয়, যদি তোমাদের আলোবাতাস ও অন্ন না জোটে তবে তোমাদের হাড় জিরজিরে বুক মেলে দাও, প্রাণ দাও, বল যে মাহুৎস না হতে পারলে এ জীবন বুথা, বুথা আমাদের বেঁচে থাকা। এঠো, জাগো, সব্ব পণ करो—

শুনতে শুনতে বুক ফুলে ওঠে, চোখ জলে ওঠে, দেহের পেশী লোহা হয় আর শিরা উপশিরাগুলো মল্লকের ছিলার মত টান টান হয়ে ওঠে—

চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল অরিন্দম। ইন্দ্র খাওয়াচ্ছিল।

বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে। ললিতা হরত ভাত আগলে বসে আছে। হরত ঘূমের জোয়ার তার চোপে। আলোকে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ললিতা। অমিতা। ক-ত অভিজ্ঞতা ঘটল তার এই ক'দিনের জীবনে! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! জাগো। দেখর কে? পকাশ—
একশ—হাজার লোকের চাকরী গেছে। কিন্তু কেন? দেখর কি?

ইন্দ্র প্রশ্ন করল “কি ভাবছ অরিন্দম?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “কিছু না।”

“আর এক পাত্র চা খাবে?”

“না ভাই।”

“ওখা না—কাল থেকে তো আর পারব না—”

ইন্দ্রের মুখে হাসি, কিন্তু তার গলার স্বর ভারী। অরিন্দম হাসতে পারল না, জবাব দিল না, নিঃশব্দে শুণু চায়ের পাত্রে চুমুক দিতে লাগল।

একজন লোক এসে তাদের পাশে বসল, ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে পরিচিতির হাসি হেসে বলল, “কি খবর ভাই?”

“মন্দ না। তোমার খবর কি অমিয়কান্তি?”

“ভাল না ভাই, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে”—

“কেন?”

“রামেশ্বরকে চেনো তো? সেই যে তোমাদের ওখানে কেরাণীগিরি করত?”

“হ্যাঁ”—

“সে হঠাৎ চাকরী ছেড়ে ব্যবসাতে নেমেছে—রাতারাতি পাচ হাজার টাকা লাভ করেছে”—

“বটে!”

“হ্যাঁ ভাই, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে আমার”—

অরিন্দম বিষন্ন দৃষ্টি মেলে অমিয়কান্তির দিকে তাকাল। পরশী-কাতরতা আর ঈর্ষায় নোকটার বুক জ্বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য।

একজন মোটামুত লোক এসে হাজির হল সেখানে, অমিয়কান্তির পাশে বসে বলল, “কি খবর দোস্ত? জরুরেটা সব ভালো তো?”

অমিয়কান্তি তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, “আরে বোস বোস নিশাকর—চা খাও। তারপর রাজনীতির খবর বল?”

নিশাকর ময়লা দাঁত মেলে হাসল, বলল, “খবর আর কি—অষ্টরস্তা। সব শালাবাই দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।”

“যা বলেছ। কিন্তু অবস্থা যে ধারাপ হয়ে এল যে—ছাটাই হুক
হয়েছে।”

“কি করব বল ? কপাল।”

একজন যোগা যুবক এসে নিশাকরের সামনে বসল। তাকে দেখে
নিশাকরের মুখটা অন্ধকার হয়ে উঠল। যুবকটির পরনে ছেঁড়া জামা-
কাপড়।

“নিশাকর”—

“কি ?”

“আমার দুটো টাকা ধার দাও জেলেটার বড় অস্থখ অথচ হাতে
একটিও পয়সা নেই। আমি বেকার বসে আছি—যে কোন কাজ
করতে রাজী আছি অথচ আমি তা পাচ্ছি না—মামায় দুটো টাকা
ধরে দেবে ?”

নিশাকর অকুণ্ঠিত করে মাথা নাড়ল, “আমার কাছেও একটা পয়সা
নেই।”

“নিশাকর—”

“নেই।”

“নিশাকর”—

“কি ?”

“আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি, চুরি করিনি, লোভ করিনি, কারো
কোনদিন অপকার করিনি”—

“হ্যা, তা ঠিক।”

“আমাকে দুটো টাকা ধার দাও। একটা চাকরী পেলেই আবার
ধার শোধ করে দেব।”

“নেই।”

“অমিয়কান্তি”—

অমিয়কান্তি ও মাথা নেড়ে বলল, “নেই।”

নিশাঙ্কে উঠে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল রোগা যুবকটি। নিশাকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “বাপ বাঁচা গেল—হুঃ—টাকা যেন খোলাম-কুঁচি”—

অমিয়কান্তি সায় দিল, “বা বলেছ ভায়া—”

“বাঃ—সবাই যে এখানেই দেখছি”—একজন স্তবেশ লোক এসে সেই রোগা যুবকের পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ল। স্তদর্শন বৃদ্ধিমান যুবক, সর্বদিকে স্কুচির ছাপ।

নিশাকর সোজাসে বলল, “আরে দেবেন্দ্র যে ! এসো”—

দেবেন্দ্র বসল, বলল, “চা খাওয়াও”—

“নিশ্চয়ই”—

“একটা ধোঁয়া দেখি—আমার ফুরিয়ে গেছে”—

“এই নাও—তারপর, খবর কি ?”

“ভালো না ভাই—এমাসে মাত্র হাজার টাকা আয় হয়েছে”—

“দিনকাল বড় খাবাপ”—অমিয়কান্তি বলল।

দেবেন্দ্র সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, “তা ঠিক, তবে সামনের মাসে আমি ঠিক পুষিয়ে নেব। আর বল কেন ? টাকাও কি ছাই হাতে থাকবে ? পাচশো টাকা ধার দিবেছি একজনকে, দুশো টাকা দান করেছি একজনকে”—

“ভালোই তো”—নিশাকর সহাস্ত্রে বলল।

চা এল। চা খেতে খেতে দেবেন্দ্র বলল, “কি ব্যস্ত ? ভালো ? তা হলে আমার চলবে কি করে ? এইত এখনি আমার গোটা একশো টাকা দরকার—পাই কোথায় ? কাল ধনাগারে যাব, তবে টুলব”—

“তা বটে”—

চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে দেবেন্দ্র বলল, “আঃ—তারপরে সিগারেট-টাকে সঙ্গে করে টান দিনে দিতে নিশাকরের দিকে তাকিয়ে সহাস্ত্রে বলল, “ভালই হয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে”—

“কেন?”

“একটি ছাত্র মরমর, তার চিকিৎসার ভার নিয়েছি আমি। আজ রাতেই আবার ডাক্তারকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে—বুঝলে না, তার দক্ষিণা, শুষ্কতার দাম। অথচ কালকের আগে তো টাকা তুলতে পারছি না। একশোটা টাকা দাও তো নিশাকর”—

নিশাকর হাসল, “পরোপকার করে তুমি মারা পড়বে।”

“কেন? একটু আগেই তো বললে—‘ভালই তো’।”

দশটা দশটাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল নিশাকর।

দেবেন্দ্র তা ছেঁ মেঝে পকেটে পুরে বলল, “দত্তবাদ ভায়া—আজ তাহলে উঠি বুঝলে না, এখনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে”—

“আচ্ছা”—

দেবেন্দ্র শিয় দিতে দিতে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল, বলল, “অরিন্দম যাবে নাকি?”

অরিন্দমের চমক ভাঙ্গল, সে বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ—চল”—

অমিয়কান্তি ইন্দ্রকে বলল, “চললে তাহলে?”

“হ্যাঁ ভাই।”

অরিন্দম আর ইন্দ্র রাস্তায় নামল।

ইন্দ্র বলল, “মজা দেখলে অরিন্দম?”

“কি মজা?”

“খানিক আগে রোগামত লোকটা নিশাকরের কাছে দুটো টাকা চেয়েও পেল না, অথচ দেবেন্দ্র পেল এ-ক-শো টাকা—”

“হ্যাঁ—তাতে কি?”

“রোগা লোকটা সত্যি সং—আর দেবেন্দ্র ঠিক তার বিপরীত—সে প্রতারক, জোচ্চোর—”

“তাতে মজাটা আবার কোথায়?”

“মজাটা এইখানে যে আমাদের সমাজের এইটেই নিয়ম। যে সং

সে কারো সাহায্য পায় না আর যে অসং ভাবি” সিদ্ধকে
ভরে সবাই।”

“তাহলে তুমি নিশাকরকে নিষেধ করলে না কেন?”

“তাতে কি ফল হবে? নিশাকর না দিলে আর কেউ টাকা দেবে
দেবেজ্ঞকে। বিষবৃক্ষের শেকড় না ওপড়ালে কিছু হবে না—”

“হু—”

অরিন্দম মাথা নাড়ল। ইয়া, ইজের কথাই সত্যি। ব্যক্তিকে
চালায় সমাজ, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজপতিরা। আর স্বার্থপর
সমাজপতিদের প্রচলিত ব্যবস্থা যখন সমাজকে দুষ্ট করে তোলে তখন
ব্যক্তির কি করে সাধু থাকবে? ভাঙো—চুরমার করো এই
প্রাচীন ও গলিত ব্যবস্থা। ধ্বংস করো। শুকনো পাতার জঞ্জালে
আগুন লাগিয়ে দাও।’ কিন্তু হৃদয়ের অন্ততলে একটা প্রশ্ন—ঈশ্বর কে?
ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তবে দুঃখ কেন? ঈশ্বর কি?

বারান্দার আঁচলা অন্ধকারে কে যেন বসে ছিল।

অরিন্দম উঠতে গিয়ে প্রশ্ন করল, “এখানে কে?”

বলরামের গম্ভীর কণ্ঠ ধনিত হল, “আমি—”

অরিন্দম অবাক হল। আর কোনদিন তো বলরাম এ সময়ে বাইরে
বসে থাকে না! ব্যাপার কি? বাড়ীটা নিরুন্ম—বাচ্চাদের পর্যাপ্ত
কোন সাড়াশব্দ নেই।

সে আবার প্রশ্ন করল, “এখানে এমনভাবে বসে আছেন যে?”

অন্ধকারে হাসল বলরাম, তার সে হাসি ভারী অস্বাভাবিক।

“কি বললে? বসে আছি কেন? আমি যে এখনো বসে আছি—
সেইটেই আশ্চর্যের কথা—”

“কেন ?” কি হয়েছে ?”

“যা আজকে অনেকের ভাগ্যেই ঘটেছে—”

ভয়ে ভয়ে বলল অরিন্দম, “তার মানে ?”

অন্ধকারেই উঠে দাঁড়াল বলরাম, বলল, “চাকরী গেছে—”

অরিন্দমের শরীর যেন পাথর হয়ে গেল। দুটি মাত্র কথা’র ভেতর দিয়ে বলরাম যা বলল তার অর্থ সাংঘাতিক। চূপ করে রইল সে। তার চোখের সামনে দিয়ে হাজার হাজার কর্মচ্যুত লোকদের মুখ মিছিলের মত চলে গেল। আবছা আবছা চেহারা, কুয়াসায় ঢাকা, চিনেও চেনা যায় না তাদের। মানুষের অবয়বধারী প্রেতের মত। আর সেই মুখের মিছিলে আর একটা মুখ বাড়ল। বলরামের মুখ।

বিড়বিড় করে বলে চলল বলরাম, “পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে—তবু ভালো দিনের মুখ দেখলাম না—ছেলে আর বাপে যা পাই তা কতটুকু ? কিন্তু তবু তো চলছিল—নুন ভাত খেয়েও তো ন’টি প্রাণী বেঁচে ছিল ! কিন্তু এবার ? এবার ?”

কাকে প্রশ্ন করল বলরাম ? অরিন্দমকে ? না। তবে কি নিজেকে ? না, তাও না। তাহলে ? কাকে ?

অরিন্দম মুহূর্তে বলল, “চিন্তা করবেন না—আমরা তো আছি—”

“তোমরা !” বলরাম হাসল, “তোমরাও কি থাকবে ?”

“থাকব—”

বলরাম কটমট করে তাকাল অরিন্দমের দিকে, ক্ষণকাল নিশেদ থেকে বলল, “স্বপ্ন দেখছ, না ? দেখ। আমরাও এককালে দেখেছি তা। ভারী অপশোষ হ’ল—আজকালও যদি তোমাদের মত স্বপ্ন দেখতে পারতাম—দেখ, স্বপ্ন দেখ—”

বলরাম বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

“কোথায় চলেছেন ?” সে পেছন থেকে প্রশ্ন করল। কোন জবাব এল না।

অরিন্দম নিজের ঘরে গেল। ঘরে প্রদীপটা জ্বলছে আর এক কোণে বসে বসে মুকুন্দ বিড়ি টানছে।

অরিন্দমের পায়ের শব্দে কিরে তাকাল মুকুন্দ, মুহূর্তে বসল, “বাবা বেকার হয়েছে—”

অরিন্দম বিছানার একপাশে বসে মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, জানি।”

“আজ সন্ধ্যে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“আরো অনেকের খাওয়া বন্ধ হল।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, আকুলভাবে প্রশ্ন করল, “কিন্তু কেন মুকুন্দ? কেন?”

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে কেলে দিল মুকুন্দ, বলল, “ধনীর লোভ।”

“তার মানে?”

“বস্তুত্ব দ্বিভেদে ইচ্ছে করছে না অরিন্দম।”

“বল—বল মুকুন্দ—”

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, “লোভ। মোটা মুনাফা করব বলে শ্রমিকদের জানোয়ারের মত পাটিয়ে প্রচুর উৎপাদন করেছিল ধনিক প্রভুরা। কিন্তু ঐশ্বর্যবানদের পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা বলে একটা বস্তু আছে। তার ফলে এতদিনে প্রভুরা আবিষ্কার করল যে উৎপন্ন হবোর তুলনায় চাহিদা কম—অতএব উৎপাদন কমাতে হবে। উৎপাদন কম করলে বেশী লোকের দরকার কি? অতএব ছাঁটাই শুরু হল।”

“তাতে চাহিদা বাড়বে কেন?”

“বাড়াবে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে তারা অল্প অল্প করে মাল ছাড়বে—তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের সাংঘাতিক মুনাফা হবে—”

“হু—”

নিঃশব্দতা।

মুকুন্দ বলল, “শুধু তাই একমাত্র কারণ নয়। এবার প্রভুরা এক চিলে ছ'পাখী মারছে—”

“কি রকম?”

“নীচুপাড়ার লোকদের অসন্তোষ তারা জানতে পেরেছে—তারা টের পেয়েছে যে মরা আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠছে। তাই অন্ধুরেই বিপদকে বিনাশ করতে চাইছে তারা। পেটে মেরে—ফাঁসী না দিয়ে অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করে—বেছে বেছে তাদের পক্ষে বিপজ্জনক লোকদের ছাঁটাই করে—”

“এবার কি হবে?”

“আরো লোক ছাঁটাই হবে, গ্রেপ্তার করা শুরু হবে, ক্ষুধাতের সংখ্যা বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুদের লোভও আরো বাড়বে—হুঁড়িক ও নগ্নতা আসবে, আসবে মহামারী, আকাশে, বাতাসে, তোমার চারদিকে তুমি শুধু মৃত্যুর কালো ছায়াকে দেখতে পাবে—”

অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, “তাই হবে? শুধু তাই হবে? এই মৃত্যুকে কি জয় করতে পারব না আমরা?”

“চেপ্টা তো চলছে—কি হবে কে জানে?”

“আমাদের জয় হবেই।”

“জানিনা কি হবে—তবে এটা ঠিক যে সংগ্রাম করতেই হবে—”

“তুমি আজ দুর্বলের মত কথা বলছ কেন মুকুন্দ?”

মুকুন্দ বিষন্নভাবে হাসল, “কি জানি কেন—মনটা আজ খারাপ লাগছে”—হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, তিব্বতকণ্ঠে বলল, “না, আমি হারব না অরিন্দম, দুর্বল হবে না। আমাদের জয় হবেই, জিততেই হবে আমাদের—অরিন্দম, আমি যাই, দুঃখরূপী শয়তান আমাকে

ভয় দেখাচ্ছে, প্রসন্ন করছে, মদের আঙনে তাকে আমি পুড়িয়ে
আসিগে যাই—”

“শোন—”

“শেছ ডেকোনা—”

মুকুল গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

লোভ। কুকুরের লোভ, বাঘের লোভ, অজগরের লোভ।
লোভ মানে ‘দাও, দাও, আরো দাও, হাড় ভেঙ্গে দাও, রক্ত
নিংড়ে দাও’। ক্ষুধাতের মিছিল শুরু হল। হাঁটাই। ‘হ্যা বাবা,
ঈশ্বর সর্বাশক্তিমান।’ ঈশ্বর কে? ছ’জন লোক মারা গেল।
রক্তের রং কী লাল। অস্ত্রোন্মুখ স্বয়ম্বেবের মত। মাথার ভেতরে
চাতুড়ী শিটছে কে? বৃকের ভেতরে যেন উদ্ভৃষ্ট বয়লার। কি
হবে? মরবে সবাই! শুধুই মরবে! না, শিংহের মত কেশর
ফুলিয়ে কখে দাঁড়াও—এই ময়াদাহীন প্রাণকে বজ্রন করো—ওসো,
জাগো, ঈশ্পাতের মত কঠিন হও, সাবধান হও—অরণ্যের শাপদেবী
আজ মহেশ্বরের উন্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধ্বংস করো, নিশ্চিহ্ন
করো—

“উঠুন, খেতে চলুন—”

চমক ভাবল। ঘরের ভেতর আর একটি প্রদীপ। লজ্জলতর
প্রদীপ। না, প্রদীপ নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। ললিতা।

অরিন্দম হাসল, তার মুখটা উজল হয়ে উঠল, নিম্পলকনেত্রে
তাকিয়ে রইল সে ললিতার দিকে।

“চলুন—”

“ললিতা—”

“বল—”

“ললিতা—”

“কি?”

“স্থির হয়ে দাঁড়াও—”

“কেন?”

“আমি তোমাকে দেখি। আপত্তি করো না, হেসো না—
আমাকে দেখতে দাও, শক্তি পেতে দাও, শক্তি পেতে দাও।
অরণ্যের অন্ধকারে আজবনগর ছেয়ে গেছে ললিতা, বক্তলোভী রাক্ষসেরা
পৃথিবীকে জয় করেছে—তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য আমি শক্তি
চাই। ললিতা, আমার দিকে তাকাও,, তোমার চোখের আগুন দিয়ে
আমাকে জালিয়ে তোল—”

স্থির হয়ে দাঁড়াল ললিতা, তার পলকহীন চোখের তারায় যেন
সত্যি আগুন জ্বলল। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল তার
দেহলতা। যেন মূর্তিমতী অগ্নিশিখা।

সে বলল, “তাই হোক। তুমি অগ্নিমান হও—জলে ওঠো—পানির
জগলকে পুড়িয়ে তুমি চাই করে দাও—”

রক্তে যেন আগুন ধরল, শিরায় উপশিরায় যেন তরল আগুন
প্রবাহিত হল আর সেই আগুনের উত্তাপে যেন সমগ্র চেতনা দাবানলের
মত জলে উঠল। কান্না। বাতাসে যেন নারীকণ্ঠের বিলাপ। কে
কীদে? কেঁদো না। আজবনগরের লক্ষ্মী, তোমার চোখের জলকে
আগুন করো—



চার

চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে তাকাল অরিন্দম। পশ্চিমের সৌধাবলীর আড়ালে হিরন্ময় সূর্যদেব অদৃশ্য হয়েছেন, সিঁদূর-মেশানো গলিত সোনার প্রলেপ লেগেছে আকাশের নীলের ওপর। আর সেই সব সৌধাবলীর অরণ্যে বনম্পতির মত মাথা তুলে আছে ক্যান্টরীর গগনম্পর্শী ধূমনলটা। তার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পারাবতের দল, সারিবদ্ধ বনহংসের মিছিল। ইট পাথর আর লোহালকড়ের কাঠিণ্যের ওপর আকাশের সেই কোমল রং, সূর্যের সেই কোমল আলো আর সেই কোমল-পক্ষ পাখীদের ডানার আঘাতকে ভারী বিচিত্র মনে হয়।

অরিন্দম ভাবে। আরো কয়েকটা দিন কেটেছে। আরো অনেক লোক বেকার হয়েছে। দারিদ্র বেড়েছে। নীচুপাড়ায় আর হাসি শোনা যায় না। সেখানে ক্লান্ত পদক্ষেপ, দীর্ঘবাস, কায়া আর আগ্নেয়গিরির জ্বালা। সন্ধ্যের তরফ থেকে বেকার লোকদের পুনর্নিয়োগ ও কাজের ব্যবস্থা দাবী করা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন সাড়া দেয়নি মালিক প্রভুরা। আজবনগরের কর্তৃপক্ষও নির্বিকার এবিষয়ে। কি হবে? এরপর কি হবে? সংগ্রাম? কবে—কবে শুরু হবে তা? কবে তার মানুষের জীবন সার্থক হবে?

“দাবা—বাসাগো, একটা পয়সা দাও—”

অরিন্দম তাকাল। একটি ভিথিরীর প্রসারিত হাত। এক ফালি শ্রাকড়া তার নয়তাকে দূর করেছে। কালো ময়লা নানা রেশমির আকারে জমে আছে তার সারা মুখে ও দেহে। আর কী বীভৎস তার চোখ দুটো! গলে গেছে তা। ব্যাধি। কী সাংঘাতিক!

অরিন্দম বলল, “তুমি অন্ধ !”

ভিখিরী মাথা নাড়ল, “আমি কেন বাবা—পৃথিবীতে সবাই তো
অন্ধ—”

“সবাই !—কেন ?”

“আমি চোখে দেখতে পাইনা আর তোমরা যে চোখ থাকতেও
দেখতে পাওনা—একটা পয়সা দাও না বাবা—”

কি বলল ভিখিরীটা ! সত্য ! তার অর্থ কি ? সত্য কি ? পয়সা ?
পকেটে হাত দিল অরিন্দম । হ্যাঁ, আছে একটা পয়সা ।

“এই নাও—”

ভিখিরীর প্রসারিত হাতের ওপর অরিন্দম পয়সাটা দিল । মুহূর্তে
কাকের মত, কুকুরের মত অসংখ্য ভিখিরীরা আসতে লাগল তার
কাছে ।

“ভগবান তোমাকে রাজা করবেন বাবা—রাজা করবেন—”

ভগবান ! আবার ! কে, খবর কে ?

“একটা পয়সা দাও বাবা—ও বাবা—”

আর একজন ভিখিরী এগিয়ে এল । তার একটা পা ছোট ।

নেংচে নেংচে অতিকষ্টে কাছে এল সে, হাত বাড়াল ।

“কি হয়েছে তোমার পায়ে ?” অরিন্দম প্রশ্ন করল ।

“আমি খোঁড়া—”

“তুমি খোঁড়া !”

“তুধু আমি নই—খোঁড়া তো সবাই বাবা—”

“কেন ?”

“তা নয়ত কি—পা ঠিক থাকতেও কি কেউ সত্যপথে চলে ? একটা
পয়সা দাও বাবা—”

“আ—আ—আ—”

একটা কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ । অরিন্দম তাকাল । কককেশ

একটি যুবক প্রাথমিক হাত নেড়ে ইঙ্গিতে তাকে চাইছে। তার পাশে একজন অতি-দুঃস্থ, হৃদয়হীন লোক।

অস্বস্তি-প্রসন্ন করল, “অমন করছ কেন ভাই? তুমি কি কল্ল
বলতে পারো না?”

কক্ষকেশ যুবক বলল, “আ—আ—আ—”

কল্ল লোকটি বলল, “ও বোবা।”

“বোবা! আহা—”

কল্ল লোকটি খেঁকিয়ে উঠল, “‘আহা’ কেন মশাই? প্রতি মুহূর্তে মিথ্যা বলার চেয়ে কি বোবা হওয়া ভালো নয়? যাক সেকথা—একটা পরশা দিন না—রোগে ভুগে ভুগে যে মরে গেলান—”

“তুমি ব্যাধিগ্রস্ত!”

কল্ল লোকটি মুখ বিকৃত করল, “হ্যা—আপনাদের মতই।”

“আমাদের মত! কেন?”

“আমার ব্যাধি দেহে—আপনাদের ব্যাধি মনে। একটা পরশা দেবেন?”

“ও মশাই. একখিলি পান খান না—আমার উপকার হবে—

ও দাদা—”

একজন বুড়ো লোক।

“বাবাগো—এ্যাক্ট! পাইমা ছা ও গো বাবা—আনাব এই ছেইলাটা কাইল থিকা না খায়া আছে গো বাবা—ও বাবা—”

একটি প্রেতিনীর মত নারী—তার কোলো একটি দেড় বছরের উলঙ্গ শিশু।

সেই নারীকে সরিয়ে দিয়ে একজন ত্রিশ বছরের লোক এগিয়ে এল কাছে, বলল, “একটা টাকা দিন তো মশাই, কাল দেব—?”

অস্বস্তি-প্রসন্ন মাথা নাড়ল, “নেই—”

লোকটি উদ্ধতভাবে বলল, “দিন না—দেখছেন না আমি ভদ্রলোকের ছেলে—দিন না—”

লোকটির পেছন থেকে একটি বাইশ বছরের যুবতী এসে সামনে দাঁড়াল। পরনের শতছিন্ন নোংরা শাড়ীর অঙ্কুরাল থেকে সায়গায় জায়গায় তার মেহ দেখা যায়। শ্রামবর্ণ আকৃতি, ডাগর ডাগর চোখের নীচে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার প্রলেপ। মাথার লম্বা লম্বা চুলের রাশি তেলের অভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

“কিছু পয়সা দিন না—শুনছেন?” যুবতী বলল।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “নেই—নেই আমার কাছে—”

“নেই! ঐ কানা লোকটাকে দিলেন যে!”

“নেই।”

যুবতী ধারালো হেসে হঠাৎ তার ছেঁড়া শাড়ীটাকে টান দিয়ে খুলে ফেলল, নগ্ন হয়ে দাঁড়াল সে। অরিন্দম দেখল। বিস্ময় স্তম্ভ, শীর্ণ দেহ, হাড় আর নীলচে শিরার ঘোষণা।

যুবতী বলল, “দেখুন, আমার দেহের দিকে তাকিয়ে দেখুন—
আপনার কি লোভ হয় না?”

অরিন্দম হুঁহাতে মুখ ঢাকল, বলল, “তুমি নির্জঙ্ঘ—”

যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠল, “আমি নির্জঙ্ঘ না আপনি!”

“আমি!”

“আপনার মত লোকেরা—আপনারাই তো আমাকে শিখিয়েছেন যে লজ্জাকে বিসর্জন না দিলে বাঁচা যায় না। আপনারাই তো আমাকে চাবুক মেরে মেরে শিখিয়েছেন যে জন্মালেই বাঁচার অধিকার জন্মায় না, বাঁচতে হলে ভিক্ষে চাইতে হয়, লালদার কাছে নিজেসে বিক্রী করতে হয়—”

অরিন্দম শিউরে উঠল, “ছিঃ ছিঃ—দেহের মধ্য যে আত্মা থাকে, দেহ অপবিত্র হলে যে আত্মাকে বেদনা দেওয়া হয়—”

“আত্মা! সে আবার কি? যে সব প্রভুরা আমার দেহকে কামড়েছে তারা তো কোনদিন বগেনি যে দেহের ভেতরে আরো কিছু আছে—”

“সেই সব প্রভুবা শয়তান—তাদের আমরা ধ্বংস করব—”

যুবতী উত্তেজিত হয়ে উঠল, “সে যখন করবেন তখন দেখা বাবে—
এখন আমাকে কিছু পরশা দিন্। তাকান—চলুন না ঐ গাছডালার—কেউ
নেই ওখানে—”

খিল খিল করে আবার হেসে উঠল সে, একটি হাত বাড়িয়ে বলল,
“দিন্ না কিছু পরশা—আম্বা চুলোর বাক্—আমাকে বাঁচতে দিন্—”

“দাও—দাও—দাও—” চারদিকের সমবেত ভিধিরীরা ধ্বনি তুলল।
বাস্পীয় আলোতে তাদের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখগুলোকে কী ভয়ঙ্কর
দেখাল!

“দাও—দাও—দাও—” আরো ভিধিরী ছুটে এল, অরিন্দমের
চারদিকে জড় হল।

অরিন্দম তাকাল। সবাই প্রার্থী—হাজার হাজার—লক্ষ কোটি
লোক! সবাই ভিধারী। সবাই প্রার্থনা করছে—দাও, দাও, আমাকে
বাঁচতে দাও। কিন্তু কেউ সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চাইছে না, কেউ
মাঠঘের মত বাঁচতে চাইছে না, কেউ আম্বাকে বাঁচাতে চাইছে না।
মনে পড়ে। ললিতা। তার আশ্রয় দুটি চোখ, দুটি ঠোঁট—সে,
সে ও হয়ত একদিন ভিক্ষা করতে পারে—কে জানে? না, না, তা
কখনো হবে না—

“দাও—দাও—দাও—”

“দাও—দাও—দাও—”

“দাও—দাও—দাও—”

নেই, নিরাপত্তা নেই, অবকাশ নেই, সমাধিহ আত্মাকে খুঁড়ে বার
বার সময় নেই। জীবনের জৈবিক চাহিদাতে সবাই উন্মত্ত, বুদ্ধিভ্রংশ—
ভেঙ্গে ফেলো—

“দাও—দাও—দাও—”

ভেঙ্গে ফেলো—



“দাও—দাও—দাও—”

ভেঙ্গে চুরমার করে—

“দাও—দাও—দাও—”

উর্দ্ধ্বাসে দৌড় দিল অরিন্দম। আর সহ্য হয় না। আর কিছুকি
এভাবে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। পালাও—পালাও—। কি
কোথায় পালাব? পালাব কেন? না, তা নয়। শুধু মাহুবুলোর
নাগালের বাইরে যাব আমি, পালাব না। সেই একই প্রেত। সমাহ-
ব্যবস্থা। সেই একই বিষবৃক্ষের শাখা। লোভ ও লালসার জ্বর
সুস্থান। দাও—দাও—দাও। সবাই ভিক্ষুক—সবাই ক্ষুধার্ত ও রক্ত-
কুরুর। সত্য? সত্য কি? আত্মা কি? নিবাত-নিকম্প দীপশিখা।
টাকা। টাকা না হলে শক্তি নেই। টাকা না হলে জীবন ধারণ করা
যায় না। তখন মৃত্যু। মৃত্যু কি? উত্তরোল রক্তধারা—সমুদ্রের
টেঙেয়ের মত এসে আঘাত করছে—আমার মস্তিষ্কে, আমার বুকে,
আমার নখের অগ্রভাগে—

“ভগবান্—”

চমকে উঠল অরিন্দম, কাঁঠ হয়ে দাঁড়াল, আশ্চর্য্য একটা শিহরণ
খেলে গেল তার সমগ্র চেতনার। এ কী হল! ভগবানকে ডাকল কেন
সে? কে ভগবান? চতুরলাল? চতুরলালের মত কেউ? কাকে
ডাকল সে? কাকে স্মরণ করল তার বিগুরু আত্মা?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। রাস্তার বিপরীত দিক থেকে একটা
মোট মাথায় আসছে দামোদর। তার আগে আগে একজন সুবেশ
ভদ্রলোক।

“দামোদর—”

দামোদর তাকাল। সে ভরষার রোগী হয়ে গেছে—তাকে ঘেন আর
চেনাই যায় না।

দামোদর বিশীর্ণ হাসি হাসল। অরিন্দম তার পাশে পাশে চলল।

“তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে দামোদর—কেন?”

দামোদর হাসিমুখে বলল, “অসুখ হয়েছিল”—

“রিকশা চালানো ছেড়ে দিয়েছ?”

“হ্যাঁ। শরীরে কুলোয় না বলে আজকাল মোট বই—তাও কট
হয়”—

“আজকাল আর গান গাও না?”

“গাই—মাকে মাঝে”—

“কি গাও?”

দামোদর গভীর হয়ে গেল, চলতে চলতে বলল, “আমার শেষ কথা।
আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, হে স্বহৃদে, আর কেন? তোমার মায়াতে
আচ্ছন্ন এই পৃথিবী থেকে এবার আমাকে বিদায় নিতে দাও”—

স্ববেশ ভদ্রলোকটি হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাল, দামোদরকে গল্প
করতে দেখে গর্জে উঠল, “শালা স্ত্রীরের বাচ্চা, মোট বইবি না গল্প
করবি রে তুই!”—

দামোদর বিষণ্ণ ভাবে হাসল, “চলি ভাই”—

অবিন্দম দাঁড়াল, বলল, “আচ্ছা”—

টলতে টলতে এগিয়ে গেল দামোদর। বেশ বোঝা গেল যে
অসুস্থ শরীরে ভারী বোঝা নিয়ে চলতে তার বীতিমত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু
উপায় নেই সভ্য মানুষে-ভরা আজবনগরে তার উপায় নেই। এখানে
সভ্যতা মানে একাকীত্ব, সভ্যতা মানে অনিশ্চয়তা, সভ্যতা মানে অরণ্যের
আইন। মুষ্টিমেয় লোভীর দর্শন আজ সভ্যতাকে বর্করয়ুগের কবরে নিয়ে
যাচ্ছে। ভেঙ্গে ফেলো, আগ্নেয়গিরির মত কটে পড়ে শোষণের পাহাড়কে
চূর্ণকার করো—কার্ট্রের মত বনস্পতিদের কেটে কেটে পথ করো—

বারান্দার উঠেই ধমকে দাঁড়াল অরিন্দম। বাড়ীর ভেতরে টেচামেচি হচ্ছে। ঝগড়া। ভেতরের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল—অরিন্দম তাকাল। সবাই আছে ঘরের ভেতর এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত হয়েছে মুকুন্দ এবং বলরাম।

মুকুন্দ বলল, “নেই,—একটা পয়সাও নেই আমার কাছে”—

বলরাম বলল, “নেই তো ধার করে নিয়ে আয়”—

“ধার দেবার কেউ নেই আমার”—

“তাহলে সংসার চলবে কি করে? মদ খাবাব পয়সা জোটাতে পারিস আর সংসার চালাতে পারিস না!”

“আমি জানিনা—যখন চলবে না তখন মরবে সবাই”—

দুর্গাবতী শিউরে বলল, “মুকুন্দ—ছিঃ”—

বলরাম লাফিয়ে উঠল, “মরবে! কেন? লজ্জা লাগে না তোর ও কথা বলতে—বুড়ো মা বাপ আর ভাই বোনদের তুই মরতে বলছিস?”

“বলছি। বাচবার ক্ষমতা না থাকলে মরবে বৈকি”—

“বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস হতভাগা! নেতা হয়েছিস!”

“নেতা হতে যাব কোন ভুঞ্জে? সে তো চোর বাটপাড়দের ব্যাপার—যা সত্যি তাই বলছি”—

“আবার বড় বুলি—ব্যাটা বেহায়া কোথাকার”—

“গাল দিও না বাবা”—

“দেব—একশ বার দেব, হাজারবার দেব”—

“দাও তবে—প্রাণভরে দাও”—

তন্থন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মুকুন্দ। অরিন্দম একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, মুকুন্দ গলির অন্ধকারে নেমে গেল।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত বলরাম গর্জাতে লাগল, “শুনলি? তোরা

সবই স্তনলি। মদ গেলার পরমা ওর ঠিকই জুটবে শুধু সংসারের দ্বন্দ্বলোভে
তা জোটেনা—হতভাগা নির্লজ্জ বেহাগা”—

চার বছরের ছেলেটা কাতরকণ্ঠে বলে উঠল, “অমন চোঁচাচ্ছ কেন
বাবা—ও বাবা?”

“চো—প্—”

ছেলেটাকে ঠাস করে একটা চড় মারল বলরাম। মুহূর্তে তীক্ষ্ণ ও
একটানা কান্নার শব্দে গলিটা পর্যন্ত সচকিত ও মুখর হয়ে উঠল।

“চোপ্—ফের কান্দলে এবার মাথাই ভেঙ্গে ফেলব আমি—চোপ্—”

দুর্গাবতী স্বামীকে ভৎসনা করে বলল, “জি—তোমার কী মাথা
ধারাপ হল নাকি!”

বলরাম থামল। হঠাৎ যেন তার মাথার রক্ত দ্রুত নীচে নেমে গেল,
দ্বন্দ্ববোধকারী নিষ্ফল ক্রোধের বন্যটা হঠাৎ অন্তর্হিত হল। বিড় বিড় করে
সে বলল, “মাথা—ঠা, আমার মাথা ধারাপ হয়ে গেছে, ধারাপ হয়ে
যাচ্ছে”—

অরিন্দম সরে গেল সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে বসল। বলরাম,
দুর্গাবতী, অমিতা, ললিতা ও মুকুন্দ—সবার মুখেই সে অঙ্ককার দেখতে
পেয়েছে—সবার চোখেই অসহায় আকুলতা। নীচুপাড়ার গলির মত
বাড়ীটাও ক্রমে ধমধমে হয়ে উঠছে।

প্রদীপটাকে জ্বালাল অরিন্দম, ঘরের অঙ্ককার পুড়ে গেল। চূপ করে
বসে রইল সে। ক্লান্তি, গভীর ক্লান্তি। প্রদীপটা জ্বলছে, সলতেটা
পুড়ছে, একটি একটি করে মুহূর্ত কাটছে। কে যেন পেছনে দাঁড়িয়ে
আছে! অরিন্দম পেছন ফিরে তাকাল।

দরজার গোড়ায় অমিতা। নিম্পলকনেত্রে তাকে দেখছে। একটি
মুহূর্ত। তারপরেই হঠাৎ ক্ষিপ্ৰপদে চলে গেল সে দুঃখের ঢেউ এসে
অরিন্দমের মনের মধ্যে আঘাত করল। কামনার আঙনে পুড়ে যাচ্ছে
অমিতা।

পদসব।

সরসার গোড়ায় ললিতা এসে দাঁড়াল। কান্দী-কালো চোখে তার
বিম্ব অন্ধকার।

“ললিতা” —

“কি?”

“মুন্সি রাগ করে চলে গেল?”

“হ্যাঁ”—

“কেন?”

“কগড়া—রাগারাগি”—

“কগড়া কেন? টাকার জন্ত?”

“হ্যাঁ। সংসার অচল হয়ে উঠেছে”—

“হু”—

অবিন্দম চূপ করল। দাও-দাও—কোটি কোটি লোকের প্রার্থনা—
আমাকে বাঁচতে দাও। টাকাই প্রাণ। প্রাণই টাকা।

নিজের মনে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ললিতা বলে চলল, “এই তো সব
শুধু, আরো তো কত দিন পড়ে আছে। দারিদ্র এইভাবেই মানুষকে
নীচ করে তোলে, কলহ আর ঘৃণার সৃষ্টি করে, সংসারকে ভেঙ্গে টুকরো
টুকরো করে দেয়”—

“কিন্তু কেন? কলহ আর ঘৃণা কেন?”

“এর জবাব নেই। শুধু এই বলতে পারি যে দারিদ্রের বিষ
মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, মায়া মমতা, সব কিছুকেই বিষাক্ত করে তোলে।
মাবাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মধুর
সম্পর্কেও তা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করে—দারিদ্র বড় বিয়োগান্ত
অবস্থা”—

নিস্তরুতা।

প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে।

ললিতার মুখে বিবর অঙ্ককার।

বাইরের গলিটা ভারী নিঃশব্দ।

নিস্তব্ধতা।

“খেতে চল”—ললিতা ডাকল।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, “চল”—

খাওয়া দাওয়ার পালা চুকল একে একে।

অরিন্দম ভেগে বইল মুকুন্দের জন্ত। লোকটা কত রাতে কিয়বে
কে জানে। কোন শব্দ নেই। বাড়ীর সবাই বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।
রাত কত? জানালাতে একফালি আকাশের ছবি, তাতে তারার চুমকি
বসানো। আকাশে ক’টা তারা?

রাত বাড়ে।

ছোটখাটো কত রকমের শব্দ শোনা যায়। রাতের অশ্রুট নদীতের
মত। ঘাঝে মাঝে অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকে, বেড়ালেরা ঝগড়া
করে, ইঁদুরেরা দাঁতে দাঁত ঘষে।

রাত বাড়ে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের শিখাটা থরথর করে কাঁপে। রাত।
আরো কত রাত কেটেছে, দিন কেটেছে। কোটি কোটি দিনরাত। কাল-
পর্যন্ত—তার আগে—তার আগে—অনেক হাজার বছর আগেও মানুষ
ছিল। কেমন ছিল তারা? তাদেরও কি এমনি দুঃখ দুর্দশার দিন কাটত?

অনেক দূরে—হয়ত নগররক্ষীদের কোন আড্ডা থেকে ঘণ্টার
আওয়াজ ভেসে এল। প্রহর-ঘোষণা। ক’টা? একটা-দুটো—রূপসী
নদীর পারে, সেই মনিময় কক্ষে কি এখন বেহাগের আলাপ শুরু হয়েছে?
ঘুম আসবে। প্রদীপের শিখাটা যেন ক’টা আলোক-বাম্পের আকার
ধারণ করে তার চেতনা পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিল। সে যেন ভেসে চলেছে—
দূরে—বহুদূরে—কে?

পদশব্দ। ফিস্‌ফিস্‌ কথাবার্তার আওয়াজ। কে? অরিন্দম চোখ
মেলল। প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে।

একি জার শোনার ভুল? অরিন্দম কান নাড়ল। না, ভুল নয়।
বাইরে কারা যেন কথা বলছে। চাশা কণ্ঠে। কে? চোর? খুনী?

হুঁ গিয়ে প্রাণীপটাকে নিভিয়ে দিল অরিন্দম। অন্ধকার। নিঃশব্দ।
হয়ে বসে রইল সে কয়েকমুহূর্ত। না, চোর নয়, খুনী নয়। আর কেউ।
অন্ধকার। উদ্ভাসের একটা ঢেউ আসছে ঘরের ভেতর। কি ব্যাপার?
অরিন্দম পা টিপে টিপে বারান্দায় গেল।

কেউ নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অথচ সেই ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অরিন্দম এগোল।

বাইরের ঘরের দেয়ালের ধারে, গলির পাশে দুটি ছায়া। অরিন্দম
দাঁড়াল, সতর্ক ভাবে উকি মারল। একটি পুরুষমূর্তি, অপরাট নারীমূর্তি।
পুরুষটি নারীর হাত ধরে কি যেন বলল।

নারীমূর্তি মাথা নাড়ল বলল, “না”—হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে
চাইল সে।

পুরুষমূর্তি নারীটিকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরল, বুকের দিকে আকর্ষণ করে
কম্পিত কণ্ঠে বলল, “আজ—আজ”—

নারীমূর্তি পুরুষটিকে ঠেলবার চেষ্টা করে বলল, “না—না”—

পুরুষমূর্তি নারীমূর্তিটিকে আরো নিবিড়ভাবে বেঁটন করে বলল,
“হ্যাঁ”—

“না—আমি চেষ্টাব—ছাড়ো”—

পুরুষমূর্তি ছেড়ে দিল নারীমূর্তিকে।

শালুয়ায়িতকুন্তলা, অসমৃদ্ধবসনা সেই নারীমূর্তিকে অরিন্দম চিনল।
সে অমিতা। অরিন্দম ক্রতপদে ঘরে ফিরে গেল। অন্ধকার। স্থির
হয়ে দাঁড়াল সে দরজার গোড়ায়। অমিতা ফিরে আসছে। অন্ধকারে
গা মিলিয়ে দাঁড়াল অরিন্দম।

অরিন্দমের দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল অমিতা, তাকাল

ঘরের দিকে, এগিয়ে এস একশা। উত্তেজনায় তার বুক ফুলে ফুলে উঠেছে।
কণকাল সে অলস চোখ মেলে তাকাল ঘরের দিকে, তারপর ইতস্তত
অলিঙ্গনে ভেতরের দিকে চলে গেল।

ডাক্তার দরজাটাকে ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল অরিন্দম।
অমিতার অন্ধকার কামনা আর সেই পুরুষটির অধীর আমন্ত্রণ। আদিম
জৈবিক চেতনা। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শিউরে ওঠে
অরিন্দম। প্রেমহীন কামনা, আত্মাহীন ভালবাসা! নিছক মাংসাহুভূতির
উদ্ভাপ। ছিঃ। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঘৃণা করলেও পরিভ্রাণ নেই,
নরনারীর কাম-মুতি মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। দূরে যাও শয়তান।
আমার নারী আছে। ললিতা। পদ্মের মত, কোকিলের ডাকের
মত, সূর্যোদয়ের আলোর মত। কিন্তু কেন? অমিতা এমন করে
কেন? এও কি সমাজ-ব্যবস্থা? না, ভাবতে পারছি না। ই্যা। সবাই
কীতদাস। দুষ্ট সমাজ-প্রবৃত্ত সংস্কারের কীতদাস পুরুষ আর পুরুষের
কীতদাসী নারী। কেউ মুক্ত নয়। ভাঙো—। অন্ধকার। নিঃশব্দ
অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার। অন্ধকার আকাশে তারার চুম্বকি।
কবরের অন্ধকারে ঢাকা নীচুপাড়া। কিন্তু উঁচুপাড়ায় আলো,
কোলাহল, উদ্‌যমতা। ভাঙো। প্রদীপ নিভে গেছে—একটা কালো
বাষ্পের কুণ্ডলী তাকে গ্রাস করছে, তার চেতনায় প্রবাহিত হচ্ছে—
সে ভেসে চলেছে। রাতের কোন গ্রহর? কেন সে ভগবানকে
ডেকেছিল তখন? ঈশ্বর কে? ও কার হাত, কাদের হাত! দাও-দাও
দাও—সমস্ত পৃথিবী যেন ক্ষুধার্ত, ভীত, ত্রস্ত। তার কোটি কোটি হাত
আর একটি প্রার্থনা—দাও দাও, জীবন দাও—। কিন্তু প্রার্থনা কেন?
কেন এই ডয়? লোভীর রাজত্ব মাংসকে অমাংস করছে—ভাঙো—
কালো তুলো হাওয়ায় উড়ছে—কোন গ্রহর? সেই মনিষ্য কক্ষে এখন
রাগ পঞ্চম না হিঙোলের আলাপ হচ্ছে? কোন তাল? কে নাচে?
ত্রিমিকি ত্রিমি ত্রিনি—আপেলের মত গাল, খেত পদ্মের মত শুনফুল,

স্বপ্নটক সজ্জের মত যুগল উক—ত্রিমিকি ত্রিমি—কে! তাই নয় ভিঝারিনী
 যুঝী! ললিতা! ললিতা ভিক্ষে চাইছে! লোভীর রাজহ। তাই ঘুণা,
 কলহ, নীচতা! তাই ভালবাসা হয় ঘুণা, স্নেহ হয় ক্রোধ, বন্ধুত্ব হয়
 শত্রুতা—ত্রিমিকি ত্রিমি—কে! অসিধারী প্রহরী! হ্যা—আমি
 জেগে আছি, আমি ভুলিনি, আমার শপথকে ভুলিনি! ডয় নেই,
 আমি ঘুমোলেও জেগে থাকি—কারণ আমার অন্তরে তো তুমিই জেগে
 আছো—ত্রিমিকি ত্রিমি—আমি প্রস্তুত হয়ে আছি প্রহরী-ই-ই, শুধু
 তোমার আহ্বানের অপেক্ষায় আছি-ই-ই-ই—

দিন সাতেকবাদে একটা কাণ্ড হল। রাতের বেলা।

অরিন্দমের মাথা দিনরাত গরম থাকে। সারাক্ষণই একটিমাত্র
 চিন্তা তাকে দহন করছে—কি করে সে পৃথিবী থেকে অন্তত শক্তিকে
 দূর করবে। বই পড়ে আজবনগরের মানুষদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন
 করা, যন্ত্রণানবের দাসত্ব করা ও মানুষের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো—এই তার
 প্রতিদিনকার কুমস্থচী।

সেদিনও রাত করে বাড়ী ফিরল অরিন্দম। গাওদাদা ওয়ার পর
 বিছনায় শুয়ে ভাবতে লাগল। আজবনগরের অবস্থা ক্রমেই অবনতির
 দিকে যাচ্ছে। মালিক প্রভুরা সজ্জের আবেদনে এখনো পর্যন্ত কোন
 সাড়া দেয় নাই। বেকারের সংখ্যাও সমানে বেড়ে চলেছে, অগনন
 অসহায় মানুষ দীতে দীত চেপে সজ্জের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রতীক্ষা
 করছে। ব্যাধি অজ্ঞতা অভাব অকালমৃত্যু হিংসা দ্বেষ তাদের মধ্যে
 বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। একদিন, হঠাৎ একদিন ফেটে পড়বে
 তারা, আজবনগরকে কাগিরে তুলবে, বলিষ্ঠ যোয্যায় তারা দ্রাতাসকে
 চকল করবে। কবে? কখন কে?

রাত হয়েছে। কাজ সেয়ে সবাই শুয়ে পড়ছে বাড়ীকান্না
অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেছে। মনেও অন্ধকার। অন্ধকারে পথ
হারিয়েছে সবাই। ভয় নেই, পথ আছে। পথ এক—সিংহের বক্ত
নির্ভয় হও।

রাত কত ? আকাশের তারা আজ দেখা যায় না। আকাশে মেঘ
জমেছে। নিঃশব্দ ও বিছাৎ-গর্ভ মেঘ। বাইরেও অন্ধকার—তার
মাঝে মাঝে বিবর্ণ বাষ্পীয় আলো। ইত্থরেরা নরনার আনাচে কানাচে
ঘুরছে, পঙ্কিল গলিত লোভের গান গাইছে, দাঁতে দাঁতে সোজাসে শান
দিচ্ছে। সবাই কি ঘুমিয়েছে ? নীচুপাড়ার চোখে কি ঘুম আসতে পারে ?
গভীর নিশ্চিন্ত ঘুম ?

রাত অনেক। অনেক দূর থেকে গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছে।
উঁচুপাড়ার বিলাসমন্ড নরনারীর হাসি, গান, কোলাহল আর চীৎকার।
রক্তমাংসের স্বাদে বিভোর নিশাচর জন্তুদের বহুদূরগত ডাকের মত।
অন্ধকার। একটা ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ, আরো ঢেউ। ঘুম আসছে—

কে ?

কে যেন তার পাশে এসে বসেছে ! ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার—
প্রথর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-কালীন গরম বাতাসের মত সেই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এসে
পড়ছে তার মুখের ওপর। কে !

অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেল তাকাল অরিন্দম। তার পাশে একটি
নারীমূর্তি !

সে প্রশ্ন করল, “কে !”

সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীমূর্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, উন্নত আবেগে
জড়িয়ে ধরল তাকে, দুটো উত্তপ্ত গুঠের ছাপ একে দিতে লাগল তার
চোখে, নুখে, কণ্ঠে।

অরিন্দম বুঝতে পারল, বুঝে কঠিন হয়ে বলল সে, “যান—চলে যান
শিগগীর”—

উদ্বেষিত-চাপা কণ্ঠস্বর কান্নার মত শুনিত হল, “না—না”—

“হ্যা—হ্যা—”

“না—”

দুটি কোমল বাহর নিবিড় নিশীড়ন, দুটি কচলব আঁচর্য কোমল
দুটি চোঁটের তৃষ্ণার্ত স্বাদ-গ্রহণ। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বুকের গুঠা
নাশা, অনঙ্গ কামজ ঘোষণা।

“তুমি আমার—তুমি আমার”—

“উঠুন—সরে যান”—

“আমার জীবনকে সাধুক করো তুমি—আমাকে ভালবাসো”—

“আমি হুঁজনকে ভালবাসতে পারি না—আপনি যান—”

“আমার পশুকে তুমি তৃপ্ত করো—অন্ধকার রাত, সবাই ঘুমোচ্ছে,
কেউ কিছু জানবে না”—

“না।”

“আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব।”

“না।”

“না!” আরো কঠিন হয়ে উঠল সেই দুটো বাহর আলিঙ্গন। যেন
ভূজ-লতা! আর কী উদ্ভাপ! দেহ যেন পুড়ে যেতে চাইছে।

“না!” দাঁতে দাঁত চেপে যেন একটি উন্মাদিনী কথা বলল, “কিন্তু
আমি ছাড়ব না তোমাকে—ছাড়লে আমি ভেসে যাব—আমার সর্বনাশ
হবে”—

অবিলম্ব এবার ক্ষেপে গেল। লোহার মত শক্ত দুটো হাত দিয়ে
সে ঠেলে দিল সেই উন্মাদিনীকে, কঠিনকণ্ঠে বলল, “না! বলছি—নইলে
আমি সবাইকে ডেকে তুলব”—

“এই তোমার পৌরুষ!” অন্ধকারে কান্না শোনা গেল।

অবিলম্ব কেটে কেটে বলল, “যে কোন নারীমানুষ নিয়ে মত্ত
হুঁজুকে পৌরুষ বলে না”—

“বটে।”

“হ্যাঁ—

“তুমি—তুমি—আমি তোমাকে ধ্বংস করি”—

হিংস্র সপিনীর কোঁদ কোঁদানির মত শোনাতে কথাকলো, উগ্র
বিষে-ভরা প্রতিটি কথা। অন্ধকারের মধ্যেও যেন দু’টি অগ্নিময় চোখের
তারাকে জ্বলতে দেখা গেল। তারপরেই পদশব্দ শোনা গেল, তা
বাইরে মিলিয়ে গেল।

অন্ধকার। আর ঘরটা যেন গরম বাষ্পে ভরপুর। দেহের অন্ধরালে
রক্তের সমুদ্র যেন হলে হলে উঠছে, ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছে, সর্বাঙ্গ
কাঁপছে। অন্ধকার। অন্ধকার যেন রক্ত, মাংস আর উত্তাপ হয়ে
এসেছিল।

অসহ্য এই অন্ধকার।

হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা বের করল অরিন্দম, প্রদীপটা জ্বালল।
আঃ—আলো। অন্ধকারের শত্রু।

কিন্তু তবু স্বস্থতা আসে না। অশুচি। ঠোট জ্বলছে, বুক জ্বলছে,
সারা দেহটা জ্বলছে। তার সর্বাঙ্গে যেন রক্ত আর পঙ্কু লেগেছে।

ঘরের কোণে একটা ঘটিতে জল রেখে গেছে ললিতা। সেই জল
নিরে অরিন্দম মুখ ধুতে বসল। আঃ, কী ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ, কী
পবিত্র।

কিন্তু তবু গরম লাগে। মনে পড়ে। দুটি বাহ, দুটি ঠোট আর
দুটি হৃদয়ের স্পর্শ। আশ্চর্য। তার মনের নিভৃত্তে একটা পক্ষ যেন সেই
স্পর্শের স্মৃতিকে লেহন করছে। হিঃ—

জল নিয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত করল অরিন্দম। পালাও শয়তান, অন্ধকার
দূরে যাও। ললিতা আমার নারী। আমার কবিতা। আমার
জীবনের মূর্তিমতী ছন্দ। পালাও কাম-কামনা—আমাকে পবিত্র হতে
দাও। হে আমার আত্মা—তোমার পাবকশিথাকে তুমি ছড়িয়ে দাও

আমায় আরও অধিক—আমাকে গুরু বরো—। অমিতা, তুমি বড়
ছাশিনী, বড় হতভাগী—

সকালবেলা মুকুন্দের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

“অরিন্দম—অরিন্দম”—

“উ?” অরিন্দম উঠে বসল।

মুকুন্দের চোখে মুখে “উত্তেজন; আর উদ্বেগের ছায়া, অরিন্দম চোখ
মেলতেই সে ব্যাণ্ডুলভাব গ্রহণ করল, “অমিতাকে দেখেছ অরিন্দম?
অমিতাকে?”

“কেন? কি হয়েছে?” অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। মুহূর্তে
গত রাতের সমস্ত কথা তার মনে পড়ে গেল। কি হয়েছে অমিতার?

“অমিতাকে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ীতে—ছোট্ট একটা টিনের বাস
আর কিছু কাপড় জামা হয়ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তুমি তাকে
দেখেছ অরিন্দম?”

“দেখেছিলাম একবার—কাল রাতে—তারপর আর কিছু জানিনা।”

“হু”—

ভেতরের ঘর থেকে দুর্গাবতীর ক্ষীণ কান্না শোনা গেল।

“আমার কপালে এই দুঃখ ছিল—মাগো”—

মুকুন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভেতরের দিকে। অরিন্দম তাকে
অনুসরণ করল।

ভেতরের ঘরে বলরাম পায়চারী করছিল। দুর্গাবতী মেঝের
ওপর বসে একটানা বিড়বিড় করে কাঁদছিল, বাচ্চারা একটা কোণে
গিয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল আর একটা বাচ্চের ওপর প্রস্তরমূর্তির মত
বসে ছিল ললিতা।

মুকুন্দ বলল, “আমি বাইরে যাচ্ছি—এদিক গিয়ে একদিকে
দেখে আসি”—

জবাব দিল না কেউ। মুকুন্দ বেরিয়ে গেল।

বলরাম ঘুরে দাঁড়াল। তার দু'চোখে বিভ্রান্ত চাহনি। সে
অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, “কিছুই হল না। ছোটবেলা
থেকে স্বপ্ন দেখেছি—স্বপ্ন আর শান্তিতে ভরা ঘর, সংসার, সমাজ আর
পৃথিবী। ভেবেছি যে দারিদ্র কিছু নয়—শান্তি আমার নিজের গুণ
নির্ভর করে—কিন্তু না, সব মিথো। সব ভেঙ্গে গেল”—

দুর্গাবতীর বিলাপ শোনা গেল, “এই ছিল, হতভাগীর মনে
এই ছিল! ভগবান”—

অরিন্দম শব্দ হয়ে উঠল। ভগবান! কে ভগবান? সে কি
চতুরঙ্গাল?

নিশ্চয়ত।

বলরাম বলল, “পাপে আর হিংসায় পৃথিবী ভরে গেছে—এবার
ধ্বংস হবে সব কিছু। লোভ আর লালসাকে জয় করতে পারে না
যারা—তার। ধ্বংস হবে”—

দুর্গাবতীর কণ্ঠ, “বিধবা মাতৃষ, লোকে শুনলে বলবে কি—ছিঃ—
লজ্জায় যে মাথা কাটা গেল গো”—

বলরাম লাফিয়ে উঠল, “চুপ করো—চো-প্—। মরে গেছে,
মনে করে! যে তোমার এক মেয়ে মরে গেছে। ভালোই হয়েছে—
একজনের খোঁরাক কমল”—

বলরামকে ক্ষিপ্ত বলে মনে হল। অন্ধ-ঘরটার মধ্যে যেন অস্বস্ততার
ভারী বাতাস। কষ্ট হয়। অরিন্দম বেরোল।

বারান্দার যেতেই পেছন থেকে ললিতার ডাক শোনা গেল।

“শোন”—

অরিন্দম দাঁড়াল।

“কোথায় থাক?”

“তোমার দিকিকে খুঁজতে”—

“ও?”

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। এই তার নারী—তার
পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা। হ্যাঁ, ললিতাকে সে জানাবে সব কিছু।
সব কথা।

“ললিতা”—

“কি?”

“তোমার দিদি কালরাতে আমার ঘরে এসেছিল”—

ললিতা মুখ নীচু করল, বলল, “তারপর?”

“সে তখন উন্মাদিনী—কিন্তু তবু তাকে আমি পরাক্রান্ত করেছি।”

“তুমি আমার গবের বস্ত্র।

আশ্চর্য প্রশান্তি তার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে তার
বিস্কৃত গ্রহরী-হৃদয়ে।

“পরশু মাঝ রাত্রেও আমি তাকে দেখেছিলাম ললিতা—একটি
পুরুষ এসেছিল বাইরে”—

ললিতা মুখ তুলল। তার হুঁচোখে জলের ছায়া। অরিন্দমের
দিকে ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলল, “তুমি যাও—দিদিকে
একবার খুঁজে দেখো। আর শোন”—

“কি?”

“দিদিকে ঘৃণা করো না—সে বড় দুঃখিনী”—

অরিন্দম একপা কাছে এগিয়ে এল, মুহূর্তে বলল, “স্বার্থপরের
সমাজে, শোষণের রাজ্যে নারী যে চিরদিনই পুরুষের ক্রীতদাসী এবং
তাই বিধবারা বিবাহযোগ্য হলেও তাদের যে কামনার ওপর পাথর
চাপাতে হয়, পবিত্রতার নামে অসুস্থতাকে বরণ করতে হয় আমি তা

জানি ললিতা এবং জানি বলেই—বিশ্বাস করো—আমি তোমার
দিকিকে ঘুরা করিনা।”

ললিতার হুঁচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। নিশেধতা। ললিতা
কাঁদছে। সমস্ত অন্তরটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে।

“ললিতা—”

“হ্যাঁ, তুমি যাও।”

অরিন্দম বেয়েল সোথান থেকে। ক্যান্টেরীতে শরীর অসুস্থ বলে
দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল অরিন্দম।
যদি হঠাৎ অমিতার দেখা পাওয়া যায়! কে জানে।

কত পথ, কত রাস্তা, কত গলি দিয়ে হাটল অরিন্দম। ক্রমে
মাথার ওপর উঠলেন সূর্যদেব। কতবার থামল অরিন্দম, কতবার
জিরোল, কতবার চলল। দিনাস্ত হল। রাত এল। অবশেষে
নীচুপাড়ার প্রাণহীন গলি দিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল।

নিশেধ বাড়ীটা। যেন কারোর মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন।

সবাই বাড়ীতে আছে। মুকুন্দ, বলরাম, ললিতা, তুর্গাবতী,
বাক্কার। শুধু নেই একজন। সে যেন মরে গেছে। অমিতা।

সবাই তাকাল তার দিকে।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, ক্লান্তকণ্ঠে বলল, “না—কোথাও তার ছায়া
পর্বত দেখতে পেলাম না।”

নিশেধতা।

অরিন্দম তাকাল মুকুন্দের দিকে, প্রশ্ন করল, “তুমি?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “না। তবে একটা খোজ পেয়েছি।”

“কি?”

“পাশের মন্দিরের ছোকরা পুরোহিত মাধব রায়েয় সঙ্গে পালিয়েছে
অমিতা—ভোররাত্রে একজন লোক তাদের ছজনকে এক ঝাঁক
দেখেছিল।”

হঠাৎ বলবার উঠে পাড়াল, ছুঁচোখ বড় করে বলল, “মিথ্যে কথা—কেউ দেখেনি থাকে—কেউ না। আসল কথাটা তোমরা কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি। জনবে তা কি? শোন, কান পেতে শোন—অমিতা মারা গেছে—পাপ করে কেউ বেঁচে থাকে না—”

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ঘরের ভেতর শুকনো নেমে এল। স্বপ্নভীর, থমথমে শুকনো। মৃত্যুর মত।

নীচুপাড়ার শব্দহীন, কলহাস্তহীন ও আঁকারাবাকা গলির ওপর যখন সূর্যদেবের রাঙা আলো এসে পদার্পণ করল তখন অরিন্দম জাগ্রত। রাতে তার ঘুম ভালো হয়নি। লাল টকটকে চোখ মেলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে নীচুপাড়ার জীবনস্রোত দিনের পর দিন মহুগ হয়ে আসছে, ঝরে যাচ্ছে। নীল আকাশের স্বর্ণ-তোরণে সূর্যদেব এসে ছাড়িয়েছেন, বৃষ্টির মত লাল টকটকে তাঁর লাল আলোর জীবনীশক্তিকে অরুপণভাবে বিতরণ করছেন—তবু নীচুপাড়ার তেলেনেয়েরা হাসেনা, গায়না, অকারণ চীৎকার করেনা। তারা শঙ্কিত, মজ্জস্ত। তাদের গুরুজনেরা—যুবক ও বৃদ্ধেরা—বৃষ্টির মত নৃত্যদেহে চলছে, চিন্তায় জর্জর ও বোবা হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়। শ্রীলোকের, কোলের শিশুদের, বাচ্চাদের। কিন্তু সে কান্নাও পরিমিত, ভীত, অতি ক্ষীণ।

আর ভাবছিল অরিন্দম। অমিতার কি হল? কি হবে? জীবনের কোন কুটিল স্রোতে ভেসে গেল সে, মাহুষের কোন দুর্গম জগতে হারিয়ে গেল?

“কি হল? জান করবে না—সময় যে হয়ে এল?”

ললিতা এসে তাগিদ দিল।

অদ্বৈতের চমক ভাবল, সে বলল, "হ্যাঁ, এই উঠে।" ললিতা—

"কি—"

"তোমার দ্বিধার বিষয়ে কি করবে?"

ললিতা বিষন্নভাবে হাসল, "কিইবা আর করার আছে? জীবন তারও কাটবে আমাদেরও কাটবে।"

"তাই বটে—"

চূপ করে ভাবতে লাগল অদ্বৈত। হ্যাঁ, তবু জীবন চলবে, দিন কাটবে।

"চোখ যে জ্বাঙ্কলের মত লাগ—ঘুমো গনি?"

"ভালো ঘুম আসেনি।

"কেন?"

"ভাবছিলাম—পৃথিবী থেকে পাপকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম করে আরম্ভ হবে?"

"সংগ্রাম তো করছই—"

"কোথায়?"

"পাপকে স্বীকার না করা মানেই তো এক বকমের সংগ্রাম।"

"মুখে 'পাপকে স্বীকার করি না' বলে নিঃশব্দ ও নিষ্ক্রিয় থাকাকে আমি সংগ্রাম বলি না—পাপের ওপর আঘাত হানাটাই আমার কাছে সংগ্রাম।"

"সে তো একদিনেই হবে না। বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোতে কি সময় লাগে না?"

"হুঁ—"

ভেঁ-ৎ-ৎ-ৎ-ৎ—ফাট্টরীর বাঁশীর শব্দটা দূর থেকে ভেসে এল। কর্কশ, একটান শব্দ।

"কারখানার বাঁশী বাজছে"—ললিতা বলল।

অবিন্দম হাসল, “বাঁধী! না। ও হচ্ছে দানবের হুংকার—ওর ডেউর
আছে আদেশ—বাঁধী প্রকুর হুংকার—”

ললিতা হাসল।

চান খাওয়া শেষ করে অবিন্দম বেরোল।

আঁকবাঁকা গলির মধ্যে নিরানন্দ জীবন-প্রবাহ। হ্যাঁ—বীজ থেকে
অঙ্কুরোদগমে সময় লাগে।

অশরীরী ছায়ায় মত মাহুষগুলো। নিঃশব্দে সহ্য করছে সব।
সব অত্যাচার, নিধাতন, অসাম্য। অসহ্য। কিন্তু না, সময় লাগবে,
সহ্য করতেই হবে। শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার আগে শৃঙ্খলকে ভাঙতে
হয়।

আবার সেই ফ্যাক্টরী। যন্ত্রদানবের গর্জন, ইস্পাতের সঙ্গে
ইস্পাতের আঘেয় সংঘাত রক্তের জলীয় নিধাস, তেলকালির কলক আর
ক্লান্ত হাড়ের মর্মস্র-বেদন।

মহা এল। সূর্যদেবের রথের চাকা রাঙা ধূলা উড়িয়ে পশ্চিম
দিগন্তের রাঙামাটির দেশকে অতিক্রম করল। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে
বিলুপ্ত আকাশের গা বেয়ে পাখীর দল এদিকে আর এদিকে শব্দে উড়ে
গেল। বিদ্রলী বাতির সারি রাতের অন্ধকারকে পরাজিত করে
উঁচুপাড়ায় দিবসালোকের সৃষ্টি করল। পরাজিত সেই অন্ধকার এসে
নীচুপাড়ায় জমা হল—সেই অন্ধকারকে গাঢ়তর করল মাহুষের মনের
অন্ধকার; গ্যাস আর প্রদীপের বিবর্ণ আলোতে সেই অন্ধকারে যেন
একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হল।

নীচুপাড়ার একপ্রান্ত দিয়ে অবিন্দম এগোল। কোথা যাবে সে?
বাড়ী? না। দেখা যাক, মাহুষদের দেখা যাক!

এগোল সে। তার হুঁচোখে অসংখ্যের ছায়া। তার হুঁকানে
কত কথা, কত কান্না, ক-ত দীর্ঘশ্বাস। তার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনা ও
জালা। তার মস্তিষ্কে লৌহ-কঠিন শপথ।

কোথায় গেল অমিতা? কি হল তার? তার মনের অনিবার্য
আগুনকে কে নেভাবে?

ক-ত লোক নীচুপাড়ায়! কত লোক আজবনগরে! বেহিসেবী
মাহুষের কী বেহিসেবী লালসা! স্বহৃতা নেই। সবাই অন্ধ, বঞ্ছ,
বোবা ও ব্যাধিগ্রস্ত। সবাই ভিক্ষুক।

ভান্ডো। ভান্ডতে গেলে মরতে হয়। দ্রক্তের রং কী লাল! সেই
নারীর কান্না। জীবন প্রেমের চেয়ে বড়! অসম্ভব। তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো। সিংহের মত নির্ভয় হও। কিন্তু মৃত্যু কি?

আজবনগরের শেষপ্রান্তে পৌঁছল অরিন্দম।

সেখানে অন্ধকার, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুঁড়েঘর আর আবর্জনার পাহাড়।
আরো এগিয়ে গেল অরিন্দম।

আকাশে মেঘের নিঃশব্দ জমায়েৎ। অন্ধকার গাঢ়তর। ক্লান্তদের
বিশ্রামের প্রার্থনা।

একটা বটগাছ। তার তলায় বসল অরিন্দম। আঃ, কী ঠাণ্ডা
পূর্বের বাতাস!

মনে পড়ে। ক'দিনের জীবন তার, অথচ ক-ত জ্ঞানলাভ করেছে
সে! দুঃখের জ্ঞান। মনে পড়ে। রূপসী নদীর তীরবর্তী সেই প্রাচীন
অট্টালিকার বাসিন্দা এক বৃড়োর কথা। সে বলেছিল মাহুষদের অবস্থার
কথা। তার কথা মিথ্যে নয়।

আজবনগরের বারো আনা মাহুষ যেখানে থাকে সেই নীচুপাড়ার
মাহুষদের কথা মনে পড়ে। সে কী বিয়োগোক্ত কথা! অসংখ্য মাহুষকে
গম্ভীর বিষন্ন মুখ তার চোখের সামনে ভাসে। ক-ত মুখ।

“তনছ—তনছ—তনছ—”

অরিন্দম চমকে উঠল। চাপা কণ্ঠস্বর। কে? কে? কে?

“তনছ—তনছ—তনছ—” আবার সেই কণ্ঠস্বর। একজন নয়, দু’জন নয়, অনেক লোকের সম্মিলিত একটি একক। বড়বলকারী মাহুসদের মত চাপা তাদের ডাক। প্রতিধ্বনির মত শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বারংবার ডাকে সেই কণ্ঠস্বর।

“কে?”

চারদিকে তাকাল অরিন্দম। কোথায়? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

“কে তোমরা? কোথায় তোমরা?” অরিন্দম প্রশ্ন করল।

চাপা কণ্ঠের হাসি শোনা গেল, “আমরা নেই—আমরা শুধু কণ্ঠস্বর—

“শুধু কণ্ঠস্বর?”

“হ্যাঁ—আমাদের রক্তমাংস আর হাড় মাটিতে মিশে গেছে কিন্তু কণ্ঠস্বর রয়ে গেছে—শোন শোন শোন—”

“কি?”

“আমরা জ্ঞান—আমারা দেখাই—তুমি দেখবে দেখবে দেখবে?”

“কি?”

“মাহুস অমানুষ হলে কি হয়? এসো—আজবনগরের অবস্থা কি হয়েছে দেখবে এসো—”

“কোথায় যাব?”

“আমাদের পেছন পেছন এসো—পেছন পেছন পেছন পেছন পেছন পেছন—”

“আজবনগরের অবস্থা কি হয়েছে?”

“নরক—নরক—নরক—”

“ওঃ—”

“এসো—”

অরিন্দম উঠল, বলল, “চল”—

কিস্কিন্স ডাক শোনা গেল, “এসো—এসো—এসো—”

চুপকে যেমন লোহা টানে, তেমনিভাবে সেই কণ্ঠস্বর টানতে লাগল অরিন্দমকে। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো সামনে। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার তার চারদিকে। পায়ে হোঁচট লাগে, চলতে ভয় লাগে, তবু এগোয় সে। ডাক শোনা যায়—এসো—এসো—এসো—

পায়ের নীচে যেন কাঁটা বিছানো রয়েছে। পায়ে তা বিধতে থাকে, পায়ের তলা ভিজে মনে হয়। বোধহয় ক্ষত দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

“পায়ে কাঁটা বিধছে আমার—শুনছ ?”—অরিন্দম বলল।

কণ্ঠস্বরের ঐকতান শোনা গেল, “শুনছি—শুনছি—বিধবেই তো। নরকের মালিকেরা মানুষের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে—ঘাতে তোমরা সেই পথের শেষে না পৌছোও, তাদের দুর্গকে না ভাঙতে পারো। এসো—এসো—এসো”—

কষ্ট হয়, তবু এগিয়ে চলল অরিন্দম। অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, দুর্গিরীক্ষ্য প্রাচীরের মত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিজেকে অশরীরী বলে মনে হয়, মনে হয় অরিন্দমের যেন দেহ নেই, সে-ও যেন শুধু একটা কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ পায়ের নীচেকার কটকাকীর্ণ পাথুরে পথটাকে উত্তপ্ত মনে হয়, অন্ধকারের মধ্যে দূরে একটা বাষ্পীয় ক্ষীণ আলোর বেশ দেখা যায়। আর শুক্লগতি ভারী বাতাসে ভাসে একটা বিরাট ঢাকের শব্দ ও সহস্র কণ্ঠের মুহূ বিলাপ-সঙ্গীত। যেন কেউ মারা গেছে আর হাজার হাজার লোকেরা চাপা গলায় সুর করে শো— প্রকাশ করছে।

“এসো—এসো—এসো—” কানের কাছে সেই পথপ্রদর্শক কণ্ঠস্বরের, সাদর আমন্ত্রণ, “এবার তুমি দেখতে পাবে—আজবনগরের রূপকে দেখতে পাবে পাবে পাবে—”

আরো এগোল অরিন্দম। সেই বাষ্পীয় আলোক বৃত্তটা ক্রমেই

বড় হল, বড় হল, আরো বড় হল। কিন্তু আলোর শক্তি নেই; তার অম্পট, আবছা আবছা আলো-আধারির মাঝখানে এবার অনেক কিছু দেখা গেল। নিকট-কালো পাথরের পাহাড় চারদিকে, অম্পট আকাশের দিকে তা মিলিয়ে গেছে। তার গায়ে লোহার কাঁটাওয়ালা ফনিমনমা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ পায়ের নীচেকার পাথরের পথটা এবার আগুনের মত গরম হয়ে উঠল, কালো পাহাড়ের গা থেকে উত্তাপের লকলকে পাংলা জিহ্বা বেরোত লাগল। সেই ঢাকের শব্দ এবার কর্ণভেদী হয়ে বুকের পন্দনকে চকিত ও দ্রুত করে তুলল। ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম্—ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্। আর শোনা গেল সেই ক্ষীণ শোক-সঙ্গীত—আঁ-আঁ-আহা—আঁ-আঁ-আহা—আঁ-আঁ-আহা। ঘোঁরাটে আকাশের গা থেকে পড়তে লাগল রক্তের বড় বড় ফোঁটা—টিপ্ টপ্—টপ্ টপ্ টপ্—টিপ্ টপ্—টিপ্ টপ্ টপ্। উত্তপ্ত পাথরের গায়ে সেই রক্ত পড়তেই তা সশব্দে শুকিয়ে যেতে লাগল—আর পাথরের গায়ে সেই রক্তের শুকনো দাগ লেখা হয়ে ফুটে উঠল—‘অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মাতৃস্ব হতে দাও—অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মাতৃস্ব হতে দাও—’। অট্টহাসি শোনা গেল চারদিকে। অদৃশ্য একদল দৈত্যের অট্টহাসি। হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ—হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ—। অসংখ্য লোমশ ও নখযুক্ত হাত হঠাৎ আকাশ থেকে বেরিয়ে এল, পাথরের ওপরকার সেই রক্তের লেখা মুছে দিল। হা হা—হাঃ হাঃ হাঃ।

সেই লোমশ ও নখযুক্ত হাতগুলোতে এবার হাঁড়ের চাবুক দেখা গেল, বাতাস কেটে গর্জে উঠল সেই চাবুকগুলো। আর সেই ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে ছায়াছবির মত দেখা গেল একটা মরুভূমির বিচীর্ণ অংশ—তার মধ্যে বড় বড় লোহার বাড়ী। সেই বাড়ীগুলোর মাঝখানে দ্বিজে একদারি নরনারী আসছে একটা বাড়ীর ফটকের সামনে।

ফটকটা বন্ধ। ফটকের ওপাশে শুপীকৃত চাল আর কয়েকজোড়া লোমশ হাত।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! সেই সারিবদ্ধ ককালসার নরনারীদের হাত পা ও মুখ আছে বটে কিন্তু ওপরের ঠোট থেকে মাথা নেই। আর প্রত্যেকের পায়ে আছে শেকলবাঁধ। চাবুকের শব্দ আর ঢাকের তালে তালে, লোমশ হাতের ইসারায় তারা একপা একপা করে এগোচ্ছে সেই বন্ধ ফটকের দিকে।

মৃতের পৃথিবী। একটিও ঘাসের গুচ্ছ নেই পাহাড়ের গায়ে, নেই এতটুকুও শ্রামের আভা। শুধু এখানে ওখানে লোহার কাটা ওয়াল ফনিমনসা গাছ।

তুঙ্গগতি ভারী বাতাসে হঠাৎ মুহূ আলোড়ন জাগল আর দুর্গন্ধ ভেসে এল। দুর্গন্ধ নয় যেন বিষবাপ। পৃথিবীর লমত পচা জিনিয়ের দুর্গন্ধ। তাতে অরিন্দমের দম বন্ধ হয়ে এল, প্রচণ্ড একটা বিবমিষায় সমস্ত পাকযন্ত্রটা উলটে বেরিয়ে আসতে চাইল। দুর্গন্ধ। পচা, গলিত মাংসের দুর্গন্ধ।

আর সেই একটানা, অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ বাজনা, হাসি, বিলাপ ও শব্দ :

ডুম্—ডুম্—ডুম্ ডুম্ ডুম্—

আঁ-আঁ—আহা—

টপ্, টপ্,—টপ্, টপ্, টপ্,—

হাহা—হাঃ হাঃ হাঃ—

সেই বন্ধ ফটকের সামনে এসে দাঁড়া' সারিটা। তারপরে আরম্ভ হল ঝুলাঠেলি। কুংসিং চীংকার আর গালিগালাজ।

“আ মব্—আমি আগে”—

“ওরে শালা—আমি আগে”—

“আমি আগে”—

“আমি”—

“আমি”—

চাবুকের শব্দ। সবাই সভয়ে থামল।

একজোড়া লোমশ হাত একমুঠো চাল দিল একজনকে। সে সরে গেল। আর একজন এগোল। একের পর এক সবাই এক মুঠো করে চাল নিয়ে আবার কিরে চলল। আর ঠিক সেই সময়েই একটা অজ্ঞগবের মত লম্বা জিভ তাদের মাঝার ওপর বাজের মত পাক খেতে লাগল আর মাঝে মাঝে বিচ্যংগতিতে নীচে নেমে এনে এক একজনের হাতের চালকে লেহন করে নিতে লাগল।

আর্তনাদ শোনা গেল—“একি! চাল গেল কোথায়?”

“চাল গেল কোথায়? চাল গেল কোথায়?”

আর্তনাদ।

“একি! চালের বদলে আমাদের পাখর দিয়েছে”—

“আমাদের পাখর দিয়েছে, পাখর দিয়েছে”—

আর্তনাদ।

সেই নিকব-কালো পাহাড়ের তলা থেকে যেন সহস্রকণ্ঠে ডাক শোনা গেল, “ভগবান—ভগবান”—

হঠাৎ ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, “খবদদার—খবদদার”—

সেই অদৃশ্য ঢাকের ওপর যেন আরো জোরে আঘাত পড়তে লাগল—

ডুম্-ডুম্-ডুম্-ডুম্-ডুম্—

তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত বিলাপ—জাঁ জাঁ—হাহা—জাঁ জাঁ—
হাহা—

আর সব কিছুকে ছাপিয়ে একদল লোকের তীক্ষ্ণ ও উত্তেজিত শব্দ শোনা গেল, “আমরা ধ্বংস করব—এ নরকে আমরা ধ্বংস করব”—

সেই সার্বিক মস্তকহীন নবনারীর দল স্থির হয়ে দাঁড়াল, পরস্পরকে

জড়িয়ে ধরে তারা সেই শব্দের দিকে দেহ বোঝাল, তারপর বলল উঠে,
“কিরে দাও, কিরে দাও, আমাদের মাথা কিরে দাও”—

“কিরে দাও, কিরে দাও”—

“আমাদের মাথা কিরে দাও”—

“কিরে দাও, কিরে দাও”—

আবার আকাশ থেকে সেই গর্জন শোনা গেল, “ববরদার—
ববদার”—

পায়ের নীচেকার পাখর আর পাহাড় এবার ফেটে গেল—চড় চড়
চড়াং—। আগুনের লকলকে শিখা বেরিয়ে এল সেই সব ফাটল থেকে।
বর্ষা ও তলোয়ার হাতে অসংখ্য লোমশ হাত সেই সব নরনারীদের
দিকে এগিয়ে এল, নির্দয় আঘাতে তাদের হাত পা কাটতে
সুস্থ করল। ঢাকের শব্দ বেড়ে গেল, বিলাপ বেড়ে গেল, দম্ব ও
গলিত নরমানুষের উৎকট দুর্গন্ধের মাঝে হিহি হাহা হাদির শব্দ শোনা
গেল।

“ববরদার—ববরদার”—

“হিহি—হাহা—হিহিহি”—

“ববরদার—ববরদার”—

“হিহি—হাহা—হিহিহি”—

হঠাৎ অরিন্দম দেখল যে অত্যাচারের জ্বালায় সেই সব নরনারীরা
নিজীব হয়ে পড়ল, তারা গিয়ে পাহাড়ের ধারে দাঁড়াল। সেখানে হাড়
আর মানুষের তৈরী একটা দুর্গকে দেখা গেল আর সেই দুর্গকে তারা
কাঁধে তুলে নিল। বিরাট সেই দুর্গ—হ্যাঁ উচ্চতা নির্ণয় করা গেল না,
ধোঁয়াটে ও অন্ধকার আকাশকে ভেদ করে কোথায় গিয়ে যে তা শেষ
হয়েছে তা বোঝা যায় না।

পাখুরে পথ আর পাহাড়ের ফাটল থেকে আরো আগুন বেরিয়ে
আসতে লাগল—আরো। অসহ্য উত্তাপ। অরিন্দমের চোখের সামনে

থেকে সবকিছুকে অদৃষ্ট করে দিয়ে একটা উন্নাদের মত বেন করতালি দিয়ে নাচতে লাগল সেই রসাতলের অগ্নিশিখা।

অরিন্দম আর হির থাকতে পারল না, ডাক দিল, “তুই—কণ্ঠস্বরবো?”

বহু কণ্ঠস্বর মেশানো সেই একটি কণ্ঠস্বর জবাব দিল, “তুই তুই—তুই—”

“এই অসংখ্য নরনারীর মাথা নেই কেন? কোথায় গেল তাদের মাথা?”

“ঐ হাড়ের দুর্গে—হাড়ের দুর্গে—দুর্গে—”

“ঐ দুর্গে? কারা নিয়েছে? কারা থাকে ঐ দুর্গে?”

“ঐ লোমশ হাত, জিভ, চাবুক, বর্শা, তলোয়ার আর ঢাকের মালিকেরা মালিকেরা মালিকেরা—”

“তারা কোথায়?”

ইঠাং আগুনের শিখা তিমিত হয়ে নিভে গেল। অরিন্দম তাকাল। ভস্ম, চারদিকে শুধু ভস্মের মরুভূমি। আর সেই ভস্মভূমির ভেতরে দিয়ে অর্ধ-মৃত হয়েও আগেকার সেই সব মৃতকহীন নরনারীর দল এগিয়ে চলেছে। তাদের কাঁধে সেই হাড়ের দুর্গের বোঝা।

অরিন্দম আবার প্রশ্ন করল, “কিন্তু চিরকালই কি এমনি ছিল? চিরকাল?”

কণ্ঠস্বর জবাব দিল, “ছিল ছিল ছিল—দেখবে?”

“হ্যা—”

অরিন্দম এগোতে লাগল। সেই মৃতকহীন শৃঙ্খলাবদ্ধ নরনারীদের পাশ দিয়ে দিয়ে। ইঠাং দম্কা হাওয়া বইতে লাগল, হাওয়ায় সেই বিস্তীর্ণ ভস্মরাশি শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে যেতে লাগল। পায়ে নীচেকার পাথরের ফাটল দিয়ে এবার অসংখ্য ঘোড়ার কঙ্কাল বেরিয়ে এল বিহ্বাংগতিতে। তাদের পিঠে মৃতকহীন কঙ্কাল, সেই সব কঙ্কালের

হাতে বর্শা আর তলোয়ার। পাথরের কাটল দিয়ে আরো মস্তকহীন কঙ্কাল বেয়িয়ে এল, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কঙ্কাল অথারোহীক সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালদের তাড়না করে নিয়ে চলল। তাদের অশ্বকুরের শব্দ, অট্টহাসি আর গর্জন শোনা গেল। শোনা গেল আর্তনাদ, বিলাপ আর প্রার্থনা—“অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, মাহুষ হতে দাও”—। শোনা গেল অসংখ্যের ব্যাকুল ডাক—“ভগবান—ভগবান” অতি ক্লীণ, অতি অস্পষ্ট সেই সব শব্দ। যেন হাজার হাজার মাইল দূরে আছে তারা। যেন মাটির কোন এক গভীর গর্ভে চাপা পড়ে আছে তারা।

আবার দম্কা হাওয়া এল। কঙ্কালেরা মিলিয়ে গেল।

কঠোর শোনা গেল, “দেখলে? অতীতকে দেখলে দেখলে দেখলে?”

অরিন্দম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “দেখলাম।”

“তাহলে এগিয়ে চলো—চলো চলো—এগিয়ে চলো—

“চলো—”

আগেকার সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধ মস্তকহীন নরনারীর মিছিল তখনও চলেছে। অদৃশ্য সেই ঢাকের তালে তালে। শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে আঘাত লাগে আর শব্দ ওঠে—ঝন্ ঝন্—ঝন্ ঝন্। বাতাসে ছুগন্ধ। চারদিকে অন্ধকারের চেয়েও মারাত্মক সেই ভৌতিক আলো, উত্তাপ আর উড়ন্ত ভস্ম।

“এগিয়ে এসো এসো এসো—”

“এগিয়ে চলো চলো চলো—”

হঠাৎ পাথরের বৃকে অরণ্য গঞ্জিয়ে উঠল। লোহার তৈরী বড় বড় গাছের অরণ্য। সেই সব গাছের ডালপালাগুলো এক একটা জীবন্ত অঙ্গণর। তাদের বিদ্রোহের মত জ্বিত লালসায় লকলক করছে। টপ টপ করে উগ্র বিষ চুইয়ে পড়ছে তা থেকে। সেই বিষে সিক্ত পাথরের ওপর দিয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে চলতে লাগল সেই সব মস্তকহীন

নয়নাখীর বল। তাদের পায়ের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে আবদ্ধ লাগে আবদ্ধ
শব্দ ৫৫—বন্ বন্—বন্ বন্—বন্ বন্—বন্ বন্।

সেই অজগন্ধ-অরণ্যের মাঝখানে হঠাৎ একদল মস্তকহীন নগ্ন নর্তকীর
আবির্ভাব ঘটল। অশ্লীল তাদের দেহভঙ্গী, কুংসিত তাদের সৌন্দর্য।
অমৃতহীন বিগুঢ় গুন, মাতৃহীন যোনিদেহ। তারা সেই অদৃশ্য ঢাকের
তালে তালে সেই সব মস্তকহীন নরনারীদের আকর্ষণ করতে লাগল।
অরণ্যদেশের অন্ধকার পাতালের দিকে। এসো। এসো—অনিবার
ইন্দ্রিয়ার অন্ধকার জগতে এসো এসো এসো—

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “এই সভা—স্বার্থপরের সভা—”

অবিন্দয় সভয়ে মাথা নাড়ল, “না না না”—

সেই সব মন্তবহীন নরনারীর দলও যেন তার কথার প্রতিধ্বনি
 তুলল, “না—না—না—”

তাদের ক্ষীণ প্রতিবাদের ওপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সেই একটানা
অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ বাজনা, হানি, বিলাপ ও শব্দ :

ডুম-ডুম—ডুম-ডুম-ডুম-ডুম—

ॐ-ॐ-आइ-ॐ-

টিপ্, টপ্—টপ্, টপ্, টপ্—

५१ ५१—५१: ५१: ५१:—

আর সেই নগ্ন নর্তকীদের উদ্যম অশ্লীল নৃত্য ।

आकाश प्रतिवाद करन मशकशीनेना—“ना ना ना—”

অরণ্যের ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, “খবরদার—খবরদার—”

সেই অদৃশ্য ঢাকের ওপর আরো ছোরে আঘাত পড়তে লাগল।
লোহার গাছের অজগর-শাখার বিছাতোর মত কুটিল ভিড় মেলে
গর্জতে লাগল। সেই সব গাছের অস্থকাল থেকে, অরণ্যের জমাট
অন্ধকার থেকে এবার হিংস্র স্থাপদের গর্জন শোনা গেল। হায়েনা,
শেয়াল, নেকড়ে, বাঘ, সিংহ আর কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন।

বিলাপের মত সেই একটানা শোকসঙ্গীত এবার আরো উচ্চ
পর্দায় চড়ল, “কেন? কেন আমাদের এই দুঃখ? কি পাপ করেছি
আমরা—মাহুব হয়েও মাহুবে মত কেন আমরা বাঁচতে পারি না?
আ—আ—আহা—”

“খবরদার—খবরদার—”

“না—না—না—”

“খবরদার—খবরদার—”

“কিরে দাও, কিরে দাও—আমাদের মাথা কিরে দাও—”

আর সব কিছুকে ছাপিয়ে একদল লোকের তীক্ষ্ণ ও উত্তেজিত শব্দ
শোনা গেল, “ধ্বংস করব—আমরা এ নরককে ধ্বংস করব—”

অরণ্যের ওপর থেকে সেই লোমণ ও নখবৃত্ত হাতগুলো নেমে এল।
দৈত্যের হাতের মত বিরাট দেগুলো। সেই সব হাতে ক্ষুরধার বর্ষা ও
তলোয়ার। রক্তপিপাসু জানোয়ারের মত সেই হাতগুলো হঠাৎ
মন্তকহীনদের আঘাত করতে শুরু করল। বুককাটা আর্তনাদে স্বর্গের
স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

অরণ্যের ওপর থেকে গর্জন শোনা গেল, “ওদের সব কিছু কেড়ে
নাও—অন্ন বস্ত্র—দ-ব—”

সেই নির্দয় হাতগুলো তাই করল, যার কাছে যে কদামা চাল ছিল
তা কেড়ে নিল। সেই নির্লজ্জ হাতগুলো তাই করল—প্রত্যেকের বস্ত্র
কেড়ে নিল।

মন্তকহীন বন্দীরা আর্তনাদ করে উঠল।

“না না, আমাদের অনাহারে মেরো না—”

“না না, আমাদের পুত্র মত নয় করো না—”

কোন কথাতেই থামল না সেই হাতগুলো। বর্ষা আর তলোয়ারের
বায়ে অনেকেই ধরাশায়ী হল, রক্ত গড়াল কটকাখোঁচ পাখুরে মাটির
ওপর দিয়ে। অরণ্যের মত লম্বা কয়েকটা দ্বিভ ওপর থেকে নেমে এল,

সেই রক্তের ধারাকে লেহন করতে লাগল। কিন্তু ক-ত রক্ত—লেহন করতেও কমল না জা।

একটা যুবতী কিছুতেই নয় হবে না। সেই লোমশ হাত তার মাড়ীকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

নয় নারীদেহ। স্থল্লর যৌবন-দৃশ্য। সেই হাত ইঠাং যুবতীর স্তনের ওপর নখ বসিয়ে দিল, তাকে পেষণ করতে লাগল।

আর্তনাদ। বিলাপের অন্তহীন তরঙ্গ।
দুর্গন্ধ। ইঠাং অরণ্যের ওপর খেলো কালো পাখরের পাহাড়ের
পা বেয়ে গলিত নরমাংসের ঢল নামল। তার মধ্যে সাদা সাদা মর্প-
মুখ কীটেরা। সেই সব কীটেরা এসে মৃত্যুহীন নয় লোকদের গায়ে
বসে রক্ত-শোষণ করতে লাগল।

সেই নিকষ-কালো পাহাড়ের গর্ভ থেকে যেন কাদের ডাক উঠত
হল, “ভগবান—ভগবান”—

“খবরদার—খবরদার”—

মৃত্যুকহীনেরা গর্জাল, “না না—অন্ন দাও”—

“খবরদার—খবরদার”—

“না না, বজ্র দাও”—

মৃত্যুকহীনেরা সেই গলিত মাংসের ঢল থেকে অঞ্চলি ভরে মাংস বুনে
নিয়ে খেতে শুরু করল। কেউবা নিজের হাত কচকচ করে কামড়ে
খেতে লাগল। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা।

এক টুকরো রুটি পড়ল-ওপর থেকে। সবাই তাপিয়ে পড়ল তার
ওপর। কে তা পেল তা বোঝা গেল না, শুধু এক মুহূর্তে তারা নিজের
মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল। নির্দয় হয়ে গেল তারা নিজের
ওপর। উন্নত হিংসায় তারা শিশুদের পাখরের-ওপর আছড়ে মারল,
নয় ও অসহায় নারীদের ধরে বলাংকার করতে লাগল। দুর্গন্ধ ভারী
বাতাস তাদের আর্ত কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

তাদের মধ্য থেকে একদল পালাতে শুরু করল। পালাতে ফিলে
১০৭ অরিন্দমের উপস্থিতি অস্বস্তি করে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন অরিন্দমকে স্পর্শ করে চীৎকার করে উঠল, “আমি আবিষ্কার
করেছি—মন্তক-যুক্ত লোক আছে আমাদের মধ্যে”—

বিস্মিত কোলাহল উঠল।

“আছে ? আছে ? আছে ?”

একজন মন্তকহীন এসে অরিন্দমের কানে কানে বলল, “আমি
বাঁচাও—তার পরিবর্তে আমি আমার বৌকে ভেট দেব তোমার কাছে”—

আর একজন এসে বলল, “আমার মেয়েকে চাই ? সে পরমা
সুন্দরী”—

আর একজন এসে বলল, “আমার দুবছরের ফুটফুটে বাচ্চাটাকে
বিক্রি করব—তুমি কিনবে ?”

অরিন্দম ভয় পেল।

সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “ভয় পেয়েছ ? তবে পালাও পালাও
পালাও”—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “কিন্তু এদের কি হবে ?”

“এরা দাসত্বের পাপ করেছে—তার ফলভোগ করবে করবে করবে”—

“না, আমি হাড়ের দুর্গে যাব—ধ্বংস করব ঐ লোমশ হাতের
মালিকদের”—

“তাহলে পাহাড় বেয়ে ওপরে যাও যাও যাও”—

অরিন্দম এগোল, পাহাড়ের ওপরে উঠতে গেল। কিন্তু কী খাড়া
পাহাড়, কি দুর্গম ! একটা শিলাখণ্ডে পা পিছলে সে হঠাৎ নীচে গড়িয়ে
পড়ল। প্রচণ্ড আঘাত লাগল তার। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সে থামল,
চোখ মেলেই দেখল যে আধো অন্ধকারের মধ্যে ঠিক এক হাত সামনেই
এক বিরাট নদী। জলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল।
এ যে রক্তের নদী ! পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মন্তকহীনদের রক্ত এসে

এখানে একটা বিরাট নদীর সৃষ্টি করেছে। তার প্রথর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য মাংসের স্তূপ, স্তনের সারি আর হাড়ের জঞ্জাল। বিড়ালের মত জ্যোৎস্না, কুকুরের মত ইঁদুর, ভালগাছের মত সাপ, কুমীরের মত বৃশ্চিক আর বট গাছের মত কুমীর তার মধ্যে কিলবিল করেছে। সেই গাঢ় কাল রংয়ের রক্ত-নদীর কল্লোল ধানিতে শোনা যাচ্ছে প্রেতলোকের আর্ত বিলাপ। আর আকাশের দিক থেকে অসংখ্য অজগরের মত লকলকে জিত এসে সেই টকটকে রক্তকে চুবুচু শুষক করে পান করেছে।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোথায়? এ কোথায় এসেছে সে? নরকের চেয়েও এ কোন ভয়ঙ্কর নরকে?

অরিন্দম এদিক ওদিক তাকিয়ে অন্ধকারে দিক নির্ণয় করতে পারল না। তবু পা বাড়াল সে। তাকে পালাতেই হবে।

দূর থেকে ভেসে আসছে সেই আত্ননাগ, হৃদয়, ঢাকের আওয়াজ, অট্টহাসি, চাবুক আর রক্তবৃষ্টির শব্দ। রক্তনদী থেকে ভেসে আসছে একটা শ্বাসরোধী ও চেতনা-লোপকারী দুর্গন্ধের মৃত্যু-শীতল তরঙ্গ।

অরিন্দম এগিয়ে চলাতে চলাতে ডাক দিল, “কোথায়? কোন দিকে যাব কণ্ঠস্বর?”

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

“কোথায়? ভূমি কোথায়?”

এবারও কেন সাড়া পাওয়া গেল না। অরিন্দম ধেমে উঠল। এবার? কি করবে সে? সেই হাড়ের দুর্গাবিকাশী শত্রুদের ধ্বংস করে এই নরককে সে কি লোপ করবে না?

ইয়া। তাই। সে ভয় পাবেনা।

অরিন্দম দৃঢ়পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার। সন্তর্পণে চলতে লাগল সে। কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। পায়ের নীচে যেন কার দেহ! অন্ধকারেও হুঁচোখ

বিস্ফারিত করে সে তাকাল। একি! তার সামনে, চারদিকে, অসংখ্য মৃতদেহ। কি করে এগোবে সে? এগোতে গেলে যে তাকে এই সব শবদেহ পদদলিত করতে হবে।

কিন্তু না, মৃতের জন্ত মমতা মিথ্যে, অর্থহীন। অরিন্দম পা বাড়াল, শবদেহের ওপর দিয়েই সম্বর্পণে সে চলতে লাগল।

হঠাৎ মড়-মড়-মড়াং—একটা শব্দ। পায়ের চাপে একটা শবদেহের পঙ্কর ভেঙ্গে গেল আর তার ভেতর অরিন্দমের ডান পাটা আটকে গেল। একি বিস্মাট! অরিন্দম পা টেনে বের করতে গেল, পারল না। জোরে টান দিল সে তবু হল না।

“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ”—

অরিন্দম চমকে তাকাল। ভগ্ন-পঙ্কর শবটো হাসছে! অরিন্দমের শরীর কেঁপে উঠল, মরিয়ার মত সে আরো জোরে টান দিল পা। কিন্তু কোন ফল হল না। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের সমস্ত শবগুলোই হাসতে শুরু করল। অদ্ভুত, ভয়াবহ সে হাসি। সে হাসির ডেউ মেরু প্রদেশের ঝড়ের মত। সে হাসি মৃত্যুর হাসি।

“হাঃ হাঃ হাঃ”—

“হিহি-হিহি”—

“হোহো হিহি হাহা”—

সেই ভগ্ন-পঙ্কর শব এবার কথা বলল; “মৃতকহীনের রাজত্বে তুমি মাথা নিয়ে বেড়াতে চাও! বটে! এতদূর আশ্পর্ক তোমার।”

চারদিকের শবেরা উত্তেজিত কণ্ঠে শায় দিয়ে উঠল।

“বটে! বটে!”

“এতদূর আশ্পর্ক।”

“মাথা নিয়ে বেঁচে থাকবে!”

“না না, কখনো না”—

“কাটো—শব্দ মাথা কাটো”—

সঙ্গে সঙ্গে দু'জোড়া লোমশ হাত এগিয়ে এল অরিন্দমের কণ্ঠের কাছে—সেই হাতে একটা করাত ।

অরিন্দম গর্জে উঠল, “না না, আমি মরব না”—

তার উত্তরে অট্টহাসিতে অন্ধকার আবর্তিত হল ।

দুটো লোহার মত শক্ত হাত দুদিক থেকে অরিন্দমকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল, অপর দুটে হাত করাতটাকে বসাল তার গলার ওপর । তারপর এদিক আর ওদিক, ওদিক আর এদিক—। মাংস কাটল, শিরা কাটল, কুড়কুড় শব্দে হাড় কাটল, গলগল ধারায় রক্ত বেরোল, যন্ত্রণায় চেতনা লুপ্ত হল—

গুম্-গুম্-গুম্-গুম্—

অরিন্দম ধড়মড় করে উঠে বসল । না, সে মরেনি, তার গলাও কাটা হয়নি । সে স্বপ্ন দেখছিল । হৃৎস্পন্দ । কী সাংঘাতিক হৃৎস্পন্দ !

মেঘের ডাক ভেসে আসছে—গুম্-গুম্-গুম্-গুম্ । বহুদূর থেকে । রুষ্টি হবে কি ? হোক । পৃথিবী ঠাণ্ড হোক । কিন্তু তার মরুভূমির মত শুষ্ক কবে শীতল হবে ?

ভোর হয়ে আসছে । নগর-প্রান্তবর্তী পাহাড়ের আড়ালে রক্তবর্ণ সূর্যদেব তার সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে আরোহণ করেছেন । ভোর হয়েছে । জৈবিক জীবনের তাগিদ সূর্য হয়েছে । আবার সারাদিন জুড়ে নিরানন্দ কর্মের চাকা ঘুরবে, মানুষ মানুষের ক্রীতদাস্য করে প্রাণকে অর্জন করবে । এক ইতিহাস । বদলাতে হবে, বদলাতেই হবে ।

কি স্বপ্ন দেখল সে ? কি তার অর্থ ? কেন সে এমন স্বপ্ন দেখল ? সর্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে গেছে । আঃ, কী আশ্চর্য প্রশান্তি চারদিকে ! আকাশে, বাতাসে, সূর্যালোকে এবং পাখীদের কাকলিতে যেন ভৈরবরাগের মুগ্ধতা । সেখানেও কি ভোর হয়েছে এখন ?

রূপোর পাতের মত সেই রূপসী নদীর তীরে কি এখন কুহকিনী
 রাতের ইজলাল ছিন্নভিন্ন হয়নি? এখনো কি সেই হৃদয় গায়ক
 তানপুরার ভাবে ঝঙ্কার তোলেনি? কে? অরিন্দম কান পাতল।
 কে যেন তার অন্তর থেকে ঘোষণা করছে—“ভাই সব—জাগো-ও-ও—
 কুহকিনী রাত চলে গেছে, ভোর হয়েছে—এ-এ”—। অরিন্দম হানল।
 গ্রহরী, তার অন্তরের সেই সদা-জাগ্রত অসিধারী গ্রহরী তার কর্তব্য-
 পালন করছে, তাকে ডাকছে।

ভোরের শান্ত, নিঃশব্দ পৃথিবীর চেহারা বদলাতে লাগল। অরিন্দম
 বতই এগোতে লাগল ততই আত্মবনগরের কোলাহল আর শব্দ বাড়তে
 লাগল। খাত্তের জন্ত মাতৃষের ছুটোছুটি, চীৎকার আর কলহ।
 ভিক্ষুদের প্রার্থনা। ক্ষুধার্তের আর্তনাদ। শান্ত, স্থির, জীবন-নদীর
 বুকে যেন চাকলা বাড়তে লাগল, ক্রমেই যেন তার জল উত্তাপের
 আধিক্যে টগবগ করে ফুটতে লাগল।

কতদূরে এসেছে সে! কালরাতে সে কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল? এত
 দূরে কেন এসেছিল সে? জীবন? মাতৃষের জীবন কেমন তা
 দেখার জন্ত? কিন্তু জীবন তো সর্বত্র একই রকম। ছিল এবং
 থাকবে। হাসি, কান্না, ঘৃণা আর ভালবাসা। একই থাকবে সব—
 শুধু রূপ বদল বে। সমাজও থাকবে কিন্তু তার ব্যবস্থাকে বদলাতে
 হবে। ব্যবস্থা মানে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক। সমস্বত্রে-গ্রথিত
 মাতৃষের ভাগ্য নিয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তিনিমিনি খেলছে। মাতৃষ
 প্রকৃতির উর্ধ্বোনা বলেই তাকে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানতে হয় এবং
 তা মানতে হয় বলেই সে বুঝেও নিঃশব্দ থাকে, অসহ্য হলেও সহ্য করে।
 ভাঙো—ভেঙ্গে চুরমার করো। আর কতদূরে? কি ভাবছে তার
 ললিতা? তার নবমল্লিকা ফুল?

অরিন্দম এগিয়ে চলল।

নীচুপাড়ার ঘন বসতির ভেতরে সে তখন পৌছেছে। গলি আর

রাস্তা ক্রমেই হাছবে ভরে উঠছে। ফ্যান্টীতে যাবার সময় হল কি ? না, আর ছুটি।

অরিন্দম থমকে বাঁড়াল। রাস্তার একপাশে ভীড় জমেছে। সেই ভীড় দু'জন লোককে কেন্দ্র করে। তারা মারামারি করছে।

“শালা”—

“তোকে মেরেই কেলব”—

“আমাকে মারবি! বটে! মার দেখি”—

“শালা গুহারের বাচ্চা”—

“শালা গুথেগো”—

কিল, চড়, ঘুমি, কেশাকর্ষণ।

“আমার টাকা নিয়ে ফেরৎ দিবি না?”

“আমি তোমার টাকা নিইনি”—

“কের মিছে কথা—শালা”—

“চোপ”—

প্রচণ্ড মারামারি। চারপাশে কৌতূহলী জনতার উৎসাহ, বিজ্রপ আর টিটকারী। দু'একজন তাদের প্রতিনিবৃত্ত হতেও বলে কিন্তু কল হয় না। হিংসা। যুধামান দু'জনের মধ্যে হিংসার পাশব ছায়া। জলন্ত চোখ, উত্তেজিত দন্ত-ধ্বং, ফণীত নাক অরিন্দমের শরীর যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে। অভাব। অভাব থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়। ভয় থেকে নীচতা, লোভ। তা থেকে হিংসা।

একজন লোক গিয়ে দু'জনকে বাধা দিল। তাদের মধ্যে একজন সেই লোকটিকে ধাক্কা মারল। সেই লোকটি আবার পালটা এক ঘুষি মারল তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীড় থেকে একজন এসে সেই লোকটিকে ধাক্কা মেরে বলল, “ওকে মারলে বে? তুমি কি লবাব সায়েব নাকি?”

“আবে যাও যাও”—

আর একটা মারামারি বেধে গেল। মুহূর্তে সেখানকার সবাই সেই মারামারিতে জড়িত হয়ে গেল। কেউ কোন পক্ষে না, অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মারছে।

অবিন্দম সরে পড়ল সেখান থেকে। না, আর থাকা উচিত নয়। ওখানে আগুন জ্বলছে। হিংসার আগুন। হিংসায় হিংসা বাড়ে, আগুনের মত তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কি করবে অবিন্দম? একা কেউ কিছু করতে পারে না। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব হিংসার গতিকে চিরকাল বোধ করা যায় না।

আরো অনেকখানি পথ। কখন সে ললিতাকে দেখবে? তাড়াতাড়ি পা চালাও।

জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগল অবিন্দম। হিংসার চেহারা এক। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী—সর্বক্ষেত্রেই এক তার অবয়ব। একই প্রতিকৃতির ছোট, একটু বড়, বড়, আরো বড়—নানারকমের আকার। সর্বত্র তা আত্মসংশয়ী।

“বাবু—বাবুগো—একটা পয়সা ছান—”

তিথিরী। ছিন্নবসন, রুগ্ন, শীর্ণ, প্রেতাকৃতি।

“একটা পয়সা ছান গো বাবু—ও বাবু—”

আরো তিথিরী ছুটে এল। আরো।

“রাজরাজেশ্বর হও বাবু—একটা পয়সা—”

“হুঁদিন খাইনি বাবু—হুঁদিন—”

“ভগবান তোমাকে রাজা করবেন বাবু—”

“ভগবান দয়া কর—ভগবান দয়া কর—”

ভগবান! অবিন্দমের শরীর শক্ত হয়ে উঠল। সর্বত্র সেই এক ডাক—‘ভগবান!’ কে ভগবান? কোথায় থাকে সে? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান? তাহলে মানুষের দুঃখ কেন?

অবিন্দম অগ্রসর হল। আরো অনেক দূর। কখন সে ললিতাকে দেখতে পাবে?

নোংরা গলি। আর একটা গলি। আবর্জনা, ভাঙ্গা বাঁড়ী,
উলক শিল, কথ-উলক নরনারী আর বোঁয়া-ভাটা কুকুর। ওপরে
মহাসমুদ্রের দূত নীলবর্ণ মহাকাশ আর তিমিরাস্তক সূর্য্যদেব।

অরিন্দমের পাশ দিয়ে একটি দশ এগারো বছরের ছেলে দৌড়ে
গেল, জ্বর পেছন পেছন সব্বয়সী আর একটি ছেলে। একজন কসাঁ,
একজন কালো।

পচাআবনকারী কালো ছেলেটি হঠাৎ কসাঁ ছেলেটিকে ধরে ফেলল,
ধক্কাই কিল মারতে আরম্ভ করল। কসাঁ ছেলেটিও আত্মরক্ষার জন্ত
ধরিয় হয়ে পালটা আক্রমণ শুরু করল। অরিন্দম আবার ধমকে দাঁড়াল।

দুজনের পরনে ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা। মারামারি করতে করতে
তারা কুংসিংভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করতে লাগল।

“শালা কালো ভুত —”

“শালা কুষ্ঠরোগী—”

“আমার মার্কেল ফিরিয়ে দে—দে বলছি—”

“দেবনা—দেবনা—”

“শালা—আমি তোব বোনকে—”

“আমি তোব মাকে—”

“তবে—”

“থবরদার—”

দুজনের চোখে মুখে হিংসার কুটিল ও কুংসিং কাপ। অসহ্য।
অরিন্দম এগিয়ে গেল, দুজনকে ছাড়িয়ে দিল।

কঠিনভাবে বলল সে, “থবরদার—আর ঝগড়া কসো না—”

“বাঃ—আমার মার্কেল নিয়েছে যে—”

“নিয়োছি মানে, তুই তো হেরিছিস আমার কাছে—”

অরিন্দম ধমক দিল, “ধাক্কা, আমি শুনতে চাইনা—যাও, তোমরা
দু’জনে যে যার বাঁড়ী যাও—”

পেছন থেকে গলা শোনা গেল, “কি করছ অরিন্দম ?”

ছেলে ছাটি চলে গেল। অরিন্দম ঘুরে দেখল যে মুকুন্দ তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তার চুল উকোখুকো, কক্ষ, ললাট চিন্তাকুল। কি ভাবছে সে ? কিসের আলার জলছে ?

মুকুন্দ হাসল, “অগড়া খামাচ্ছিলে ?”

“হ্যাঁ। আচ্ছা মুকুন্দ—”

“বল।”

“এতটুকু ছেলেরা এমন হিংসুক আর কুভাবী হল কি করে ?”

মুকুন্দ বিষয়ভাবে হাসল, বলল, “শিক্ষার দোষে। মানুষ যেমন পারিপার্শ্বিকে বাস করে ঠিক তেমনি সে হয়। ওদের বাপ মা দাদা কাকারা যা করে ওরাও তাই অনুকরণ ও অনুসরণ করে।”

“তাহলে ওদের অভিভাবকেরা ওদের শিক্ষা দেয় না কেন ? এতটুকু ছেলে—তাদের মুখে চোখে এ কী নীচতা, এ কী হিংসা।”

“তুমি উত্তেজিত হয়েছ অরিন্দম—তা হয় না। কি শিক্ষা দেবে ওদের অভিভাবকেরা ? তারা নিজেরা যে শিক্ষা পেয়েছে সেই অনুযায়ীই তো আচরণ করবে ?”

“তাহলে কী শিক্ষা পাওয়া উচিত ?”

“এমন শিক্ষা যাতে আত্ম জাগ্রত হয়, যাতে এই জ্ঞান লাভ হয় যে হিংসা পশুত্ব, তা মনুষ্যত্বের বিরোধী, হিংসা থেকে দূরে থাকতে হলে মানুষকে তার জৈবিক বৃত্তিগুলোকে সংযত করতে হবে।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল। কথাগুলো তার মনে ধরল, কিন্তু তবু ঝটকা লাগল।

“তাহলে শিক্ষকেরা এই শিক্ষা দেয় না কেন ?”

মুকুন্দ কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছে গম্ভীরভাবে বলল, “অর্থদেবতার রাজত্ব চলছে। এ রাজত্বে অর্থই জীবন। তাই শিক্ষক যেমন অর্থের জন্তই শিক্ষা দেয়, ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি অর্থের জন্ত শিক্ষা নেয়। তারা

শিকা পেয়ে কারিগর হয়, মিস্ত্রী হয়, আইনবিৎ হয়, চিকিৎসক হয়,
সব হয় কিন্তু মাহুস হয় না।”

মুকুন্দ আবার আগের মত বিষমভাবে হাসল, বলল, “তোমার
সমস্ত প্রশ্নের একই উত্তর—বিষাক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজকে
উৎপাটিত না করলে মাহুস মাহুস হবে না। স্বার্থপরতা বিসর্জন না
হিলে মাহুস তার জাহ্নবতার উর্ধ্বে উঠে মাহুস হতে পারে না।
এই সমাজে তা সম্ভব নয়, অসাম্য এবং অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রাম
মাহুসকে শুধু স্থূল ও স্বার্থপরই করবে, তাকে উন্নত করবে না।
কিন্তু আর না, আমি একটা জরুরী কাজে চলেম। সজ্জের ব্যাপারে।
ভালো কথা, তুমি কাল রাতে কোথায় ছিলে?”

“ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—”

“বাড়ী যাও তাহলে—ললিতা আর মা ভেবে মরছে—”

“যাচ্ছি—”

মুকুন্দ চলে গেল। অস্বিনন্দ এগোল। মুকুন্দের কথাগুলো তার
মাথায় ঘুরতে লাগল, তার কানে অহরহিত হতে লাগল। ই্যা, মুকুন্দ
ঠিকই বলেছে। মুকুন্দ জানী, জীবনকে সে শুধু দেখেই নি, ভেবেছেও।
ললিতা ভেবে মরছে। ললিতার দুটো চোখে কোন সুদূর রহস্যলোকের
ছায়া?

গলি। রাস্তা। রাস্তা, গলি গলি গলি। ডাইনে, বায়ে, ডাইনে।
ঔঁকারীকা ঔঁকারীকা। আর কতদূর?

অস্বিনন্দ দাঁড়াল। সামনে একটা চালের দোকান। তার সামনে
একশ লোকের একটা সারি। প্রত্যেকের হাতে তারিঞ্চ পরিচয়-পত্র।

কোলাহল। চেলাঠেলি। অল্পসত-প্রাণ মাহুসের ছটকটানি।

“আমি আগে—”

“ঠেলে না—”

“ধবরদার—”

“সেই শেষ রাত থেকে দেড়িয়ে আছি গো—”

“ভগবান, আর কতক্ষণ ?”

অবিন্দমের অন্তর মোচড় দিয়ে উঠল। ভগবান!

সে এগোল।

বাতাসে দুর্গন্ধ। রাতের দুঃস্বপ্নটা কি এখনো তার পশ্চাদ্ধাবন করছে ?

ফুটপাথের ওপর শুয়ে আছে চারপাঁচজন লোক। অনাহারে ওদের বসে থাকার শক্তিও লোপ পেয়েছে। জীবনের লক্ষণ নেই ওদের ভাসা ভাসা চাউনিতে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, “একমুঠো খেতে ছান গো—একমুঠো খেতে ছান—”

আর একজন শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে বলল, “ভগবান—”

ভগবান। আবার উদ্ধত প্রেতের মত শব্দটা ঘুরেকিরে অবিন্দমের কানে আসছে। একদিন সেও তো নিজের অজ্ঞাতসারে ডেকেছিল!

এগোল অবিন্দম।

আবার খামল সে। দুচোখ বগড়ে তাকাল সামনে। না, মিথ্যে না। দামোদর শুয়ে আছে পদপথে।

তার কাছে গেল সে।

ভুকিয়ে গেছে দামোদর, তার শুকনো মাংসে কুঞ্চিত রেখা দেখা যাচ্ছে, গাল বসে গেছে। প্রাণীকৃত শব্দটা নিয়ে দুটো চোখ কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, নুকের পঙ্করকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেটের চামড়া যেন পিঠে গিয়ে ঠেকেছে! কি হল তার ?

“দামোদর—দামোদর—”

দামোদর মাথাটা হেলাল একপাশে, অবিন্দমকে দেখতে পেয়ে হাসবার চেষ্টা করল।

“কি হয়েছে দামোদর—তোমার কী হয়েছে ?”

দামোদর টেনে টেনে বলল, “আমার দিন ফুরিয়েছে—”

“কি বলছ তুমি !

“ঠিকই বলছি ভাই। কুলিগিরিও আর করতে পারলাম না—দেহ রাজী হল না। ভিক্ষে চেয়েও হুবিধে হয় নি। এখন সবাই মুখ কেরায় তখন যত্নাই শুধু দয়া করে। আমি সেই মহৎ দয়াকে লাভ করেছি।”

“না—তা হতে পারে না দামোদর—”

“বুঝা চেষ্টা ভাই—”

“না—না—” চারদিকে তাকাল অবিন্দম। রাস্তা দিয়ে লোকের যাচ্ছে। স্তানমুখ, মোন, প্রস্তরবৎ নির্বিকার।

“জানছেন—এই লোকটি মারা যাচ্ছে—এঁকে আপনারা সাহায্য করুন—”

কেউ গুনল না, কেউ তাকাল না।

“দামোদর—”

“কি ?”

“তোমার এই অবস্থা কি কর্মফল ?”

“হ্যা—”

“এজন্মে তো ভাল কর্মই করলে—তবে ?”

“পূর্বজন্ম—”

“পূর্বজন্মের ফল হলে তোমার স্মৃতি থাকত।”

“সবই মায়ায় আচ্ছন্ন—তাই মনে থাকে না—”

“মিথ্যে কথা।”

“হয়ত—হয়ত তাই—আমি বুঝতে পারছি না—”

“আর ভগবান ?”

“আর সব মিথ্যে হলেও ভগবান সত্যি আছেন—”

“দামোদর—”

„কি ?”

“ভগবান তোমার হৃৎক দূর করছেন না কেন ?”

“নিয়মে বাঁধা আছে বলেই তো এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড টিকে আছে—
নিয়ম ভাঙলে যে সব ভেঙ্গে পড়বে—তাই ভগবান কিছু করতে পারেন
না—”

“মাতৃষ পারে ?”

“পারে।”

“তাহলে মাতৃষই ভগবান ?”

“না। মাতৃষের মধ্যে ভগবান আছেন।”

“তোমার প্রলাপ থামাও দামোদর—ওঠ, আমার কাছে ভর
দাও—”

দামোদর হাসল। কথা বলতে পারল না।

“ওঠ—কথা বলচ না কেন ? আমার গুথানে চল—”

দামোদর জবাব দিল না, শুধু বিড়বিড় করে সে বলল, “আর না
আর না—আঃ, এসেছ ? এসেছ ? হে ছলনাময়ী, হে মায়াময়ী, হে
স্বহৃৎভে বহুবলভা—এতদিনে তুমি এসেছ ? কিন্তু অবগুণ্ঠন কেন ?
মুখ খোল—তোমাকে দেখতে দাও—”

“দামোদর—”

গুণ্ঠন করে গান গাইছে দামোদর।

“দামোদর—”

দামোদর গুনতে পাচ্ছে না। তার হৃৎকোষে গুমিত ছায়া, তার
ঠোঁটের কোণে বিচিত্র, বিশীর্ণ হাসি। ‘ই কি মৃত্যু ! হঠাৎ অরিন্দম
দুর্বল বোধ করে। তার দম যেন আটকে আসে, শরীর যেন হালকা
হয়ে আসে।

একটা বিরাট-পক্ষ শকুন এসে সামনের বাড়ীর ছাদে বসল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে
ডাকল।

একটা কুতুর এসে চার হাত দূরে বসে জিভ্ বের করে ইপাতে লাগল।

“দামোদর—”

দামোদর স্থির হয়ে গেছে।

“দামোদর—”

দামোদর মরেছে।

“শুনছেন, আপনারা শুনছেন? একজন লোক মারা গেল—”

কেউ কথা বলল না, কেউ তাকাল না। মৃতের পৃথিবী। শরীরটা হালকা মনে হয়। যেন অর্ধেকটা ক্ষয়ে গেছে অরিন্দমের, যেন তারও অর্ধেকটা মরে গেছে।

“শুনছেন—শুনছেন, একজন লোক অনাহারে, অকালে মারা গেল। তার মৃত্যু যে আমার মৃত্যু, আপনার মৃত্যু—”

কোন সাড়া দিল না কেউ।

রাতের ছায়ায় কি তাহলে মতি। কারা ইটিছে বাস্তা দিয়ে? ওদের গাথা কোথায়?

অরিন্দম তাকাল। দামোদরের মুখে মৌন প্রশান্তি। মৃত্যু কি নিঃশব্দতা? মৃত্যু কি অগাধ, অতলম্পর্শী আলোড়নহীন স্থগুপ্তি?

দাহ করতে হবে। শ্মশানে যেতে হবে। দামোদরকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অরিন্দম।

কোনদিকে? কোনপথে? কোথায়-শ্মশান?

মৃতকহীন প্রেতরা তর্জনী-বাঁকেতে শহরপ্রান্তের দিকে যেতে বলল।

অরিন্দম এগোল।

দামোদরের শব্দেহটা যেন একটা প্রস্তরখণ্ড। ভারী। ভয়ংকর ভারী। চামে ভিজে বার অরিন্দম।

মহাশ্মশানে গিয়ে পৌছোল অরিন্দম। গোবী নদীর ধারে। চারদিকে মৃত্যু। গলিত দুর্গন্ধ বাতাসে। কয়েকটা শব্দ পুড়ছে।

দক্ষমাংসের খাণ্ডো-মারী হুগন্ধ। গৌরী নদীর টলমল জলে কি সেই
স্বপ্নে-বেথা বক্তনদীর ছায়া ?

অর্থ-দেবতার রাজহে সব কিছুর জ্ঞান দাম দিতে হয়। টাকা না
হলে শবদাহ হয় না।

টাকা ছিল। এই সেদিন মাইনে পেয়েছে অরিন্দম—এখনো দশটা
টাকা পকেটে আছে।

কাচের শয্যার দামোদরকে শোয়ানো হল। তারপর একটা
অগ্নি-ফুলিক।

ইত্যন্ততঃ ছড়ানো শব্দেই ঘিরে শব্দনের মেলা, কুকুরের ভীড়।
তাদের তীক্ষ্ণ, ত্রিংশ চাংকার।

দামোদরের দেহ পুড়তে থাকে। চড়-চড়-কটাস্ শব্দ শোনা যায়,
নাশ পুড়ে গলে যায়। বেলা বাড়ে, বেলা বাড়ে, স্বর্গদেব মধ্যাহ্নগগণে
উড়ে অপরাহ্নের আকাশে নেমে যান, বাতাসে মূলতানের বিলম্বিত তান
ভাসে। দামোদরের দেহ পুড়ে শেষ হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে শুধু
একরাশি উত্তপ্ত ভস্ম। গৌরী নদীর ঢেউ এসে সেই ভস্মের গায়ে
আছড়ে পড়ে। চিতার ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যায়। বাতাসের আশ্রয়
আকাশ। অঙ্গার মিশার মাটিতে। দামোদরের মৃত্যু হয়েছে। তার
দেহ আকাশে, বাতাসে, জলে, রৌদ্রে ও মাটিতে মিশিয়ে মিলিয়ে গেল।
আর তার প্রাণ, তার চৈতন্য ? মৃত্যু কি ? কেন মরে মানুষ ? কেন
সে অমর হয় না ? মৃত্যুহীন জীবন আর যৌবন সে কেন পায় না ?
অমৃত কিসে পাওয়া যায় ?

“দামোদর”—অরিন্দম ডাকল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তার সেই ডাক চারদিকের শূন্যতায়
মিশে গেল। কোথায় গেল অরিন্দমের কর্ণস্বর ? চারদিকের এই পরিব্যাপ্ত
মহাশূন্যতা কি সব কিছুকেই শূন্য করে দেয় ?

দামোদর মারা গেছে! একজন মাহুয় মারা গেছে। তার সঙ্গে
অরিন্দমেরও খানিকটা খেন মরে গেল।

অরিন্দমের চেকনা কিরে এল। কুখ্যাপাসের নখরাঘাত তার
জঠরদেশকে চিরে চিরে ফেলছে। আর ললিতা ভেবে মরছে। তার
মারী ললিতা। স্তম্ভরী, তন্ত্রী, পীতবস্ত্রনা। কিন্তু সে-ও কি একদিন
এই মহা শূন্ততার হারিয়ে যাবে? না-না, অরিন্দম অমৃত আহরণ করে
আনবে, সমুদ্র মনন করে অমৃত তুলবে, পৃথিবীকে অমৃতময় ও জ্বালাময়
করবে।

অরিন্দম এগোল। আর পাচ্ছেনা সে। ক্লান্তি, যুগভীর ক্লান্তি
আর কুখ্যাপাসের নখরাঘাত। আর কতদূর?

আবার রাস্তা। গলি। গলির পর রাস্তা। আবার গলি।
আঁকাবাঁকা—আঁকাবাঁকা—আঁকাবাঁকা—

আর মাহুয়। মৃতমশুক, চিন্তাজর্জর, ক্লান্ত, জ্যোতির্হীন, নিঃশব্দ।

আর এখানে ওখানে ফুটপাথের ওপর শায়িত নরনারী। 'আজ,
কিংবা কাল, কিংবা পরন্তু, শিগগীরীষ্ট কোন একদিন শূন্ততার হারিয়ে
যাবে তারা? তাদের আশা আকাজকা, স্বপ্ন, ভাবনা, ভালবাসা আর স্নেহ
মমতা, তাদের নস্তির ডিবের মারা আর তামাক বিড়ির নেশা—সব
ছেড়ে চলে যাবে, মিলিয়ে যাবে? মৃত্যু কি?

“বাবু—বাবুগো!”—

একটি স্ত্রীলোক গুরে আছে পদপথে, কানছে। তার পরণে এক
ফালি ক্লাকডা, কোমর থেকে উরুদেশ পর্যন্ত কোনমতে ঢাকা। তার
শরীরের বাকী অংশ অনাবৃত। শীর্ণ কিন্তু গৌরাঙ্গী সে। রাজপ্রাসাদের
ভগ্নাবশেষের মত তার যৌবন। চোখে তার মৃত্যুর তমসঃ কণ্ঠে তার
আসন্ন বিস্মৃতির ঢেউ আর তার বুকে একটি দেড় বছরের নগ্ন শিশু।
মা। সপ্তিমস্তুর উদগাতা। এক জীবনের সঙ্গে আরেক জীবনের
মালা গাঁথবার মানিনী।

“বাবু—বাবুগো”—

লোকেরা চলতে চলতে তাকায় তার দিকে। চোখে কৌতূহল।
বেচারী মারা যাচ্ছে—তা নইলে শুকে নিয়ে এক রাত কাটানো যেত।
হ্যাঁ, মেয়েটার গুনগুলোর আকার ভালো, উরুদেশের গঠন ভালো—আরো
কিছু দেখা যায় কি ?

“বাবুগো!—আমি মলাম—আমার পোলাভারে বাচান”—নিশ্চয়,
নির্বিকার শিশুটি। চুক্ চুক্ করে মায়ের দুগ্ধযূন স্থন শোষণ করছে।

“বাবুগো—বাবু”—দ্বীলোকটি আর কথা বলতে পারে না। আকাশে
শকুণের ছায়া। একটা জিভ-বের করা কুকুর এসে ঘোরে ঘোরে বাতাস
টানে, মৃত্যুর আশ্রয় খোজে। আর কত দেবী ? আর কত—

অরিন্দমের দুর্জল বোদ হয়, দম আটকে আসে। আরো পানিকটা
মাংস গেল তার, আরো পানিকটা রক্ত। শোন, মন্তকহীনরা শোন—
তোমাদেরও যে একটু একটু করে মৃত্যু হচ্ছে—সবাইকে বাচাও—

অরিন্দম এগোল। বুখা, সবই বুখা। যে বীর, তোমার চোখের
জল মুছে দেলো, তুমি নির্ভয় হও, অনাসক্ত হও, তা নইলে তোমার
মিষ্টি নেই।

পথ জুড়ে দাঁড়ায় এক উন্মাদিনী নারী, তার কোলে একটি তিন
বছরের ছেলে। ছেলেটা দু'কজে কাঁদছে। কুপা-বাক্সের ছায়া।

“ও বাবু শোনেন”—

অরিন্দম তাকাল।

“এই ছেলেটারে মই বিকি করবু—দশটা টায়া ছান—বাচান
বাবুগো”—

জবাব নেই।

“পাচটা টায়া ছান—ছাথেন—কী হুম্বর চোখ দুখান বাছাব—ও
গাজাবাবু”—

জবাব নেই। মহাশূন্যতায় সব কিছুই মিলিয়ে যায়।

“তুইভা ট্যাহা জ্ঞান ভবে—বাছার মুখখানা জাখেন—”

কোথায় যাচ্ছ মেঘের মিছিল? কোথায়?

“একভা ট্যাহা? তাও না? তবে কি বাছা মইরবে!”

এগিয়ে চল। এ মৃতের পৃথিবী। হাড়ের ভর্গে কারা থাকে?

কোথায় তারা?

এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে আকাশে। উড়ছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নাড়ের
ফল। উড়ছে শকুনেরা। এগিয়ে চল—

বাতাসে যেন সেই ডুন্ ডুন্ ঢাকের শব্দ। স্বপ্ন সত্যি হল।

নির্জন পথপ্রান্ত। ভাঙ্গা অট্টালিকার সারি।

মাবধানে চলো। অরিন্দম দাড়াল। তিনটি শব্দেই পথ জুড়ে।
ছুটো কুকুর এসে একটি শব্দের পেট চিরে অস্থূলোকে টেনে বের
করেছে। পাশ কাটিয়ে চলল সে।

বাতাসে ভর্গন্ধ। তবু সূর্যোদয়ের আলোতে আভ্র মালবী রাগিনীরা
ঝঙ্কার।

ভাঙ্গা অট্টালিকার আড়ালে একটি যুবতী আর একটি কুদর্শন
লোককে দেখা গেল। অরিন্দম অস্থুরালে দাড়াল।

লোকটা বলল, “একসের চাল দেব? বটে! কিন্তু আমান কি
দিবি!”

“হা বলবে”—

“তবে আর”—

সেই ইট আর পাথরের ওপর লোকটা যুবতীটির হুইয়ে দিল,
তার ওপর কাঁপিয়ে পড়ল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল যুবতীটি, কাগাস বৃষ্টি আসা গলা থেকে তার
একটি মাত্র শব্দ, একটি মাত্র ডাক বেরোল, “ভগবান”—

অরিন্দম শিউরে উঠল, দৌড়ে পালান, চীৎকার করে বলে উঠল,
“ভগবান”—

অনেকদূর দৌড়ে গেল সে। অনেকদূর। তারপর সে থামল।
 ক্লান্তি। ক্ষুধা। সূর্যদেবের স্নান আলো। গলি গলি গলি।
 আঁকাবাঁকা বাঁকাআঁকা। আঁকাবাঁকা—ললিতা। ললিতা—। কি দেখল
 সে? কাল রাতের স্বপ্ন। নরক। পৃথিবীতেই আছে। তার
 চারদিকে মহাশূন্যতা। মায়া। দামোদরের ছলনাময়ী। মানুষই মানুষের
 দুর্দশার জগৎ দায়ী। হাড়ের দুর্গে কে থাকে? কোথায় তারা?
 বাতাসে কার দীর্ঘশ্বাস? কার কান্না? কাদের পায়ের শব্দ তার
 পেছনে, তার আগে, তার চারদিকে? মাটি ফাটছে কি? কঙ্কালের
 সারি চলছে কি? মশকহীনের মিছিল? হাড়ের দুর্গে কারা থাকে?
 আর মাঝে মাঝে কারা যেন ডাকে—‘ভগবান-ভগবান’—। কে
 ভগবান? কোথায় ভগবান? বেলা কত? সূর্যদেবের আলোতে
 এখনো মালবীর আলাপ। বহুদূরবর্তী সেই রূপসী নদীর ধারে হরত
 প্রজাপতির। এখন ঝিমোচ্ছে আর তাদের মধুসিক্ত স্তিমিত চেতনা
 দিয়ে শুনাচ্ছে তৃণখণ্ডের প্রাণস্পন্দন। জাগো—প্রাণবান হও—বিস্মৃতি
 ও বিদ্রাব্ধি ঠেলে উঠে দাঁড়াও—অশুভ আর পাপকে ধ্বংস করো—।
 কে ডাকে?

চোখাল দুটো শক্ত হয়ে উঠল তার। এখন তার একটিমাত্র প্রশ্ন।
 নরকের গর্ভ থেকে ওবা বারংবার কাকে ডাকে? ঈশ্বর কে? কে
 সে? এখন তার একটিমাত্র শপথ—ঈশ্বরকে পেতে হবে।

“ললিতা”—অরিন্দম উচ্চারণ করল।

ললিতা এসে সামনে দাঁড়াল। তার হুঁচোখে তিরস্কার, তার চোখের
 নীচে বিনিস রাতের ছায়া।

“তুমি!”

“হ্যা—আচ্ছা ললিতা, ঈশ্বর কি আছে?”

“তুমি কাল সারারাত, আজ সারাদিন ধরে কোথায় ছিলে?”

“ঈশ্বর কি আছে ললিতা?”

ললিতার চোখে যেন আগুন জ্বলল, কঠিনকণ্ঠে সে বলল, “ঈশ্বরের বিষয়ে কি এককথায় কিছু বলা যায়? আর আমি কিছুই জানিনা। শুধু এইটুকু জানি আর যানি যে ঈশ্বর আছে। নাও, এখন ওসব কথাবার্তা থাক—তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও—”

“ললিতা—”

“আর একটিও কথা নয়—আচ্ছা তোমার কি মাথা খারাপ হল?”

ললিতার চোখে আগুনের চেয়েও দারালুক বস্তু। জল। অরিন্দম নিজেই সংযত করল।

হাত মুখ ধুল অরিন্দম। তারপর সে খেতে ও বসল। কিন্তু সে শুধু ললিতাকে খুশী করার জন্য, তার চোখের জনকে সম্মান দেখাবার জন্য। তার মনিকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—ঈশ্বর কে? তার অন্তর জুড়ে এখন শুধু একটিমাত্র তব—ঈশ্বরকে চাই। যাওয়া শেষ করে অরিন্দম প্রশ্ন করল, “মুকুন্দকে তো এদিকে দেখতে পাচ্চিনা—সে কোথায়?”

“বাইরে গেছে।”

“ও—”

ললিতা ডাকল, “শোন—”

“ঈ?”

“কোথায় ছিলে কাল রাত থেকে?”

“রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ওত মৃত্যু দেখলাম ললিতা—
ক-ত মৃত্যু!”

ললিতার মুখে চোখে গাঙ্গুয়ী নৈমে এল, সে বলল, “আর অমনভাবে না বলে কয়ে বাইরে থেকে না—”

“কেন?”

“আমার কি ভাবনা হতে নেই?”

“ভেবোনা ললিতা—শোন, কি দেখলাম শুনবে? মরক—”

“আমি জানি।”

“মানুষের লোভ মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। অনাহারে আর ব্যাধিতে মানুষ মারা যাচ্ছে—সে মৃত্যু যে আমাদের মৃত্যু!”

“চূপ করো, শান্ত হও।”

“ললিতা—”

“কি?”

“ঈশ্বর কি?”

পদশব্দ শোনা গেল। অরিন্দম তাকাল। মুকুন্দ আছে।

মুকুন্দকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। কেনিদিকে না তাকিয়ে সে সোজা বাইরের ঘরে গেল। অরিন্দম তাকে গন্তব্যণ কবল। মুকুন্দের কাছে উত্তর চাইবে সে।

ললিতা পেছন থেকে বলল, “রাজে চিন্তা করে আর মাথা গরম করোনা—বুঝলে? রাতে একটু ঘুমিয়ে—”

অরিন্দম জবাব দিল না। শুধু ঘরে একবার ললিতার দিকে তাকাল, একবার হাসল। তারপর সে বাইরের ঘরে গেল।

“মুকুন্দ—”

মুকুন্দ কি যেন ভাবছিল, ডাক শুনে চমকে মুখ তুলল।

“মুকুন্দ—একটা প্রশ্ন আছে?”

“বল।”

“ঈশ্বর কি?”

“জানি না।”

“ঈশ্বর কি আছে?”

“তাও জানি না।”

অরিন্দম রেগে উঠল, “তুমি কি ঠাট্টা করছ মুকুন্দ?”

“না—” মুকুন্দ বিমর্ষভাবে হাসল, “সত্যি কথা বলছি।”

“কিন্তু দুঃখের মুহূর্তে, মৃত্যুর মুহূর্তে বারংবার মানুষ কেন তাকে ডাকে?”

“যখন মানুষ মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে না—তখন সে মানুষের চেয়েও শক্তিশালী একটি জীবকে কল্পনা করে—”

“তাহলে ঈশ্বর নেই?”

“আমি জানি যে সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, পৃথিবী আছে, মানুষ আছে কিন্তু ঈশ্বর আছে কিনা সে প্রশ্ন এখনো পাইনি বলেই বলছি নেই—পেলেই বলব আছে।”

“এই সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আর মানুষ কে সৃষ্টি করল?”

“প্রকৃতি।”

“প্রকৃতির সৃষ্টি কে করল?”

“জানিনা—খুঁজছি— ঈশ্বর আছে জানলেও কোন ফল হবেনা কারণ এতদিন ধরে যারা জেনেছে তাদেরও দুঃখ দূর হয়নি। ভাল কাজ করলেই যদি আমার ভালো হত তাহলে জানতাম যে ঈশ্বর আছে। তা হয়নি—মন্দ কাজ করেই বরং ভাল ফল ফলতে দেখছি অথচ ঈশ্বরের প্রশ্ন শিক্কে তুলে রেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখ দূর করতে পারি—”

অরিন্দম সাগ্রহে প্রশ্ন করল, “কি করে?”

“এই সমাজ-ব্যবস্থা বদলে, স্বার্থপরতা ও লোভের ধ্বংস করে, ভালো কাজ করলেই নিশ্চিত ভালো ফল পাবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে”—

“তাহলে ঈশ্বর কথাটার উৎপত্তি হল কি করে?”

“মানুষের ভয় আর কৌতূহল থেকে। বিরাট প্রকৃতির অনন্ত শক্তির তুলনায় নিজের অসহায়তা উপলব্ধি করে।”

“কিন্তু—” অরিন্দমের মন ভরল না, সে বলতে চাইল আরো কিছু।

মুকুন্দ বাধা দিয়ে বলল, “আমি হয়ত ঠিকভাবে শুঁড়িয়ে বলতে পারছি না আর সে চেষ্টাও আমি করব না। ঈশ্বরকে না মেনেও আমার দিন বেশ কাটছে। আমি নিজের ওপরেই বিশ্বাস রাখি, আমি জানি মাহুদই মাহুদের সুখ দুঃখের জ্ঞাত দায়ী। আর যদি ঈশ্বর থাকে আমি তার প্রমাণ চাই—এমন প্রমাণ যা বর্চেন্দ্রিয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—যা পক্ষেত্রিয়গ্রাহ্য, সর্বজনগ্রাহ্য।”

মুকুন্দ থামল। ঘরের ভেতর স্তব্ধতা নেমে এল। অরিন্দমও আর প্রশ্ন করল না। তা নিরর্থক। মুকুন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ চায়। পক্ষেত্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রাজ্য মন আর মস্তী বুদ্ধি কি কিছু নয়? তা দিয়ে কি আরো কিছু জানা যায় না? কিন্তু কী সেই জ্ঞান, কী সেই সত্য? ঈশ্বর কি? কোথায়?

ইঠাং মুকুন্দ উঠে দাড়াইল, বলল, “তুমি ঘুমোও অরিন্দম, আমি মনিশদরের কাছে যাব।”

“এত রাতে?”

“দরকার আছে।”

কি দরকার? প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল অরিন্দম। নিরর্থক।

মুকুন্দ বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত কাটে। প্রহর কাটে। রাত বাড়ে। অরিন্দম ভাবে। মন আর বুদ্ধি দিয়ে কিছু জানা যায় না? ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থেকে কি নতুন কোন জ্ঞানলাভ হয় না? ঈশ্বর কি? ঈশ্বর কি আছে? কি বলল অরিন্দম? ঈশ্বর নেই? ঈশ্বর তাহলে কল্পনা-সৃষ্ট বস্তু, নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়?

গুম্—গুম্—গুম্—

বহুদূর থেকে মেঘের ডাক ভেসে এল। পড়ক বুটি জ্ঞানের বারিসিঞ্চন হোক মকভূমির মত হৃদয়ে। ঈশ্বর কি নেই?

ঘুম আসে না। যেন কণ্টক শয্যায় শুয়ে আছে সে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে। প্রহর কাটে। রাত গভীরতার দিকে
এগোয়।

ঈশ্বর, তুমি কি আছ?

বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছে। ললিতা কি স্বপ্ন দেখছে? দুঃখ, বেদনা
আর মৃত্যুর ভেতর থেকে কেন বারংবার ডাক ওঠে—‘ভগবান—
ভগবান’?

না, বসে থাকলে চলবে না। তাকে জানতেই হবে। অরিন্দম
উঠে দাঁড়াল, ঘর থেকে বেরোল। ঈশ্বরকে খুঁজে না পেলে সে কংগ্রাস
অগ্রস্থ করতে পারবে না।

গলি। নিঃশব্দ। নির্জন।

এখানে ওখানে ঘুমন্ত কুকুর।

এখানে ওখানে আবর্জনা, ইঁদুর আর বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোক।

ঈশ্বর নেই?

ঘুমন্ত নীচুপাড়া। ঘুম! না, ঘুমোবার চল করে ভাবভে লোকেণা।
রাত পোহালে থাকে কি তারা? আর যারা ঘুমোচ্ছে তারা ডঃস্বপ্ন
দেখেছে।

অরিন্দম এগোল। জঁকা বঁকা অনেক গলি পেরিয়ে। হঠাৎ
সে থামল। বাতাসে দুর্গন্ধ। সামনের দিকে ভালো করে তাকাল সে।
তুটি মৃতদেহ। মৃতদেহ তুটিকে সন্তর্পণে দিগ্বল অরিন্দম। চারদিকে
তাকাল সে। অন্ধকার। ড’পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুড়িঘর আর বাড়ি।
এই কি সেই স্বপ্নের নবক!

একটা শব্দধ্বনি। নদীর তীরে পথের মতো নিঃশব্দতায় হঠাৎ চিড় খেয়ে
গেল।

একটি বাড়ীর ভেতরে কোলাহল শোনা গেল।

একটি কথা ভেসে এল সেই বাড়ী থেকে—“খোকা—খোকা
হয়েছে”—

একটি শিশুর জন্ম হল। জন্ম! একটি নতুন জীবন!

পেছনে ফেলে এসেছে সে ছুটি মৃতদেহ। দামোদর মাঝে গেছে। আরো অসংখ্য মৃতদেহ ছড়ানো আছে আজবনগরের এখানে ওখানে। আবার এখানে শব্দও বাজছে! হত্যা আরো কত ভাগ্যগায় বাজছে! পাশাপাশি জন্ম ও মৃত্যু!

আঁকাবাঁকা অনেক গলি আর রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চলল অরিন্দম।

এখানে ওখানে মাতালের পদধ্বনি।

এখানে ওখানে গলিত শব্দেহ।

এখানে ওখানে কুকুর আর ঈদুর।

ঈশ্বর নেই?

‘গুম্ গুম্ গুম্—মেঘের ডাক ভেদে এল। যেন কোন এক উত্তেজিত দেবতারাজের একশ’ ঘোড়ার বখের ঢাকা আকাশের বুক নিয়ে গড়িয়ে গেল।

অরিন্দম ধামস। কাছেই একটা ছোট মাঠ। সেখানে একটা মস্ত বড় বটগাছ—তার নীচে গিয়ে বসল সে। আকাশের অর্ধেকটা মেঘাবৃত, অপরাধে অজস্র নক্ষত্রের দীপমালা। অরিন্দম ভাবতে লাগল।

ঈশ্বর নেই? কে জানে, হত্যা মুকুন্দের কথাই সত্যি—ঈশ্বর নেই।

নেই। ভাবতেই যেন একটা ভোজবাজী ঘটল অরিন্দমের চোখের সামনে। সব কিছু যেন আলোড়িত হতে লাগল, কাঁপতে লাগল, ভাঙতে লাগল, কাটতে লাগল, বেগু বেগু হয়ে বাতাসে বিলীন হোয়ার মত মিলিয়ে যেতে লাগল। মাথার ওপরকার মহাকাশ যেন কেটে চৌচির হয়ে গেল, নক্ষত্রের আলো নিভে গেল, পায়ের নীচেকার মাটি সরে গেল, নবমীর চন্দ্রদেব অদৃশ্য হলেন, আজবনগরের আলো আর

অন্ধকার কর্পুরের মত মিলিয়ে গেল। পৃথিবী নেই, মহাব্যোমে বিরাজ-
মান গ্রহ উপগ্রহ নেই, সমুদ্র নেই, পর্বত নেই, ললিতা নেই, কেউ
নেই, কিছু নেই, এমনকি অরিন্দমও নেই। মহাশূন্যতা। অনন্ত, বিপুল,
ভয়াবহ মহা মহা শূন্যতা চারদিকে। আলো নেই, অন্ধকার নেই, শীত
নেই, বসন্ত নেই, বাতাস নেই, আগুন নেই, কিছু নেই। আইন নেই,
আদর্শ নেই, স্বপ্ন নেই, প্রেম নেই, জীবন নেই, মৃত্যু নেই, কিছু নেই।
শুষ্ক শূন্যতা, আদিঅন্তহীন মহা মহা শূন্যতা। নির্জন। নিঃশব্দ।

অরিন্দম ভয় পেল। তা হয় না। তা হতে পারে না। কারণ
পায়ের নীচেকার মৃত্তিকা মিথ্যে নয়, আকাশের তারা মিথ্যে নয়,
সে আর ললিতা মিথ্যে নয়, আজবনগরের কোটি কোটি লোকেরা
মিথ্যে নয়। আর কে এই সব সৃষ্টি করেছে? প্রকৃতি? তবে
প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল? বল, জবাব দাও। সব কিছুর শেষে
কে? হ্যাঁ, ঈশ্বর আছে।

আছে। সেই মহা মহা শূন্যতার গর্ভে এক মহা প্রাণশক্তি ধাব
আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির মত অদৃশ্য অথচ মহা মহা শক্তিশালী তা।
চৈতন্যময় প্রাণশক্তি। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে। আছে।
ভাবতেই, সেই মহাশূন্য আলোড়িত হল, পুঙ্খ পুঙ্খ বাষ্পের ভেতর দিয়ে
সৃষ্টি আরম্ভ হল। নক্ষত্রদের জন্ম হল, গ্রহ উপগ্রহ জন্মাল; জল ও
আগুনের সৃষ্টি হল; গাছপালা, লতাপাতা ও পশুপক্ষীর জন্ম হল, যা
কিছু আছে তার উদ্ভব হল; শব্দ, গন্ধ, বর্ণ ও বৈচিত্রে চারদিক
পরিব্যাপ্ত হল। আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই ঈশ্বর আছে।
নতুবা বল, কে তা সৃষ্টি করল?

কিস্তি দেখতে হবে। ঈশ্বর, তুমি কোথায়?

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। কোথায়?

মন্দিরে? দেখা যাক। অরিন্দম এগোল।

রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটা গাছের নীচে একটা বেদী মত। সেখানে

একটা তেল সিঁদুর-মাখানো প্রস্তরখণ্ড, তার গায়ে একটি সর্পমূর্তি।
বেদীর পাশে একটা লোক বসে আছে। তার ললাটে সিঁদুরের রেখা।

অরিন্দম লোকটিকে প্রশ্ন করল, “ঈশ্বরকে কোথায় দেখা যাবে
তুমি জানো?”

লোকটি মাথা নাড়ল, সহাস্তে বলল, “জানি—আমাকে পয়সা দাও,
তবে বলব”—

“এই নাও”—

তাকে দুটো পয়সা দিল অরিন্দম।

লোকটি বলল, “এই যে সর্পমূর্তি দেখছ—এই ঈশ্বর—এঁকে প্রণাম
কর”—

“ঈশ্বর কি সাপ?”

“মূর্খ, প্রশ্ন করো না।”

“ঈশ্বর কি শুধু সাপের?”

“মূর্খ, তর্ক করো না”—

“তুমি কে?”

“আমি পুরোহিত—আমি ঈশ্বরকে জানি এবং দেখাই বলে আমাকে
সবাই সম্মান করে। তুমি আমাকে প্রণাম করো।”

অরিন্দম নিরুত্তরে সেখান থেকে সরে পড়ল, এগোল। পথে আরো
মন্দির দেখল সে। বজ্র, আশু ও ব্যাদি প্রভৃতি দেবতার মন্দির।
সেখানেও পুরোহিতেরা পয়সা ও সম্মান দাবী করল।

আবার পথ। ঈশ্বরকে দেখতেই হবে। নিজের মনে হাসল
অরিন্দম। আদিম মানুষের ভয়ের প্রতীক ঐ সব দেবতার। এখনো
পূজা পাচ্ছে। মানুষের মনে এখনো আদিমতা আছে। তাই
ঈশ্বরের নাম করতেই সে ভয় পায়। সেই ভয়ের সন্ধান জেনে একদল
লোক তার সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জন ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা
করছে।

আমি একটা মন্দির। খেতলাখরে তৈরী। ভেতরে স্বর্দর্শন এক
মহত্ব-মূর্তি দেবতা। তার সামনে নানা অর্ঘ্য, অন্নদান ও অসংখ্য
আলো।

বিগ্রহের সামনে একজন মেদসমৃদ্ধ প্রোঢ় উপবিষ্ট। তার ললাটে
চন্দনের ছাপ। বারান্দায় জনকয়েক লোক কব্বাজোড়ে উপবিষ্ট।

অবিন্দম লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, “আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই।”

সেই প্রোঢ় বলল, “ওই বিগ্রহ দেখ”—

“দেখলাম”—

“দক্ষিণা দাও”—

“কেন?”

“আমি তার পুরোহিত”—

“তাতে কি?”

উপবিষ্ট লোকেরা হেসে উঠল, “মূর্খ, তুমি মূর্খ। ভগবান বলেছেন যে,
তার পূজারীদের সম্মান করা উচিত, তাদের দক্ষিণা দেওয়া উচিত”—

“কাকে বলেছেন সে কথা ভগবান, আপনারা?”

“না—ঐ পুরোহিত ঠাকুরকে”—

“আমি বিশ্বাস করি না।”

সেই মেদসমৃদ্ধ প্রোঢ় লোকটি চোখ রাঙা করে বলল, “তুমি আমাকে
বিশ্বাস করো না!”

“না। বিশ্বাস করতে পারি যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখাতে পারো”—

“আমি তো তা দেখলাম”—

“কিন্তু ওতো পাথরের মূর্তি”—

“উনিই ঈশ্বর”—

“তাহলে প্রতিটি শিলাথওই ঈশ্বর!”—

“তুমি নাস্তিক—দূর হও”—

“পুরোহিত, তুমিও ঈশ্বরকে দেখোনি”—

অরিন্দম সেখান থেকে বেয়েল। এবার? আরো মন্দিরে যাবেন। সে। সব মন্দিরেই সেই এক ব্যাশায়। দেবতার মূর্তি রচনা করে ব্যবসা চলছে। শুধু দেবতার মূর্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মানুষের মন একটা উন্নত স্তরে পৌছে নিজেকেই পূজা করেছে। কিন্তু আসল বস্তু কোথায়? ঈশ্বরকে কোথায় দেখা যাবে? ঈশ্বর তো শিলাখণ্ড নয়।

“ভগবান—তুমি কোথায়?”

চলতে চলতে চীৎকার করে ডাকল অরিন্দম, “ভগবান, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? তুমি আমাকে দেখা দাও”—

কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কোন উত্তর ধ্বনিত হল না। শুধু মেঘাবৃত আকাশ থেকে ডাক ভেসে এল—গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—গুরু গুরু গুম্ গুম্—

মন্দিরে ঘুরে অরিন্দম ইতিহাসকে বুঝল। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এক বিরাট শক্তিকে অহুভব করে তার নাম দিল ঈশ্বর। তারা ভেবে পেল না ঈশ্বর কেমন। কেউ ভাবল বজ্র, কেউ ভাবল সাপ, কেউ ভাবল মানুষের মতই কেউ। নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঠিক রাখার জন্য দেবতার নাম করে নানা শাস্ত্র রচিত হল, নানা উপকথা সৃষ্টি হল। যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের অহুভূতির কথা মানুষকে বলে সম্মান ও অর্থলাভ করে লোভী হয়ে উঠল, তাদের সেই লাভকে কায়েমী করার জন্য তারা নানা শাস্ত্র ও সংস্কারের সৃষ্টি করে মানুষের মনকে সাপ, আগুন, ব্যাধি ও প্রকৃত-দেবতাতেই সীমাবদ্ধ রাখল, মানুষের ঈশ্বরাসুস্কানের স্বাধীনতাকে হরণ করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। সেই সব লোভীদের জন্য সত্যকার ঈশ্বর-আবিষ্কারকদের কথা কেউ শুনল না, মানল না, ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পেল না। ঈশ্বরহীন হওয়াতে হিংসা বাড়ল, ঘৃণা বাড়ল, লোভ ও স্বার্থপরতায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হল। ঈশ্বর, তুমি কোথায়?

মেঘের ডাক ভেসে এসে—গুরু গুরু—গুম্ গুম্—

অরিন্দম খামল, ভালো করে তাকাল। নীচুপাড়ার পশ্চিম সীমান্তে গৌরী নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কতকণ ধরে হেঁটেছে, ঘুরেছে সে, সে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। সে বুঝল যে রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে এখন।

মেঘের ডাকে গৌরী নদীর বুকে যেন আবেগের স্ফোরক হয়েছে। কল্কল্ শব্দে তীরের বুকে এসে আছড়ে পড়ছে সে, ছলছে তার বৃকের নোঙর-ফেলা নৌকো, জাহাজ আর তাদের আনোঙনি। যুদ্ধে সন্ধে আকাশের নক্ষত্রেরাও যেন সেই গভীর ও উদাত্ত মেঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অরিন্দম মাটির ওপর বসে পড়ল, বিড় বিড় করে বলল, “দেখ, তুমি দেখা দাও”—

গৌরী নদীর অশান্ত জলোচ্ছ্বাসের শব্দে তার কথা ভেসে গেল, শূন্যতায় হারিয়ে গেল।

মন আর বৃদ্ধি কি তাকে পথ দেখাবে না? অরিন্দম ভাবতে লাগল। কিন্তু না, কোন ফল হবে না। শুধু ভাবলেই কিছু দেখা যায় না। তাহলে? কোথায়?

অতি দ্রুত আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্রেরা এবার একের পর মেঘারত হল, রাহুর পূর্ণগ্রাসের মত সম্পূর্ণ আকাশটাকেই মেঘরাশি গ্রাস করল। মেঘের কালো ছায়ায় গৌরী নদীর জলও কালো হয়ে উঠল। শুধু উচুপাড়ার আলো, নৌকো ও জাহাজের আলো অসংসারের ওপরকার আলোকস্তম্ভগুলোর উজ্জ্বল আলো নদীর জলের এখানে ওখানে ও সেখানে দীর্ঘায়ত হয়ে প্রতিবিম্বিত হল, দুর্লভে লাগল, কাঁপতে লাগল, ভাঙতে লাগল। অন্ধকারে সমস্ত চরাচর পরিব্যাপ্ত হল। দুর্ভেদ্য লৌহ প্রাচীরের মত সেই অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারেই অরিন্দম বসে বসে রইল।

বাতাস নেই। একটা গুমোট, ধমধমে ভাব। প্রকৃতি যেন নাটকের শেষ দৃশ্যের উদ্ব্যটনের জন্ত নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।
 ঈশ্বর, তুমি কোথায়? মন্দের মত অরিন্দম বারবার বিড়বিড় করে—
 “ঈশ্বর, তুমি কোথায়? হে আমার সার্বিক আত্মা, তোমার অরিন্দম
 উৎস-স্থলকে আমায় দেখাও, দেখাও।

হঠাৎ যেন অরিন্দমের আকুল প্রার্থনায় চারদিকে সাদা পড়ে গেল।
 আকাশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, মেঘের গুরু গুরু
 ডাক বারংবার গড়িয়ে যেতে লাগল। যেন নাটকের সেই বহু-প্রতীক্ষিত
 শেষ দৃশ্যের পটোড়ালনের জন্ত সংকেত-শব্দ হিসেবে লক্ষ লক্ষ মৃদঙ্গের
 ধনি উদ্ভিত হল। তারপর ববনিকা সরে গেল। নিম্প্রদীপ রঙ্গমঞ্চের
 মৃদঙ্গ-নির্নাদ গুম্ গুম্ শব্দে পৃথিবীকে কাঁপাতে লাগল। তারপর হঠাৎ
 অভিনয় শুরু হল।

উত্তর থেকে একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ ভেসে এল। ঝড়। ক্রমে তা
 কাহ্নে এল। গাছের মাথা ও ডালপালা হুলিয়ে, শুকনো পাতার রাশি
 উড়িয়ে তা যেন আনন্দের উন্মত্ততায় হা হা করে হাসতে লাগল।
 মড়মড় শব্দে তীরবর্তী করেকটা গাছ ভেঙ্গে পড়ল, উপড়ে গেল আর
 ভয়-বাকুল জানা অজানা পাখীদের ডাক ভেসে এল। গৌরী নদীর
 আবেগ এবার মত্ততার পরিণত হল, তার বড় বড় ঢেউ জ্ঞানশূন্য
 বহুহস্তীর মত তীরের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

“ঈশ্বর—ভগবান—তুমি দৃশ্যমান হও”—

কড়—কড়—কড়াং—আকাশটা যেন একেবেঁকে ফেটে গেল। আর
 তার ফাটলের আড়াল থেকে যেন এগু বহুবিচিত্র জগতের নীলবর্ণ
 আলোকে দেখা গেল।

অরিন্দম কঁপে উঠল। ঐ সেই আলো—তার প্রাণদাতা
 মহাপ্রাণের জ্যোতি।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশের আটটি কোণ থেকে কোটি কোটি

অস্বাভাবিক বিদ্যাহেমে ছুটে এল। তাদের অশ্বকূরের আঘাতে আকাশের
জলের বাধ ভেঙ্গে গেল আর বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নামল।

ঝড়ের হাঙ্গা শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, বিসর্পিত বিদ্যাহেমে আলো, বজ্র-
পাতের ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর গুরু গুরু মেঘের ডাক—সব মিলে যেন
একটি সত্য—একটি বেদনাময় স্তোত্র—একটি করুণ রাগ।

স্থির হয়ে বসে রইল অরিন্দম। বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত—কোনো
কিছুতেই টলল না সে, নড়ল না। সর্বাঙ্গ ভিজে গেল তার, তবু তার
হৃদয়ের প্রার্থনা তরু হল না, তবু সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কে জানে,
হয়ত এক মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটবে, সেই প্রার্থিত পুরুষকে দর্শন করা যাবে।
ঈশ্বর, তুমি দেখা দাও।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতির এই ভৈরবমূর্তি শান্ত হয়ে এল। কতক্ষণ সে
খেয়াল অরিন্দমের ছিল না। শুধু সে দেখল যে ধীরে ধীরে প্রকৃতির
রূপান্তর ঘটল। ঝড় থামল, কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল;
বৃষ্টি থামল কিন্তু বৃষ্টি-স্নাত গাছপালা আর পৃথিবীর সবসত্তা রইল;
রিক্ত মেঘের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অন্তহিত হল কিন্তু আকাশে ভাসমান হালকা
মেঘের পুঞ্জ রইল। আর পূর্বাচলে যেন গৌরীনদীর গভীর তলদেশ
থেকে সূর্যদেবের রক্ত-কুসুম-সদৃশ শ্রীমুখটিকে উঠতে দেখা গেল।

স্থির ও অবিকলিতভাবে তখনও অরিন্দম সেখানে বসে ছিল,
এখনও বসেই রইল সে। বৃষ্টির জল তার গায়েই শুকোল, ভিজে
কাপড় আবার শুকনো হল, তবু সে ক্রক্ষেপ করল না। যে আসনে সে
উপবেশন করেছে, ঈশ্বরকে না দেখা পর্যন্ত সেখানেই সে তার হাড়
মাংস মিশিয়ে দেবে।

নিদ্রাক ও নিশ্চল প্রভবমূর্তির মত অরিন্দম সামনের দিকে তাকিয়ে
রইল। কোথায়? ঈশ্বর, তুমি দেখা দাও।

মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটতে লাগল। সোনালী সিঁদুর

মাথা সূর্যালোক ক্রমেই শুধু সোনালী হয়ে উঠল, গৌরী নদীর জলে তার স্পর্শ লাগল, নদীর তরঙ্গশীর্ষে সেই আলো যেন নাচতে লাগল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসের দোলা লেগে নদীতীরবর্তী গাছ-পালারা সব মর্মরধ্বনি করে উঠল। বহুদূরের কোন পদ্মবনের ধারে নিভূতে বসে খাও আহরণ করার লোভে একদল বনহংস উড়ে গেল আর তাদের পেছনে যেন আকাশের ছিন্ন মেঘের দল ধাওয়া করল। জানা অজানা নানা পাখীর ডাক, দূর থেকে ভেসে-আসা আজবনগরের যানবাহন ও লক্ষ লক্ষ মানুষদের কলগুঞ্জন আর গৌরী নদীর কল্লোল-ধ্বনি—সব মিলে যেন একটি সুর। আশ্চর্য প্রশান্তি চারদিকে। অদৃষ্ট কোনো লোক থেকে যেন শান্তিবারি বর্ষিত হচ্ছে পৃথিবীর ওপর। স্বন্দরী পৃথিবী। শিশুদের, প্রেমিকদের হাসি যেন শোনা যাচ্ছে। ক্ষেতে, মাঠে, কারখানায় আর দপ্তরখানায় মানুষেরা ছুটছে। আবার মানুষ মরছে, কাদছে, তাদের রক্তে মাটি ভিজছে। ফুল ফুটেছে এখানে, ওখানে, পৃথিবীময়। নিশীথ রাত্রের ঐক্সকালিক মুহূর্তে, প্রখর দিবসালোকের উজ্জ্বল মুহূর্তে, মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন মানবগোষ্ঠী। পাশাপাশি জীবন ও মৃত্যু। বেদনা ও আনন্দ। মহাশূন্যতা ও মহাপরিপূর্ণতা। অনিত্য ও নিত্য। স্থায়ী ও অস্থায়ী। আলো ও অন্ধকার। সৃষ্টি ও ধ্বংস। কিন্তু জীবন বড় সত্য। আনন্দ ও আলো বড় সত্য। মৃত্যু আর অন্ধকার শুধু জীবনের ও আলোর মহত্বকে প্রকাশ করার জন্ত, তাকে মধুর ও ম্লানবান করার জন্ত। সৃষ্টির আনন্দকে চিরস্থায়ী করার জন্তই আলো ধ্বংস। পৃথিবী যৌবনবতী, জীবন ও আলো চিরন্তন। মৃত্যু আসে, অন্ধকার আসে কিন্তু গুরুত্ব মানবজাতি আর গোটা পৃথিবীকে তা গ্রাস করতে পারে না। জীবন ও আলো অবিনশ্বর। একজন জন্মায়, আরেকজন মরে। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে। মানুষের যৌবন বেঁচে থাকে। একটি ফুল ঝরে গেলেও আর একটি ফুল ফোটে। এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলেও তো শারা পৃথিবী

অঙ্ককার হয় না। মানুষ হিংসার পশু হলেও তার মহত্ব লোপ পায় না।
চতুরলাল থাকলেও মণিশঙ্কর থাকে।

জীবনই বড় সত্য, জীবনই বড় শক্তি। অরিন্দম সবিস্ময়ে দেখল
সেই জীবনকে। মহাসমুদ্রের মত তা চরাচরকে প্রাবলিত করেছে,
প্রবাহিত হচ্ছে। গম্ভীর, মধুর ও উত্তেজক তার কল্লোলধ্বনি। এবটা
মহারাগের মত। সেই মহারাগের আত্মা এক নৃত্যচ্ছন্দ। আনন্দ। বাঁচার
আনন্দ। মহা আনন্দ। অনাহার, ব্যাদি, দুঃখ, শোক—কোনো কিছুতেই
সেই আনন্দ হ্রাস হয় না, দুর্বল হয় না। মহাস্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে সেই
আনন্দধারা। আকাশে, বাতাসে, পর্বতে, অরণ্যে, জলে, স্থলে, অগনণ
পশু, পক্ষী, মানুষ আর জীবদেহে সেই আনন্দ প্রবাহিত। সেই
আনন্দের উত্তেজনাকে অগ্নান রাগার জন্তাই আসে মৃত্যু, জরা, ব্যাদি।
সেই আনন্দকে স্থলভাবে পাবার জন্তই মানুষ হয় স্বার্থপর, হিংসাপরায়ণ,
সেই আনন্দ অপহৃত হলেই মানুষ সংগ্রাম করে পশুশক্তির বিরুদ্ধে।
তাকাও, দেখ, মহান আনন্দধারায় ব্রহ্মাও পরিপ্রাবিত। শুধু পৃথিবী
নয়—চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, শুক্র—কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত কোটি
নক্ষত্রপুঞ্জও সেই আনন্দধারা। আনন্দের প্রাণ অস্থিরতা—তাই মেঘ
ওড়ে, পৃথিবী ঘোরে, গ্রহপথে চলে নক্ষত্রদল। তাকাও, দেখ। সেই
আনন্দের জন্তই আজ আজবনগরের পশুদের মধ্যে সংগ্রাম চাই। মহান
আনন্দে সৃষ্টি থর থর কাঁপছে। আনন্দই ঈশ্বর। তাকাও, ঈশ্বরকে দেখ।

অরিন্দম দেখল। ঈশ্বর শূণ্যতা ও এক। ঈশ্বর অকার। ঈশ্বর
মহাকাল। ঈশ্বরই আদ্য ও অপের। ঈশ্বর থেকে সব কিছু।
মানুষও তাই। মানুষ ঈশ্বরের মতোই। আবার মানুষের মতোই
ঈশ্বর। তবু সব কিছুর পৃথক স্বভাব আছে। মানুষেরও তা
আছে। শূণ্যতা থেকে এক—এক থেকে শূণ্যতা। হৃদয়ের সন্ধিক্ষেপ
মাঝে ইন্দ্রজালের যবনিকা। মায়া। প্রতিটি বস্তুর এই পৃথক ও
স্বাধীন স্বভাবকে স্বযোগ দেওয়ার জন্তই এই মায়া। কিন্তু মায়ায়

আচ্ছন্ন হলে নিজেকে দেখা যায় না। দেখা যায় না যে ঈশ্বরের মধ্যে সে, তার মধ্যেই ঈশ্বর এবং সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর। ফলে অহমিকা, অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা, বুদ্ধ। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, তার মধ্যে তুমি। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, তোমার মধ্যেই ঈশ্বর। দেখ, ঈশ্বরকে দেখ, প্রতিটি মানুষই ঈশ্বর, সব মানুষ মিলেও সেই একই ঈশ্বর। অনন্ত কোটির শূন্য বাদ দিলে থাকে এক। তাই একগোষ্ঠী হয়ে বাস করতে হবে মানুষকে, পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ সমগ্র মানবজাতির জন্ত দায়ী। সমগ্র মানবজাতি আবার প্রতিটি মানুষের জন্ত দায়ী। তা না হলে একজনের পাপে কোটি কোটি লোক দুঃখ ভোগ করে কেন? শোন, নিজের মধ্যবর্তী ঈশ্বরকে দেখে নিজেকে সংযত কর, অপরকে সংযত কর, মানুষ হও।

অবিন্দম দেখল। মুক্তিই ঈশ্বর। ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ। তাই এ জগতে সব কিছুই স্বাধীন, মুক্ত। ঈশ্বরের মধ্যেই সব তবু সব কিছুর পৃথক স্বত্বা আছে। নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্রহবান্ধি থেকে শুরু করে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন হয়েও নিয়মের পথ ধরে তাদের চলতে হবে। সেই নিয়ম সংযম। সেই নিয়মই ঈশ্বর। পৃথক স্বত্বা আছে বলেই মানুষ নিয়ম পালন করে ভালো ফল পায়—বলে ঈশ্বর দয়ালু। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে যখন মন্দ ফল ঘটে তখন লোকে বলে ঈশ্বর নিষ্ঠুর। কিন্তু ঈশ্বর দায়ী নয়। দায়ী মানুষ। দায়ী মানুষের সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা। তবু মানুষ ডাকে—‘ভগবান—ভগবান’—। সে ডাক নিরর্থক নয়, সেই ডাকে মানুষের অন্তরবাসী ঈশ্বর সাড়া দেয়। তাইতো মানুষ উত্তেজিত হয়, দল বাঁধে, মানুষের দুঃখ দূর করার জন্ত সংগ্রাম করে।

মিথ্যা। কোনো মূর্তি, কোনো বিগ্রহ, কোনো শিলাখণ্ড মানুষের দুঃখ দূর করতে পারেনা। কারণ মানুষের ডাকে ঈশ্বর মানুষের দুঃখহরণ মানুষকে দিয়েই করায়। কোন মানুষ দিয়ে? যে মানুষ তার অন্তরের ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে। আর কি ভাবে দেখতে পাওয়া যায় তা?

অন্তরের মণিকোঠায় যে ঈশ্বর আছে তাকে কিভাবে দেখা যায়?
অবিন্দম ভাবতে লাগল। কি ভাবে? কি ভাবে?

হঠাৎ সর্বাঙ্গে রোমাঙ্কিত হয়ে উঠল তার। সে তাকাল তার
চারদিকে। ঈশ্বর থেকেই সব কিছু। ঈশ্বরই সব কিছু। এই সত্য।
জীবন বড় সত্য। জীবনকে মহাজীবনে পরিণত করার জন্তই মৃত্যু।
পৃথিবীর সব কিছুই জীবন্ত ও আনন্দময়। এই জ্ঞানই সত্য। ভালো
কি আর মন্দ কি, প্রতিটি বস্তুর স্বরূপকে জানাই সত্য। সে সত্যকে
অবিন্দম জেনেছে। আর সত্য মানেই ঈশ্বর।

গভীর আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল অবিন্দমের। আবার সে তাকাল
চারদিকে। জীবন কি সুন্দর! আকাশ, মেঘ, গাছ, নদী, শাখী, ফুল
আর মানুষ—সব কিছুই সুন্দর। আনন্দ সুন্দর, সত্য সুন্দর—সৌন্দর্য
দর্শনে মন পবিত্র হয়। সৌন্দর্যই ঈশ্বর। আনন্দের শিহরণ খেলে গেল
অবিন্দমের সর্বাঙ্গে। সুন্দর, এ জীবন সুন্দর, এই পৃথিবী সুন্দর!

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ছলে উঠল, ভরে উঠল। অনিবার্য অতুভূতিতে
দেহমন প্রাবিত হয়ে গেল। ভালবাসতে ইচ্ছে হল তার। আকাশ
বাতাস, নদী পর্বত, অরণ্য, মেঘ, ফুল, ফল, জীব জন্তু, প্রতিটি ধূলিকণা
—সব কিছুকেই ভালবাসতে ইচ্ছে হল তার। সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর
আছে। আর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু মানুষ। প্রতিটি মানুষকে ভালবাসতে
ইচ্ছে হল তার, প্রতিটি মানুষকে। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে
ঈশ্বর আছে সেই ঈশ্বরতার মধ্যে ও আছে। অত্র মানুষকে ভালবেসে
সে নিজেকেই ভালবাসে। আর ললিতা? জন্মবাসা, হাঁ, প্রেমই
ঈশ্বর।

ঠিক, সত্য, সৌন্দর্য ও প্রেম দিয়েই মানুষ তার অন্তরবাসী ঈশ্বরকে
দেখতে পায়। আর পথই ঈশ্বর। সত্য, সৌন্দর্য ও প্রেমই ঈশ্বর।
যে সেই পথ অবলম্বন করে নিজের অন্তরের দেবতাকে দেখতে পেয়েছে
সেই মানুষের মঙ্গল করেছে, তার দুঃখ দূর করেছে, মজ্জা-সমাজের

শ্রদ্ধাদেব ধ্বংস করে দেবতা অর্জন করেছে এবং মানুষেরা তাদের মূর্তি
নিৰ্মাণ করে পূজা করেছে।

অবিন্দম উঠে দাঁড়াল, আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলল,
“পেয়েছি—পেয়েছি—আমি সেই আদিত্যবর্ষ ঈশ্বরকে পেয়েছি—সত্য,
সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর”—

চারদিকে শব্দ, কোলাহল। আকাশে সঙ্করমাণ চিলের ডাক।
ঝিরঝিরে বাতাস, হংস-পক্ষের মত শুভ্র মেঘের মিছিল, গৌরী নদীর
জলকল্লোল। অগণন মানুষের পদধ্বনি, চীৎকার, হাসি, কান্না,
দীর্ঘশ্বাস। স্রোতসঙ্কুল জীবন্ত জীবন।

“পেয়েছি—পেয়েছি”—

না। আর কোন দেবতা নেই।* আমার অন্তরবাসী দেবতাই
সমস্ত কিছুর নথো। না, কোন পূজার দরকার নেই। মানুষের জন্ত
বাঁচাই সবচেয়ে বড় পূজা। শোন, মায়াচ্ছন্ন না হওয়াই সবচেয়ে বড়
ধর্ম। আরো শোন, শুধু মূর্তি এবং বিগ্রহ পূজায় চিত্ত সংকীর্ণ হয়,
মনে কুসংস্কার জন্মায়। দেখ, ঈশ্বরের সমগ্র মূর্তিকে দর্শন কর।

চারদিকে যেন কার ললিত কণ্ঠের তান! মেঘের গায়ে যেন কোন
অঙ্গর-দুহিতার নৃত্য! বাতাসে যেন কোন নন্দন-কাননের পুষ্প-গন্ধ!
পেয়েছি—আমি সেই আদিত্যবর্ষ মহাজীবনকে আমার অন্তরে দেখতে
পেয়েছি। হে আকাশ, হে বায়ু, হে নদী, হে সূর্যদেব—শোন, আমি
দেবতা—মানুষমাত্রেই দেবতা। শোন—সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই
ঈশ্বর।

“তুমি!” অবিন্দম অর্ধশব্দে উচ্চারণ করল।

ললিতা মাথা নাড়ল বলল, “হ্যাঁ, আমি। কিন্তু কোথায় ছিলে কাল সারারাত? আর কি আশ্চর্য, তুমি চুপি চুপি পালিয়ে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু কেন? কেন?” ললিতার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল, ভ্রুকুণ্ডিত হল, হরিণীর মত দুটো আয়ত চোখে তার উৎকর্ষা ঘনাল, সে বলল, “কাউকে বলে গেলে কি দোষের হত?”

অরিন্দমের মুখে মুহূ হাসি দেখা দিল, সে মুহূকণ্ঠে বলল, “আমি তোমাকে হুশিয়ারগ্রস্ত করেছি—সত্যি, আমি হুঃখিত, আমি লজ্জিত।”

“এত বেলা হয়েছে—কারখানায় যাবে না?”

“না। আজ আমি বড় ক্লান্ত।”

“চান থাওয়া করবে না?”

“হ্যাঁ”—

“কিন্তু কখন? পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেই কি মানুষের মঙ্গল হবে?”

অরিন্দম কথা বলল না, নিঃশব্দে সে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইল। মাথার চুল আলুলায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠের ওপর, বুকের ওপর। এক জোড়া ধড়কের মত দুটো বাঁকা ভুরুর মাঝখানে রয়েছে রেখাযুক্ত তিরস্কার। আর কী আশ্চর্য তার চোখ দুটো! যেন কোন সুদূর আনন্দলোকের বহুস্রময় ছায়া সেখানে ঘন হয়ে উঠেছে।

রক্তপ্রবালের মত চৌট, গবিত রাজহংসের মত গ্রীবাদেশ, দাড়িফলের মত যুগল স্তন, অগঠিত নিতম্বদেশ আর ক্ষটিক স্তম্ভের মত দুটি উরু—কী আশ্চর্য সুন্দর ললিতা!

“আর আমি—আমার কথা কি তোমার মনে পড়ে না?” ললিতা প্রশ্ন করল, “আমার যে রাত্রে ঘুম আসে না তুমি বাইরে থাকলে”—

“কেন? আমার জন্য এত ভাবো কেন ললিতা?” মুহূর্তে
পাল্টা প্রশ্ন করল অরিন্দম।

ললিতা তাকাল অরিন্দমের দিকে, বলল, “জানিনা।”

কিন্তু তাই কি? ললিতার চাহনি, ললিতার সমস্ত দেহের ভঙ্গী,
তার ‘জানিনা’ কথাই ভেতরকার আবেগ কি কিছু জানাতে বাকী
রাখল?

হাঁটু গেড়ে বসল অরিন্দম তার সামনে, বলল, “ললিতা”—

“কি?”

“তুমি সুন্দর”—

“মিষ্টি কথা বললেও আমি ভুলব না”—ললিতা হাসল।

“আমি তোমাকে ভালবাসি ললিতা”—

“তুমি!” ললিতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখের দৃষ্টি স্তিমিত ও
অলস হয়ে উঠল।

“আর শোন ললিতা”—

“কি?”

“আমি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি”—

“কোথায়?” ললিতার কণ্ঠে কৌতূহল ধ্বনিত হল।

“আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে—পৃথিবীর সর্বত্র। শোন—সত্য,
সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর”—

ললিতা অরিন্দমের হাত ধরল, বলল, “কিন্তু আমার ঈশ্বর তুমি”—

“কে?” ভেতর থেকে বলরাম বেরিয়ে এল। ললিতা অরিন্দমের
হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

“কে ঈশ্বরের কথা বলছে?”

বলরামের দু’চোখে উদ্ভাস, উন্নত দৃষ্টি। সে এসে অরিন্দমের
দিকে তাকাল, বলল, “ওঃ—তুমি”—

অরিন্দম মাথা নেড়ে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—আমিই ঈশ্বরের
কথা বলছিলাম”—

বলরাম হেসে উঠল।

“হাসছেন কেন?”

বলরাম ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করল, বলল, “হাসব না! যা নেই
তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি?”

“কি নেই?”

“ঈশ্বর।”

“নেই!”

“না—এককালে ছিল—যখন আমি যুবক ছিলাম, যখন স্বপ্ন দেখাটাই
আমার ধর্ম ছিল। দুঃখের সমুদ্রে ডুবতে ডুবতেও তখন ঈশ্বরকে
দেখেছি। কিন্তু সে ঈশ্বর মারা গেছে অরিন্দম”—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না, ঈশ্বরের মৃত্যু নেই।”

“তুমি মূর্থ। সাবধান—তোমার রূপালে দুঃখ আছে”—

“বাবা!”

“চুপ, কথা বলিল না। আমি একটু বাইরে যাউ—বেড়িয়ে আসি।
মড়ার গন্ধে ফুরফুরে বাতাস ভুব ভুব করছে—একটু হাওয়া খেয়ে আসি।
আর আকাশ? আঃ—বেদনা-বিষে তা নীল, ঘননীল হয়ে আছে।
বাই—আমি বাই”—

দুর্গাবতী দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর গমনপথের দিকে
কণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “ভগবান—
তুমি রক্ষা করো”—

“কি হল মা?” ললিতা এগিয়ে এল কাছে।

“দেখলি না—তোমার বাবায় মাথা ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

নিঃশব্দতা নেমে এল বারান্দায়। কেউ কথা বলল না, কেউ কথা
খুঁজে পেল না।

“মা—মাগো”—

ভেতর থেকে একটি বাচ্চা কান্না ভেসে এলো।

“কিমে পেয়েছে মা—ওমা”—

কুখার কান্না। অভাব আর অনাহারকে পৃথিবী কি ভাগ করে
ভোগ করতে পারে না?

পদশব্দ।

মুকুন্দ এসেছে।

“এই যে অরিন্দম! কাজে যাবে না?”

“না। আর তুমি?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “আমার আজ বিকেল থেকে কাজ”—

“ওঃ”—

“খেতে দেতো ললিতা—এখনি বেরোব”—ব্যস্তভাবে বলল মুকুন্দ,
তারপর অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “কালরাতে আবার
কোথায় উধাও হয়ে গেলে বলত?”

“ঈশ্বরের খোজে।”

মুকুন্দের চোখে কৌতুক ঝিকমিক করে উঠল, সে বলল, “বটে!
তা সেই ভদ্রলোককে কি খুঁজে পেল?”

“পেলাম।”

“কোথায়? কোন উল্লাদাগারে?”

অরিন্দম হাসল না, গম্ভীরভাবে বলল, “ঠাট্টা নয়, আমি তাকে
দেখেছি। সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর।”

“পুরোন কথা। ওকথা অনেকেই বলেছে অরিন্দম।”

“অনেকেই বলেছে।”

“হ্যাঁ—কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে।”

“আমি চেষ্টা করে দেখব।”

“ব্যর্থ হবে তোমার চেষ্টা।”

“কেন ?” অরিন্দম উত্তেজিত হয়ে উঠল, “কেন ?”

মুকুন্দ সেই উত্তেজনাকে লক্ষ্য করে হাসল, বলল, “কেন ? তাহলে আমার সঙ্গে এসো”—

ললিতা বাধা দিল, “আবার কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?”

মুকুন্দ হাসল, “ঘাবড়াস্ না—আমরা এখুনি আসছি—তুই ভাত ঝেড়ে তৈরী হ। অরিন্দম”—

“চল”—

দুজনে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাবতী বলল, “আবার বেরোল দু’জনে—দিনরাত শুধু পাগলের মত টোঁ টোঁ করে বেড়াচ্ছে ওরা। ভগবান, মাহুঘের দুঃখের দিন কি তার শেষ হবে না ?”

ললিতা কথা বলল না, মাঘের কথায় কিরেও তাকাল না, নিঃশব্দে সে বাইরের দিকেই চেয়ে রইল।

পাশাপাশি তিন চারটে মন্দির সেখানে।

মুকুন্দ বলল, “দেখছ ! চারটে মন্দির চার রকমের”—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “হ্যা—চার রকম মত। সবাই ওরা ঈশ্বরকেই খুঁজছে কিন্তু তা পারনি বলেই চার রকমের মন্দির গড়ে’ল। কিন্তু মুকুন্দ, ঈশ্বর এক, তাই তার মন্দিরও একই রকমের।”

“তোমার মতই তাহলে একমাত্র সত্য ?”

“হ্যা।”

“ভালো—এখুনি তার সত্যতা দেখা যাবে।”

এগোল তারা। একটা মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনে একজন জটাধারী পুরোহিত বসে স্থব্র করে একটি প্রশ্ন পাঠ
করছিল, মুকুন্দ তাকে বলল, “পুরোহিত বাবা”—

“বল বেটা”—

“আমার এই বন্ধু ঈশ্বরকে দেখেছে”—

“বটে! কোথায়?” পুরোহিতের কণ্ঠে অবিশ্বাস ধ্বনিত হল।

অবিন্দম এক পা এগিয়ে গেল, বলল, “সত্য, সৌন্দর্য আর প্রেমই
ঈশ্বর—মাতৃষই ঈশ্বর”—

পুরোহিত হেসে উঠল, “বটে! তুমি দেখেছ? যিথো কথা—
আমরা ছাড়া তো আর কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পারে না।”

“আমি দেখেছি তাকে।”

অট্টহাসিতে কেটে পড়ল পুরোহিত।

“হাঃ হাঃ হাঃ”—

তার মে হাসি আর খামতেই চায় না। তার সেই হাসি শুনে চারটি
মন্দির থেকে লোকেরা ছুটে এসে রাস্তায় দাঁড়াল।

“কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?” চারদিক থেকে প্রশ্ন
উঠল।

একদল দাড়িওয়ালা লোক প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে?”

আলখাল্লাধারী একদল প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে?”

একদল মুণ্ডিতমস্তক প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে?”

জটাধারী অবিন্দমের দিকে নির্দেশ করে চোঁচিয়ে বলল, “এই উন্মাদ
বলছে যে মাতৃষই ঈশ্বর, সত্য, সৌন্দর্য আর প্রেমই ঈশ্বর”—

অবিন্দম মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ—আমি বলছি। তোমাদের
মন্দির মাতৃষকে ঈশ্বর দেখাতে পারেনি বলেই আমি ঈশ্বরের পরিচয়
জানাচ্ছি তোমাদের”—

দাড়িওয়ালাদের একজন বলল, “কিন্তু ঈশ্বরের কথা শুধু আমরাই
জানি ছোকরা—ঈশ্বর নিরাকার—ঈশ্বর পুতুল নয়”—

জটাধারী গর্জে উঠল, “কেন ? ঈশ্বর-বোধে পুতুলকেও পূজা করা যায়”—

দাড়িওয়ালা চৈচিয়ে উঠল, “পৌত্তলিকতা—শৌত্তলিকতা—ছি:—”

একজন মুণ্ডিতমস্তক বলল, “কেন এই কলহ ? সংকর্ষের ঘাবাই তো দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—তাইকি যথেষ্ট নয় ? ঈশ্বর নিয়ে তোমাদের এত কোতূহল কেন ?”

দাড়িওয়ালা আবার চৈচিয়ে উঠল, “নাস্তিক—নাস্তিক”—

জটাধারী বলল, “তুমিও নাস্তিক”—

দাড়িওয়ালা গর্জে উঠল, “যা তা বলো না বিধমী—সাবধান”—

“খবরদার”—

“চোখ রাড়িয়ে না নাস্তিক, শোন একমাত্র আমি—আমরা দাড়ি-ওয়ালারাই ঈশ্বরকে দেখেছি”—

“না তুমি তাকে দেখোনি”—

অরিদ্রম চীৎকার করে বলল, “সত্য, সৌন্দর্য এবং প্রেমই ঈশ্বর—
—মাহুশই ঈশ্বর—শোন”—

কেউ শুনল না সে কথা ।

দাড়িওয়ালা বলল, “আমি ঈশ্বরকে দেখিনি ! বটে ! কাকের”—

“খবরদার বিধমী যবন—চূপ কর”—জটাধারীর চোখে আগুন থেলে গেল ।

“আমিই তোকে ঈশ্বর দেখাব সয়তান, কারণ কাকেরকে ঈশ্বর দেখানোই আমার পবিত্র কর্তব্য ।”

“তবেরে শালা”—

“তবেরে হারামীর বাচ্চা”—

কুৎসিৎ কোলাহলে চারদিক ভরে উঠল ।

আলখান্নাধারীদের একজন বলল, “ঝগড়া করো না—শোন, আমি

তোমাদের ঈশ্বরপুত্রের কথা বলছি—বলছি সে পরমপিতা পরমেশ্বরেরই কথা—

কিন্তু ততক্ষণে কংড়া মারামারিতে পরিণত হয়েছে। জটাধারী দাড়িওয়ালার দাড়ি ধরেছে আর দাড়িওয়ালার জটা ধরে টানাটানি করছে।

“ধবরদার”—জটাধারীর দল হাঁকল।

“ধবরদার”—দাড়িওয়ালার গর্জাল।

ছুইনলে মারামারি বাধল। কিল, চড়, ঘুষি, লাঠি, ছোরা। উন্মত্ত হিংস্রতা। রক্ত গড়াল মন্দিরের চত্বরে, রাস্তায়। চারদিকের বাড়ী থেকে আরো লোকেরা ছুটে এল।

“আমাদের ধর্ম বিপন্ন”—একদল বলল।

“আমাদের ধর্ম বিপন্ন”—আরেক দল বলল।

অরিন্দম চীৎকার করে উঠল, “কিন্তু তোমাদের আসল ধর্ম মনুষ্যত্ব—শোন কলহ পান!—মানুষকে শ্রদ্ধা করাই মনুষ্যত্বের প্রথম পাঠ—”

কেউ শুনল না তার কথা। কেউ না। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মারামারিতে। কুৎসিত ও অশ্রাব্য গালিগালাজে বাতাস মুখর হয়ে উঠল, আহতদের তরঙ্গ চারদিকে প্রবাহিত হল।

“খামো—খামো”—অরিন্দম পাগলের মত চীৎকার করে উঠল।

জবাবে তাঁর মত একটা ছোরা ছুটে এল তার দিকে। অরিন্দম বিছাৎবেগে একপাশে সরে দাঁড়াল।

“ভাইসব—শোন”—মুকুন্দ বলতে চাইল, কিন্তু সে কথা শেষ করতে পারল না, কে যেন একটা লাঠি ছুঁড়ল তার দিকে। আশ্চর্যের জন্ত সেও একপাশে সরে দাঁড়াল।

আর্ডনাদ। ইটপাটকেলের আওয়াজ। লাঠিতে লাঠিতে ঠোকা-ঠুকির শব্দ।

অরিন্দম শিউরে উঠল। পরস্পরকে খুন করছে সবাই।

শুধু হত্যা নয়। লুণ্ঠনও চলছে। রাস্তার পার্শ্ববর্তী দোকানপাট-
শুলোকে সবাই লুট করছে।

“মারো, মারো, বিধবী নাশ করো”—

“মারো মারো, নাস্তিকদের ধ্বংস করো”—

শুধু লুণ্ঠনই নয়। বাড়ীতে বাড়ীতে আগুনও লাগাচ্ছে ওরা।
লেলিহান অগ্নিশিখা আর পুঞ্জ পুঞ্জ উদ্ভৃষ্ট, কালো ধোঁয়া আকাশকে
অশুচি করে তুলল।

অবিন্দম ঘেন জ্ঞান হারাল, সে আবার চীৎকার করে বলল, “শোন,
মুখের দল শোন—মাহুষ মাহুষ ভাই ভাই”—

কেউ শুনল না তার কথা, কেউ থামল না। ঘেন মহারণ্যে বসে
কাদছে সে। অন্ধ, উন্মত্ত মাহুষের অরণ্যে।

শুধু আগুনই নয়। ভয়াত নারীদের নিয়ে টানাটানি করতেও লাগল
সেই সব জনতা। তাদের মুখে চোখে হিংসা আর কান লালসার কুংসিত,
বীভৎস ছায়া।

দশজন দাড়িওয়ালা একটি সুন্দরী যুবতীকে টেনে নিয়ে গেল একটা
বাড়ীর বারান্দায়। একজন যুবতীর পরিধেয় টান দিয়ে খুলে ফেলল,
তারপর সেই নগ্ন, ভয়-বিহ্বলা নারীকে সে পাষাণের ওপর ফেলে
তার ওপর বলাৎকার শুরু করল। বাকী নয় জন হাসতে হাসতে
ঘিরে দাঁড়াল তাদের। আতর্জনাদ, অভিশাপ, অশ্রুর ধারা।

জটীধারীর দলের একজন কুদর্শন লোক বিরোধী পক্ষের একটি
মেয়েকে দলের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। মেয়েটি বৌদ্ধ লম্বা, আশ্চর্য
সুন্দরী। তার দুটি কালো চোখের তারায় আতঙ্ক।

“আয় ভাই, শালাব যবন-কন্যাকে নিয়ে একটু মজা করি”—সেই
কুদর্শন লোকটা মদ্রা দাঁত মেলে হাসল। দলের সবাই, সমস্তর সায়
দিয়ে বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, মাগীকে খাটো কর”—

অবিন্দম সামনের দিকে ছুটে গেল, “ভাইসব, শোন—হিংসায় উন্মত্ত

হয়ে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছ—শোন, শাস্তিই ঈশ্বর”—

হঠাৎ বসে পড়ল সে। একটা ইট এসে কপালে লেগেছে। হাত দিয়ে ক্ষতমুখ সে চেপে ধরল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল। রক্তের রং কী লাল! আর কি হল চারদিকে? মানুষ কি পুরোপুরি পণ্ড হয়ে গেল!

মুকুন্দ তার হাত ধরে টানল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, “শিগগীর এসো, নইলে মারা পড়বে”—

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না—এদের থামাতে হবে”—

“পাগ্‌লামো করোনা অরিন্দম”—

“আমিই যে এর জগ্গে দায়ী”—

“কে বলছে যে তুমি দায়ী? তুমি কথা না তুললেও এই রগড়া হত, তোমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আর কেউ স্বেচ্ছায় করত”—

“কি ভাবে?”

“ধর্মের নাম করে”—

“ধর্ম কি?”

“যে নীতি অবলম্বন করে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে—অর্থাৎ মানুষ হতে পারে”—

অরিন্দম হাসল, আর সে ধর্মের নাম করে ওরা পরস্পরকে হত্যা করছে তা?”

“তা অধর্ম—ওরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ধর্মপালন করে—ওদের কাছে ধর্ম একটা অহমিকার ব্যাপার—ব্যক্তিগত, জাতিগত অহমিকা। তাই ওরা ভাল না বসে হিংসায় উন্নত। ঈশ্বরকে পায়নি বলেই ওরা অত সহজে হত্যা করতে পারে।”

“কতদিন চলবে তা?”

“যতদিন মুষ্টিমেয় স্বার্থপররা পৃথিবী শাসন করবে—তারা যখন

নিজেদের আসন সম্বন্ধে সন্দেহান হয় তখনই তারা ধর্মের নাম করে
‘জোট পাকায়। আবার এক ধর্মের লোকেরা শাসন করলে অপর
ধর্মাবলম্বীরাও শাসন করতে চাইবে। ফলে অনন্তকালের সংঘাত’—

“তার মানে ? এই উন্নততা দূর করার কি আর কোন পথ নেই ?”
অরিন্দমের কণ্ঠে হতাশা ধ্বনিত হল।

“আছে—একটিমাত্র পথ—”

‘ওড়ম্—ওড়ম্—ওড়ম্—’

দুজনে চমকে উঠল। একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী নগর-রক্ষী এসে
হাজির হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও দাঙ্গাকারীদের ওপর তারা অগ্নি-
গোলক বর্ষণ করছে।

আতনাদ। কোলাহল।

ধর্মের নামে অন্ধ ও উন্মাদেরা এবার সশস্ত্র ফিরে পেয়েছে—চারদিকে
পালাচ্ছে।

মুকুন্দ অরিন্দমের হাত ধরে টান দিল, “চল—পালাও—”

দু’জনে দৌড় দিল, থামল গিয়ে নিরাপদ এলাকায়।

মুকুন্দ ললাটের ঘাম মুছে বলল—“উঃ—বাচলাম—”

অরিন্দম একবার পেছন দিকে তাকাল। আতনাদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের
পর্জ্বনধ্বনি এখনও ভেসে আসছে।

সে মুকুন্দের দিকে তাকাল, প্রশ্ন করল, “একটিমাত্র পথ—তা কি
মুকুন্দ ?”

“শিক্ষা। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে মনুষ্যত্বই, একমাত্র ধর্ম—
ভগবান তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে ভাবে ইচ্ছে সে ভগবানকে পেতে
পারে, কিন্তু ধর্মের নাম করে সেই পথকে কারো ওপর চাপাবার অধিকার
তার নেই। প্রত্যেকেই আমরা স্বাধীন কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকে
জড়িত—প্রতিটি মানুষই মহৎ এবং মানুষই ঈশ্বর—এই শিক্ষাই
ধর্মাকতাকে দূর করবে।”

“কিন্তু কে দেবে সে শিক্ষা?”

“স্বার্থপরের সমাজে তা সম্ভব নয়। এখানে স্বার্থের জন্য ধর্মের নামে, মহাপুরুষদের নামে ভেদ সৃষ্টির উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া হয় কিন্তু মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর মানুষ মানুষ না হলে সে ঈশ্বরের সন্ধান পাবার যোগ্য হয় না।”

“তবে?”

“ভাঙ্কো—এই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করো—স্বার্থপর, লোভীর শাসনকে দূর করো—মহাকাব্যীয় হিংসাক্ষদের নিশ্চিহ্ন করো। যতদিন তা না হবে ততদিন মানুষ ঈশ্বরকে পাবে না—ঈশ্বরকে পাবার পথ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে তা দেখতে পাবে না।”

অরিন্দমের হৃৎচোখ জ্বলে উঠল, তাতে মূগো শব্দ হল, দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, “তাহলে ভাঙ্কো মুকুন্দ—ভাঙ্কো ভাঙ্কো—”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “ভাঙ্কবট তে। শোন, আজ রাতে মনিশঙ্করের ওখানে সজ্জের সভা আছে। তুমিও যেয়ো—”

“যাব।”

বাড়ী ফিরতে ফিরতে অরিন্দম ভাবতে লাগল। হ্যাঁ, মুকুন্দও কথাই ঠিক। মানুষের মনের অন্ধকার দূর না হলে সে ঈশ্বরকে পাবে না। মন অবস্থার দাস। সত্যকে জানতে হলে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার দরকার। লোভ, ত্রিসা আর অসাম্যের মধ্যে সত্য চাপা পড়ে গেছে। ভাঙ্কো—ভেঙ্গে চরমার করো—মানুষকে তার স্বরূপ দেখাও—

সন্ধ্যা হতেই অরিন্দম গিয়ে হাজির হয়েছিল মনিশঙ্করের ওখানে। মুকুন্দ আসতে পারেনি, সে কারখানায় গেছে।

একের পর এক নানা আলোচনা হল। দেশে অনাহার আর মৃত্যুর
হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, জীবনের অনিশ্চয়তা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সরকার উদাসীন, লোভী ধনিকের ও কারখানার মালিকেরা অন্ন, বস্ত্র ও
প্রাণধারণের উপযোগী সব কিছুই গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি
করছে। ফলে জিনিষপত্রের দাম চড়ছে—ওপরে—আরো ওপরে।
মাতৃষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে সব কিছু, মৃত্যুর রাঙা প্রসার-
লাভ করছে। নীচুপাড়ার লোকদের আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। মালিক
প্রভুরা তাদের দুঃখদর্দশাকে চিরস্থায়ীই করতে চায়। স্বতরাং
আর বসে থাকলে চলবে না। আন্দোলনকে স্বদৃঢ় করতে হবে।
নীচুপাড়ার লোকদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে,
জাগাতে হবে, তৈরী করতে হবে। তারপর একদিন দল বেধে বেরুতে
হবে তাদের—বাধা, কারাগার ও মৃত্যুর ভয়, নিষাতন ও অপমানের
শঙ্কা—সব কিছুকে জয় করে তাদের এগোতে হবে, নিজেদের দাবী
জানাতে হবে, নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। রাজী?

নিঃশেষে হাত তুলে সমর্থন জানান।

কর্মীদের নামের ফর্দ তৈরী হল।

ইন্দ্র চিঠি সেখানে, কাছে এসে অরিন্দমের কানে কানে বলল,

“তোমাকেও কর্মী হিসাবে মানোনয়ন করা হয়েছে অরিন্দম—”

“আমাকে!”

“হ্যা—তুমি কি চাওনা?”

“চাই—নিশ্চয়ই চাই ইন্দ্র—”

“বেশ—তবে কাল থেকে লেগে যাও কাজে—”

কাজ শুরু হল।

ঘুম থেকে উঠেই অরিন্দম বেরিয়ে যায়। প্রতিদিন।

। নীচুপাড়ার আঁকাবাঁকা গলির মাঝখানে—পুরোন ইটের বাড়ী, আঁটচালা, টিন আর টালির ছাউনি দেওয়া অসংখ্য বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে বার অরিন্দম। নীচুপাড়ার পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সবত্র।

প্রথম প্রথম মাথা নাড়ে সবাই, বলে, “ওসবের ধার ধারিনা আমরা—শেষে রাজরোষে মারা যাব নাকি?”

কেউ কেউ বলে, “বড় বড় কথা বলোনা ভাই—অদৃষ্টে স্থখ নেই তো হবে কি?”

অরিন্দম তাদের বোঝায়, বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাদের সচেতন করে, তাদের জয় করে।

ফ্যাক্টরীর ভেঁপু বাতাসে ভাসে। তাড়াতাড়ি বাড়ী কিরে নাকেমুখে শাত গুঁজেই সে কারখানার দিকে পা চালায়। যাবার আগে ললিতার দিকে একবার তাকায়। ললিতার হুঁচোখে প্রসন্নতা আর ভালবাসা। তার হৃদয় ভরে ওঠে। ইঁা, সে সংগ্রাম শুরু করেছে।

মারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা পাটুনির পরও তার আগ্রহ একতিল কমে না। কর্মাবসানের বাঁশী বাজলেই সে বাইরে বেরোয়। তখন দিনাংসানের বক্টিম ঘোষণা আকাশের গায়ে মেঘের অক্ষরে লিখিত হয়। সেদিকে তার খেয়াল থাকে না। বড় বড় পা ফেলে সে নীচুপাড়ার সংকীর্ণ গলির বুকে পা দেয়।

অপরিস্রব আবহাওয়ার মাঝে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পচা জল, মরা মাছি, ইঁদুর আর আবর্জনায় ভরা নীচুপাড়ার মাহুদের কাছে গিয়ে সে সংগ্রামের ঘোষণা জানায়। জাগো, মুক্তির দিন, মাহুদ হবার দিন ঐ সময়গত।

দীর্ঘ দীর্ঘে নাড়া জাগে। মৃত আগ্নেয়গিরির বুকে আগুন জলে, টগবগানি শুরু হয়। কোটরগত চোখের মাঝে আগ্নেয়গিরির জলন্ত মুখকে দেখা যায়। লোভ লালসা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের মাঝে

মহুগ্ৰাহের মহৎ প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হয়, পক্ষের মাঝে পদ্ম জন্মায়।
মৃষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সবাই জানায় যে তারা তৈরী। ভেঙ্গে ফেলো,
জীবনের চারদিকে যে লোহার দেয়াল আলো, বাতাস আর আকাশকে
আড়াল করেছে তাকে ভেঙ্গে চূরমার করো।

কবে ?

সংগ্রাম-ঘোষণার দিন স্থির করার জ্ঞাত সভা আহত হয়। নীচুপাড়ার
চারাদক থেকে নেতারা ও কর্মীরা আসে, সবার মাঝে মণিশঙ্কর।

দিন স্থির হয়। আর দু'দিন পরে।

কি ভাবে ?

উত্তর পাড়ার নেতা বলল, "উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হব আমরা—"

মণিশঙ্কর বলল, "অত ঘুরে যাবার দরকারটা কি ? নীচুপাড়ার
মাকখানে জড় হব আমরা তারপর সোজা রাস্তা ধরে এগোব—"

পূর্বপাড়ার নেতা অবজ্ঞাসূচক তেমে মাথা নাড়ল, বলল, "উহ—
আমার মতে তা ঠিক হবে না দাদা—পূর্বদিকের গিরিপথ দিয়ে এগোনই
উচিত—"

দক্ষিণপাড়ার নেতা বলল, "কেন ? দক্ষিণদিক দিয়ে গেলে কি
হবে ?"

পশ্চিমপাড়ার নেতা অসহিষ্ণুভাবে টেঁচিয়ে উঠল, "অসহীন প্রলাপ
বকছ কেন ? পশ্চিম দিক দিয়ে এগোলে কি ক্ষতিটা হবে ?"

মণিশঙ্করের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, "তাহলে কি স্থির করছ তোমরা
তাই বল—"

"উত্তরে—"

"দক্ষিণে—"

“পূবে—”

“পশ্চিমে—”

“না—”

“হ্যা—”

“তা হতে পারে না—”

“আলবৎ হবে—”

চারদিকের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ছেলেমানুষের মত সবাই চোচামেচি শুরু করল।

মনিশঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল, “শোন, তোমরা স্বার্থপরের মত আত্ম-প্রাধান্ত জাহির করার চেষ্টা করো না। মানুষের মঙ্গল করতে গেলে নিজেদের কথা ভুলতে হয়—”

চারদিকে প্রতিবাদ প্রসিক্ত হল।

“এ অগ্রাঘ—”

“আমরা কেউ নিজেদের কথা ভাবিনি—”

“আমি ও না—আমাদের মতে উত্তর দিকই নিরাপদ পথ—”

“কেন পূব দিক দিয়ে কি তোমরা যাবে না?”

“না।”

“পশ্চিমে?”

“না।”

“দক্ষিণে?”

“না—”

মনিশঙ্কর বলল, “তাহলে কি করবে তোমরা স্থির করো।”

উত্তর দিক বলল, “আপনার কথা আমরা মানতে রাজী আছি—
কিন্তু উত্তর দিক দিয়ে আপনি চলুন—”

দক্ষিণ প্রতিবাদ জানাল।

পূব পশ্চিমের প্রতিবাদও ধ্বনিত হল। উত্তেজনায সবার চোখ জ্বলতে লাগল।

মনিশঙ্কর হতাশভাবে তাকাল তাদের দিকে, প্রশ্ন করল, “তাহলে?”
চারদিকের নেতারা বলল, “ব্যাপারটা একটু পেছিয়ে দিন দাদা—
আমরা আপনার কথা ভেবে দেখি।”

“কিন্তু বিপ্লবের মাহেজ্জফণ কি তোমাদের জন্য বসে থাকবে?”

কেউ জবাব দিল না। সভা ভঙ্গ হল।

একে একে বিদায় নিল সবাই। শুধু কয়েকজন রইল। বারা
মনিশঙ্করের একান্ত অন্তর্গত। অরিন্দমও রইল।

মনিশঙ্কর বিষন্ন হেসে বলল, “ওরা ভয় পেয়েছে। অহমিকায় আচ্ছন্ন
হয়ে ওরা সত্যকারের পথকে অগাহ্য করছে”—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “তাহলে কি হবে?”

“নীচুপাড়ার লোকদের মত জিজ্ঞেস করো—তারা কি আমাদের পথ
দিয়ে এগোবে?”

আবার কাজ শুরু হল। প্রতি ঘরে ঘরে।

কিন্তু না। কেউ সাহস পাচ্ছে না। উত্তর, দক্ষিণ আর পূব
পশ্চিমের নেতারা তাদের বিভ্রান্ত করেছে। তারা ভাবছে যে নেতারা
যখন মতদ্বৈধতায় বিব্রত তখন দা'গ্রাম করে কি ফল হবে? উত্তেজনা
বুক তাদের জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন পথ ঠিক তা তারা বুঝতে পারছে
না। অদৃষ্ট, দুঃখভোগ করাই তাদের বিদিলিপি।

তুনে মনিশঙ্কর দাঁত দিয়ে চোঁট কামড়াল, বলল, “লোকেরা এখনো
তৈরী হয়নি অরিন্দম। আবার কাজ শুরু করো ভাই, আবার আগুন
ছড়াও। যখন ওরা তৈরী হবে তখন উত্তর দক্ষিণ আর পূবপশ্চিম ওদের
পথভ্রান্ত করতে পারবে না। তখন ওরা নেতাদের জন্য বসে থাকবে
না।”

“তাহলে কি”—

মনিশঙ্কর মাথা নাড়ল, “হ্যা, এখন নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন আরো পিছিয়ে গেল। উপায় নেই অরিন্দম—কাকে নিয়ে সংগ্রাম করতে তুমি? একজন সৈনিক কি যুদ্ধ-জয় করতে পারে? হতাশ হয়োনা ভাই, আগুন ছাড়িয়ে যাও,—সবাইকে সাহসী করে তোল—আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।”

অরিন্দমের ললাট রেখাযুক্ত হয়ে উঠল।

রাত্রে ঘুম এল না অরিন্দমের। মনিশঙ্কর হতাশ না হতে বলেছে, কিন্তু তবু তার মন দমে গেল। সবাইকে সাহসী করতে হবে, সচেতন করতে হবে! কিন্তু কবে, কবে তৈরী হবে সবাই? স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়েছে কাড়াল নেতারা তাই মাড়ষের ভাণ্ডা নিয়ে আজবনগরের শাসকদের মত তারাও এপথ আর সেপথের নাম করে কলহে মত্ত হয়েছে। তাহলে কি হবে? কবে?

রাত গভীর হয়। নীচুপাড়ার অন্ধকার গলিতে ইদুর আর ছুঁচোদের চলাচল শুরু হয়, কুকুরেরা ভয় পেয়ে কাঁদে। অরিন্দম ভাবে। তার প্রতিজ্ঞা কি পূরিত হবে না? পৃথিবী থেকে পাপশক্তিকে সে কি দূর করতে পারবে না?

ভয় হয় তার। ক্ষীণভাবে মনে পড়ে তার। বহুদূরের এক মণিময় কক্ষে সে থাকত। পুতুলদের ক্লাস্তিকর আনন্দময় রাজ্যে। হঠাৎ সে মাহুষ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির কি খেয়াল হবে কে জানে! হঠাৎ একদিন অতকিতে সে যদি আবার পুতুল হয়ে যায়? নিশ্চয়তা কোথায়? তাহলে? তার এই মাহুষের জীবন কি কার্য হবে, নিফল হবে?

না। তা হতে পারে না, সে তার মানবে না, সে অপেক্ষা করবে না। পৃথিবীকে সে পাপমুক্ত করবেই, অমাহুষ আর পশুদের সে নিশ্চিহ্ন করবেই করবে।

রাত কেটে গেল। ভোর হল। বাড়ী থেকে বেরোল না

অরিন্দম, অশান্ত হৃদয়ে অনিদ্রিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াল। মৃত্যু, বাধা, স্বভাব আর অজ্ঞতা চারদিকে। চারদিকে শুধু বিষ।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার মাথায় বৃষ্টি এল। আজবনগরের শাসকেরা শক্তিমান। শক্তিমান। শক্তিমান বলেই তারা শাসন করে। ইচ্ছে করলে, লোভ ও হিংসাকে বর্জন করলে তারা নিশ্চয়ই মানুষের দুঃখ দূর করতে পারত, কিন্তু তা করেনি। ক্ষমতালোভে তারা অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি ঐ শক্তিমানদের কেউ হত তাহলে সে একবার চেষ্টা করত তাদের অস্তরের পরিবর্তন করতে।

অরিন্দম ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। শক্তিমান কি হওয়া যায় না? তাহলে হরত অতি দ্রুত ফল ফলত, রাতারাতি মানুষের ভাগা বদলে যেত, তাদের দুর্ভাগ্য দূর হত। কিভাবে, কি করে শক্তিমান হওয়া যায়?

ভাবতে ভাবতে মনস্থির করে কেলল অরিন্দম। তাকে শক্তিমান হতেই হবে। তার আর দৈর্ঘ্য নেই, সময় নেই। আর ক'দিন কে কে জানে—তার এই ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবনকে সে সার্থক ও গৌরবান্বিত করে তুলবে, পৃথিবীর সমস্ত পাপকে সে ধ্বংস করবে, মানুষের দুঃখকে সে দূর করবে।

কিন্তু কি করে শক্তিমান হওয়া যায়? কি করে?

ফ্যাক্টরীতে সে সবাইকে জিজ্ঞেস করল, “কি করে শক্তিমান হওয়া যায়, তোমরা জানো।”

মাথা নাড়ল সবাই। কেউ জানে না।

সঙ্কোবেলায় বাড়ী ফিরল অরিন্দম।

পারের শব্দ পেয়ে ললিতা ছুটে এল ঘরে। তাব ছুঁচোখে ভালবাসার স্পন্দ আলো।

“ইস, মুখ চোখ যে ভারী শুকনো দেখছি”—

“হু”—

“হাতমুখ ধোও”—

“হু”—

“শরীরের দিকে একটু নজর দিও। দেহপাত করলে মানুষের দুঃখ দূর করবে কি করে?”

“ললিতা”—

“কি?”

“শোন”—

“কি?” ললিতা ছুঁপা কাছে এগিয়ে এল, তার আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি মেলে বিচিত্র ভঙ্গীতে তাকাল।

অবিন্দম প্রশ্ন করল, “কি করে শক্তিমান হওয়া যায় তা কি তুমি জানো ললিতা?”

মুহূর্তে ললিতার চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল, মুখের প্রসন্নতা তার দূর হয়ে গেল; ভীষকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, “কেন? তুমি কি শক্তিমান হতে চাও?”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“আমার আর পৈষ নেই ললিতা, আমি আর সন্তুষ্ট করতে পারছি না”—

“শক্তিমান হলেই কি তুমি মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবে?”

“পারব।”

ললিতা বিষমভাবে মাথা নাড়ল, “শক্তি মানুষকে অন্ধ করে—তুমি শক্তিমান হতে চেয়োনা।”

“কিন্তু ললিতা”—

“তাছাড়া আমি তো জানি না কি করে শক্তিমান হতে হয়।”

“জানোনা?”

“না। শোন”—

“কি?”

“তোমার কথা শুনে আমার ভয় করছে।”

অরিন্দম ললিতার একটা হাত টেনে নিল, মুহূ হেসে বলল, “তোমার ভয় করছে! তাহলে থাক, আর এসব কথা আমি বলব না।”

“না, বলোনা। তুমি যা করছ তা কি কম? তাতেই আমার বুক ভরে উঠেছে। শক্তিমান হলে মানুষ মানুষের কথা ভুলে যায়—তুমি তা হয়োনা, আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। তুমি তা হলে আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব”—

অরিন্দম কথা বলল না। নিঃশব্দে শুধু হাসল!

কিছুক্ষণ বাদে মুকুন্দ এল।

সহাস্ত্রে সে বলল, “কি ভাবছ হে? ভেবে ভেবেই সমাজ-সেবা করছ নাকি?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, গম্ভীরকণ্ঠে বলল, “আচ্ছা মুকুন্দ”—

“কি?”

“কি করে শক্তিমান হওয়া যায় তুমি জানো?”

“না। তুমি শুধু শক্তিমানেরাই জানো।”

“আচ্ছা, শক্তিমান হলে কি মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না?”

মুকুন্দ হাসল তার দিকে তাকিয়ে, “বসে বসে এই সব উদ্ভট চিন্তা করছ? শক্তিমান হলেই যদি মানুষের দুঃখ দূর করা যেত তাহলে তো অনেক আগেই সমস্তা মিটে যেত।”

“কেন?”

“কারণ শক্তিমানেরা তো সংখ্যায় কম নেই পৃথিবীতে।”

“তারা হয়ত পারে না—কিন্তু আমরা শক্তিমান হলে হয়ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।”

মুকুন্দ জোর গলায় বলল, “না। তা হয় না। শক্তি মানুষের মনে

বিকার সৃষ্টি করে—সেই বিকার তাকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তোলে।”

“কিন্তু”—

“শোন অরিন্দম, মনের মধ্যে ওসব পাপচিন্তার স্থান দিও না, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। তাছাড়া ফাঁকি দিয়ে মানুষের ভালো করা যায় না। মানুষের ভালো করার পথ একটিই আছে আর সবাই এক জোট না হলে কিছুই হবে না—একা কেউ কিছু করতে পারে না।”

“কিন্তু তাতে যে অনেক সময় লাগবে।”

“লাগুক, কিন্তু সেই ঋব পথ। এতদিনের দুঃখহৃদশা কি এক মুহূর্তেই দূর হবে? প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘ্য করোনি? ধ্বংস হয় এক মুহূর্তে কিন্তু সৃষ্টি হতে সময় লাগে।”

অরিন্দম আর কথা খুঁজে পেল না। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দতা নেমে এল। না, এরা বলবে না। এরা দুঃখবিলাসী, তাই দুঃখ সহ করতেই ভালবাসে। সে একা, একা।

“কে? ঘরে কে?”

অরিন্দম চমকে উঠল। ঘরের ভেতর ঢুকল বলরাম। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে বলরামের? কাঁচাপাকা চুলগুলো তার ঝেঁপে ফুলে উঠেছে, বলিষ্ঠের ললাট আর মুখে চিন্তা আর ক্লেশের ছাপ, দু'চোখের তারায় উন্মাদের চকল ও লক্ষ্যহীন দৃষ্টি।

“কে? কে ওখানে?” ভুরু কুঁচকে কাছে এগিয়ে এল বলরাম, বাড় কাৎ করে অরিন্দমের দিকে তাকাতে লাগল।

কি হয়েছে বলরামের? মস্তিষ্কের মত তার দৃষ্টিও কি দুর্বল হয়ে পড়েছে?

অরিন্দম অস্বস্তিবোধ করে নড়ে বসল, বলল, “আমি—অরিন্দম”—

যেন অতল জল থেকে ভেসে উঠল বলরাম, যেন তার চেতনা কোন এক আদিম অন্ধকার পৃথিবী থেকে ফিরে এল, মাথা নেড়ে সে বলল,,

“ওঃ, তাই বলো”—ঘুরে দাঁড়াল সে, ঘুরতেই মুকুন্দকে দেখে আবার ঘাড় কাৎ করে ছেলের দিকে এগোতে লাগল সে, চাপাগলায় প্রশ্ন করল,
“কে? তুমি কে?”

“মুকুন্দ! ওঃ—তাই—তাই বলো”—

মুকুন্দ মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, “আমি—মুকুন্দ”—

বিড়বিড় করতে করতে সে দরজার দিকে হুঁপা এগোতেই আবার খামল, মুকুন্দ ও অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশ্ন করল,
“আচ্ছা শোন, তোমরা রসাতল চেন—রসাতল?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না।”

“চেন না!” স্ববিরের কর্ণে উত্তেজনা গম্‌গম্‌ করে উঠল, “রসাতলের কথা শোননি তোমরা!”

যেন কোন মূল্যবান গোপন কথা বলছে সে এমনি ভঙ্গী করে বলরাম আবার বলল, “দূত এসেছিল—রসাতলে যাবার নেমস্তম্ভ জানিয়ে গেছে। যাবে তোমরা?”

নিঃশব্দতা। কি জবাব দেবে তারা?

বলরাম হুজনের দিকে তাকিয়ে কি যেন আঙুল নিজের মনে, তারপর বলল, “সাবধান, খুব সাবধানে থেকো—স্বপ্ন দেখো না, আশা করো না, বিশ্বাস করো না”—

বলতে বলতে খামল সে, ক্লান্ত, শীর্ণ হাসিতে তার মুখ ভরে গেল, ভাঙা গালের চামড়া ছুঁচকে গেল। হাসতে হাসতে মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে ঘর থেকে নিঃশব্দ হল।

নিঃশব্দতা।

গভীর নিঃশব্দতা।

হঠাৎ মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাদচারণ শুরু করল। কিন্তু দ্বার চলাফেরা করেই সে খামল, হলতে লাগল।

তারপর সে ঘুরে দাঁড়াল। অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দের চোখে জলের ছায়া।

মুকুন্দ হাসল, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, “বাবা পাগল হয়ে গেছে অরিন্দম”—

অরিন্দম বাধা দিল, “না মুকুন্দ—না”—

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, তিক্ত হেসে বলল, “আমি এত দুর্বল হইনি অরিন্দম যে তুমি আমাকে প্রবোধ দেবে। হ্যাঁ, বাবা পাগল হয়ে গেছে। কেনইবা হবে না? সারাজীবন ধরেই কি মানুষ বঞ্চনা সহ করতে পারে?”

নিঃশব্দতা।

বাইরে রাতের নদে গভীর হচ্ছে।

মুকুন্দ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শূণ্যের মধ্যেই একটা আঘাত করল, যেন তার মনের দুর্বলতা, তার এই ক্ষণিক আত্মবিশ্বাসকে ঘূষি মেয়ে সরিয়ে দিল। কি হবে ভেবে? ছুচোখ তার জলে উঠল।

“অরিন্দম”—

“কি?”—

“একটা টাকা দার দেবে?”

“দেব—কি করবে?”

“একটু মদ খেয়ে আসি—বিষ না হলে বিষক্ষয় হবে না।”

পকেট হাংড়ে একটা টাকা বের করল অরিন্দম। সেটা ছোঁ মেলে নিয়ে মুকুন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীরে দীরে তার জুতোর শব্দ গলির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একা।

রাত বাড়তে থাকে।

কি বলল ললিতা? কি বলল মুকুন্দ? প্রায় একই কথা। শক্তি নাশ্বকে অন্ধ করে, শক্তি বিকারের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই কি? এখন

রাতের কোন প্রহর? রূপসী নদীর জলে কি তারাদের ছায়া
কাঁপছে?

প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে। দেয়ালের গায়ে একটা টিক্‌টিকি হাটছে।
মেই মনিময় হর্ম্যে কি এখন বাহারের আলাপ চলছে? বাতাস বইছে।
বাতাসে নর্দমার পচা জলের গন্ধ আর মুদঙ্গের ধনি। কে নাচে? সেই
সুতনু নর্তক না সেই স্বর্ণকেশী নর্তকী? কি বলল ওরা? শক্তি
বিকারের সৃষ্টি করে। তার অর্থ বিকার সৃষ্ট না হলে শক্তি দিয়ে কাজ
হবে। ই্যা, তাকে শক্তিমান হতে হবে। অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে সে বাচাই
করবে তাদের কথা, যাচাই করবে নিজে। কোথায়? কেন এই
গোড়ামী? সোজা পথে না গিয়ে বাঁকা পথে গেলেই বা কি? না, সে
আর সহ্য করবে না। প্রতিটি দুঃখের, কখন কি অঘটন ঘটবে কে জানে।
তুলু মাছুষের জীবনকে পেয়ে সে বসে থাকতে পারে না। দুঃখীর
সংঘবদ্ধ হোক—তাতে সময় লাগবে। কিন্তু তার আগে সে যদি পরিবর্তন
ঘটাতে পারে? কিন্তু কি করে, কি করে শক্তিমান হওয়া যায়?

নাঃ, ঘরে দম আটকে আসছে। অরিন্দম উঠল। রাত বেশী হয়নি,
এখনো বাইরে যাওয়া যেতে পারে। কি করে শক্তিমান হওয়া যায়?
কি করে?

পথ বড় না লক্ষ্যস্থল বড়? সাধনা বড় না সিলি বড়? চলতে
চলতে নিজে নিজেই প্রশ্ন করে অরিন্দম। কিন্তু না, আর থিরা নয়,
বন্দ নয়, তাকে শক্তিমান হতেই হবে। চিত্ত শাস্ত হোক, ইম্পাত
কটিন হোক তার মন, তার জয় হবেই হবে।

চলতে চলতে ভাবতে লাগল সে। শক্তিমানেরা শাসন করে,
দেশকে পরিচালিত করে। আজবনগরের শাসকেরাও শক্তিমান।

কিন্তু কিসে তাদের শক্তি? আত্মবিক্রতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, মহত্ব, আত্মত্যাগ? উচ্ছ, তা তো নেই তাদের। তবে? নিষ্ঠুরতা, হিংসা, লোভ, লালশা। কিন্তু শক্তি না হলে তা কি করে টিকে থাকে? তাহলে কি?

হঠাৎ যেন তার স্তম্ভিত চেতনার বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যেন বুঝতে পারল। আজবনগরের কর্তারা, চতুর্দল, পুণ্ডরীক, ত্রিদিববাবু—কিসের জোরে তারা শক্তিমান? শুধু একটি বস্তুর জড়। টাকা। যার মত টাকা সে তত বেশী শক্তিমান। হ্যাঁ, ধনবান হলেই শক্তিমান হওয়া যায়। কিন্তু কি মুদ্রিল! একটা জট ছাড়াতেই যে আর একটা জট এসে দাঁড়াল সামনে! আর একটা নতুন প্রশ্ন—কি করে ধনবান হওয়া যায়? কি করে?

না, সে কিরবে না এখন। প্রশ্নের জবাব চাই তার।

অরিন্দম এগিয়ে চলল।

গলি। গলির পর গলি। আবার গলি।

বিবর্ণ বাষ্পালোকের ভৌতিক জ্যোতির পর অন্ধকার। তারপর আবার আলো।

ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা গন্ধ। দুর্গন্ধ।

রাস্তার পাশে, বাড়ীর বারান্দার, নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের বেপরোয়া শব্দ।

এখানে ওখানে বৃক্ষের জলন্ত চোখ। বেড়ালের ডাক। টুকরো টুকরো কথা আর হাসি আর কান্না।

প্রান্ত, নিরানন্দ মাহমদের ছন্দোহীন পদক্ষেপ

নীচুপাড়া আর উচুপাড়ার সীমান্তে গিয়ে পৌঁছোল সে। দূর থেকে উচুপাড়ার গগনম্পর্শী মৌদাবলীর অগ্নোদিত কক্ষগুলোকে যেন নীপমালার নত মনে হচ্ছে। উচুপাড়ার আলো উচুপাড়ার আকাশকেও আলোকিত করেছে। এখানে এখন নাচগান আর হাসির কোয়ারা।

তোমার পতন হবে, হে মদগবী ঊচুপাড়া, তোমার সৌধাবলী একদিন
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে—এই ইতিহাসের সত্য।

হঠাৎ অরিন্দম থামল। তার সামনে, রাস্তার মাঝখানে একজন
স্ববেশ ও স্তূর্দর্শন যুবক শুয়ে আছে। সে বুঝল যে যুবকটি আকণ্ঠ
মত্তপান করেছে। কিন্তু কি বিপজ্জনক ভাবে সে রাস্তার মাঝখানে
শুয়ে আছে! যে কোন মুহূর্তে সে গাড়ীচাপা পড়তে পারে।

রাস্তায় লোকচলাচল আছে বটে কিন্তু কেউ যুবকটির দিকে কিরেন
তাকাচ্ছে না।

অরিন্দম একজনকে থামিয়ে বলল, “এই ভদ্রলোককে একটু পরন
না ভাই, রাস্তার একপাশে সরিয়ে দিই—”

লোকটি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল, “ক্যাটা মদ খেয়েছে—”

“হ্যা—”

“মরুকগে ছাই—তুমিও যেমন—”

হনহন করে লোকটি এগিয়ে গেল। দূরে দূরে একটা বাষ্প
যানকে সবগে আনতে দেখা গেল। একাঠি সন্ধ্যাত্তে হবে। অরিন্দম
যুবকটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে একটা বাড়ীর ব্যান্দার নামান।

কাঁকুর্নার চোটে লোকটার নেশার আমেজ বোধ হয় একটু নাড়া
খেল, চোখ দুটো ঈষৎ মেলে সে জড়িতকণ্ঠে বলল, “তুমি কে বাবুয়া!”

অরিন্দম বলল, “আমি—আমি আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে
এলাম—”

যুবকটি একটু জিভ বার করে ঠোঁট দুটো শিকড়ে নিয়ে বলল,
“কেন বাওয়া?”

“আপনি রাস্তার মাঝখানে শুয়ে ছিলেন—আপন একটু হলেই
গাড়ীচাপা পড়তেন—”

মাতাল যুবক চোখ দুটো বড় করে কাতরকণ্ঠে বলল, “সত্যি?
মাইরি? চাপা পড়িনি তো?”

“না।”

“তুমি আমাকে বাঁচিয়েছে! পছন্দ—তোমার উপকারের কথা
আমার চিরকাল মনে থাকবে—”

“না না ও কিছু না—এতো আমার কর্তব্য।”

যুবক চোট উল্টোর, “দোহ—কর্তব্য না হাতী। তুমি আমাকে
বাঁচিয়েছে—ইন্স, গাড়ীচাপা হলে এককণ হয়তো অক্স পেয়েই যেতাম।
বল ভাই, কি চাই তোমার? টাকা?”

অরিন্দম মাথা নেড়ে জানাল—না। যুবকটির দিকে দে তাকাল।
তার বেশভূষায় ঐশ্ব্যের ছাপ সু্পরিষ্কৃত।

যুবক বলল, “বাং, না কেন? তোমার নিতেই হবে টাকা। টাকা
না নিলে আর কিছু নিতে হবে। কি চাই তোমার, বল?”

অরিন্দম ভীষ্মদৃষ্টি মেলে তাকাল যুবকটির নিকে, বলল, “আমি
কি চাইব তাই দেবেন আপনি?”

“আলবৎ—”

“তাহলে টাকার বদলে অল্প কিছু চাই।”

“কি?”

“একটা কথা জানতে চাই—”

“বলে কেনো ভাই—চটপট—”

“শক্তিমান কি করে হওয়া যায় বলুন তো? ধনবান হলে?”

যুবকটি উলটে উলটে উঠে বসল, ভুরু কুঁচকে আদ্যব্যকণ চোখ
দুটোকে জোট করে সে বলল, “কেন বা এরা? এসব তত্ত্বকথা আবার
কেন?”

“বলুন না—”

“বলব আবার কি? তুমি ঠিকই ধরেছ।”

অরিন্দম যুবকটির কাছে ঘোঁষে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল, “তাহলে
আল কথটির জবাব দিন এবার—ধনবান কি করে হওয়া যায়?”

যুবকটি একমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল, “বাদ্যকার কি বাজায়, তুমি যে আমার নেশা ভাগিয়ে দিচ্ছ !”

অবিন্দম একটু হাসল, “উল্লেখ হলে আপনি নাও বলতে পারেন।”

যুবকটি একটু ভাববার চেষ্টা করল, অবিন্দমের দিকে তাকিয়ে নিষেন সে মীমাংসা করে নিল, তারপর বলল, “না, বলব আমি বাজায় কি জানো ? তুমি যা জানতে চাইছ তা গুপ্তকথা—সে কথা একমাত্র দনবানেরাই জানে এবং দনবানদেরই তারা দেখে জানায়। তুমি দনবান নও কিন্তু আমি তোমার উপকারের স্বার্থকে শোধ করবই, কারণ দনবান হলেও আমি একটু ভিটিগম্ভ। কিন্তু ইং—নেশাটা যে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে ডাই—”

“বলুন—”

“বলছি যে দাদা, বলছি। দনবান হবে ? বেশতো, ডালিয়ারটা জোচ্চুরী, প্রতারণা কর—”

“রাতারাতি কি করে দনবান হওয়া যায় ?”

এদিক ওদিক তাকিয়ে গলাব স্বর নামিয়ে যুবকটি অবিন্দমের কাছে মুখটা নিয়ে এল, বলল, “স্বপ্ন—আহু—তাড়াতাড়ি কথ্য বলতে বেশতো, চুরী, ডাকাতি, গন আর লুটপাট করে,—”

“সেকি !”

“স্বপ্ন—অবাক হয়েন—আর শোন, এটা গুপ্তকথা কিন্তু আর কাউকে বলোনা—”

“না—”

“শপথ কর।”

“শপথ করলাম—কাউকে বলবনা।”

“তুমি দনবান হতে চাও ?”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে যা বললাম তাই কর—টাকা হলে আমার সঙ্গে দেখা

করা—আরো সাহায্য করব তোমাকে। আমার নাম দেবদত্ত—মনে থাকবে? উচুপাড়ার সবাই চেনে আমাকে।”

“থাকবে।”

“একটা গাড়ী থেকে নেবে দাদা? আমি এবার বাড়ী যাব—”

“দিচ্ছি।”

একটা বাষ্পবান খামিরে দেবদত্তকে চাপিয়ে দিল অরিন্দম। গাড়ীটা উচুপাড়ার দিকে চলে গেল।

অরিন্দম ভাবতে লাগল। এবার? দেবদত্তের কথা কি সত্যি? মাতালের কথা? কিছু মিথ্যাই বা কি করে প্রমাণিত হবে? মাতাল ছিল বলেই হয়ত নেশার ঘোরে সে সত্যকে প্রকাশ করে গেছে। পাপ না করলে খনৌ হওয়া যায় না—বর্তমান সমাজবাবস্থার এই তো নিয়ম। শোষণকারীর সৌভাগ্য এবং শোষিতের দুর্ভাগ্যকে সেই সমাজ-বাবস্থা ভাগ্যলিপির নামে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে। না, সে বিচলিত হবে না। দেবদত্তের কথায় সত্যতা আছে। তাহলে? করে?

কবে?

নিজের ঘরে ফিরে এসে অরিন্দম ভাবতে লাগল। কবে সে শক্তিমান হওয়ার পথে পা দেবে? মুকুন্দ এ পথকে স্বীকার করবে না, ললিতাও তার দাদার মতাবলম্বী। তাহলে? এ বাড়ীতে থাকলে মত আর পথ নিয়ে সংঘর্ষ হবেই। সুতরাং এ বাড়ীকে ত্যাগ করতে হবে। ফ্যাক্টরীর কাজ? তাও ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, হৃদয়বেগকে বর্জন করতে হবে। শক্তিমান না হওয়া পর্যন্ত সে আর ললিতার কাছে ফিরে আসবে না।

প্রদীপের শিখরী কাঁপছে। তার তেল ফুরিয়ে এসেছে।

বাইরে গলির কিছুটা দেখা যায়। অন্ধকার।

মুকুন্দ এখনো ফেরেনি। হয়ত মদ খাওয়ার পর্বটা তার এখনো সাঙ্গ হয়নি।

ললিতা হয়ত স্বপ্ন দেখছে। মেঘের মত কালো চূপের মাঝে তার চাঁদের মত মুখে হয়ত এখন স্বপ্নের নরম ছায়া। হয়ত তারি স্বপ্ন দেখছে ললিতা। সেই ললিতাকে ত্যাগ করে যেতে হবে! ভোরবেলায় উঠে ললিতা কি ভাববে? তাকে যখন আর খুঁজে পাবেনা তখন ললিতার মুখেচোপে কি বেদনার অন্ধকার নেমে আসবে? বাতাসে নর্দমার হুর্গন্ধ।

রাত কত? রূপসী নদীর জলে কি এখন ক্ষীরোদ সমুদ্র-স্নাত চন্দ্রদেবের প্রতিবিম্ব তরঙ্গাবাতে কাঁপছে? মায়াময় রাতের রহস্য কি এখন মল্লারের তানে বাণীলাভ করছে? কে ডাকে? তার অন্তরের সেই অসিধারী গ্রহরী!—জাগো—জাগো—৬-৬-৬-

না, মাগা নয়, মমতা নয়, মোহ নয়। প্রেম সত্য বলেই তো প্রেমের শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে। প্রেম সত্য বলেই তো সংগ্রাম করতে হবে, তার উপযুক্ত পৃথিবী গড়তে হবে। বীজবপন করার আগে যে পরিদ্রষ্টকে কর্ষণ করতে হয়। ই্যা, আমি ছেগে আছি গ্রহরী—আনি ভুলিনি—প্রেমসীর বেদনাও আমাকে ভোলাতে পারবে না—আমার অর্ধেক হৃদয়পিণ্ডকে এখানে হাবালেও আমি মন্তগাহের যতান আত্মনাকে উপেক্ষা করব না। গ্রহরী, শোন—বজ্রপানি দেবতার মত আমি দৃঢ়—

“মুমো গনি?”

কে? পূর্ণিমা-রাতের স্বপ্ন কি মৃতি পরিগ্রহ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল?

“এখনো ছেগে আছি?”

কে ? একি তার আত্মার আত্মা ? পৃথিবীর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ ও বর্ণ কি দেহধারণ করেছে ? পৃথিবীর সমস্ত হ্র কি মুহূর্তে একটি মৃৎ কণ্ঠস্থরে পরিণত হয়েছে ?

“ঘুম আসছিল না—বারান্দায় বেরিয়ে এদিকে আলো দেখে এলাম”—

প্রদীপের শিখাটা থরথর করে কাঁপছে ।

“ললিতা”—

“কি ?”

“ললিতা”—

“কি ?”

ললিতা অবিন্দমের দিকে তাকাল । অবিন্দম কাছে এল, ললিতা'র ডটে হাতকে নিজের হাতে তুল নিল । একি বিচিত্র পুলকানুভূতি ! সমস্ত দেহ যেন আবেশে অবশ হয়ে আসছে, সমস্ত পৃথিবী যেন এখন একটিমাত্র নারীর নাকে হারিয়ে গেছে, সমস্ত চৈতন্য যেন দু'চোখের দৃষ্টি আর দশ আঙুলের অগ্রভাগে এসে সঞ্চিত হয়েছে ।

“কি হল তোমার ?” অমন করে কি দেখছ ?”

“তোমাকে ।”

“কেন ?”

“কে জানে ? যদি ভোরবেলায় আর না দেখতে পাই তোমায় ?”

“কি বাজে কথা বলছ তুমি !”

“বাজে কথা ! হবে । তবু তোমাকে নথি ললিতা—”

“দেখ—দেখ—” ললিতার কণ্ঠস্থর যেন শোনাই গেল না ।

প্রদীপের শিখাটা দপ্ দপ্ করছে—এবার নিভবে । হাতের মূঠায় হাতগুলো কাঁপছে । দুজনের হাতের শিরাগুলো একতালে লাফাচ্ছে । সন্মোহিতের মতো তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ।

ওদিকে রাত বাড়বে। কোথায় যেন হল্লা হচ্ছে। বহুদূরে কে যেন গান গাইছে।

ললিতা বলল, “ছাড়ো—”

“আর একটু দেখি—”

“দাদা এসে পড়বে।”

“আর একটু—”

“মা ভেগে উঠবে—”

“না—”

প্রদীপট, নিভে গেল।

“ছাড়ো—”

“কেন ললিতা ?—”

“অন্ধকারেও কি দেখবে নাকি আমার ?”

“দেখব—স্পর্শের ভেতর দিয়ে দেখব তোমাকে।”

“আমার ভয় করছে।”

“কাকে ?”

“নিজেকে।”

“কেন ?”

“হয়ত তোমাকে তখনও পেরে ফেলব—তোমাকে বাস্তবের অতীত

ভালিয়ে দেব—”

“ললিতা—”

“কি ?”

“আমারও ভয় করছে।”

“তাহলে যাউ ?”

“যাও।”

অবিস্ময় হাত ছেড়ে দিল, কাপতে লাগল। সমস্ত দেহে এ বিস্ময়ের আকুতি ? শান্ত হও মন, স্থির হও।

“ললিতা—”

“আমি যাচ্ছি—”

“ললিতা—আমি তোমাকে ভালবাসি—”

দ্বারপ্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ভেসে এল, ভেসে এল, “আমি—
আমিও তোমাকে ভালবাসি—”

লঘু পায়েল শব্দ মিলিয়ে গেল।

অন্ধকার।

হ্যাঁ, মীমাংসা হবে গেছে। আজই। এই মুহূর্তে। অপেক্ষা
করার সময় নেই। নিজের জন্য অপেক্ষা করা যায় কিন্তু সন্যাস-
সমাজের জন্য দেবী করা যায় না। সে অধিকার তার নেই কারণ সমস্ত
মানবগোষ্ঠী তার জন্য সংগ্রাম করছে। তাছাড়া সে যে প্রতিমুহূর্তে
মরছে। কত মানুষ মরছে চারিদিকে! তাদের মৃত্যু যে তারও মৃত্যু।
না সময় নেই। প্রেমের শত্রুরা পৃথিবীকে ভোগ করছে, তাদের জয়
করতেই হবে। অন্ধ অপেক্ষা নয়, বাকবহুল তর্কজাল নয়, বড়ী ন স্বপ্ন
নয়। কর্ম চাই। কর্মের পথ চকর, চূর্ণন, ক্ষয়ন। প্রগতি
অবিনশ্বর। পৃথিবীর শেষ আছে, পথও অনন্ত নয়। জয় কর, বিজয়ী হও,
মানুষের জীবন-সমূহে যেই পুরুষদের আনন্দময় জীবনাবসরকে এনে
মিশিয়ে দাও, মানুষ দেবত হোক, জাগো—৬-৬-৬—

অবিনশ্বর পা বাড়ান। ললিতা, আমি যাই। ললিতা, আমি
তোমাকে ভালবাসি। ললিতা, আমি আবার আসব—

অন্ধকার গলি।

মাঝে মাঝে বিবর্ণ বাষ্পের আলোক।

তপনো লোক চলাচল আছে। চায়ের দোকানে গল্পগুজব চলছে।
গলির পদ গলি।

শিশুর কান্না শোনা যায়। ললিতা কি এখন ঘুমিয়েছে?

কলহ।

হাসি।

এখানে ওখানে শব্দেহ। ললিতা কি এখন স্বপ্ন দেখছে?

পচা আবর্জনার গন্ধ। কোন গ্রহর? বেহাগ না সোহিনী?

কে যেন কাশছে।

ছায়াময় বাড়ীগুলো।

বাতাসে যেন কাদের কণ্ঠস্বর। বাতাসে যেন অনেক হারানো কথা। বাতাসে যেন কত ছড়ানো দীর্ঘশ্বাস।

গলির পর গলি।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল অরিন্দম। এ কোন গলিতে এল সে? এ গলিতে এখনো ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। সে চারদিকে তাকাল। কোথায় এল সে?

ঘুড়ুর আর তবলার শব্দ ভেসে এল, ভেসে এল মাতালের হাসি আর নারীকণ্ঠের গানের আওয়াজ। দ্বারপ্রান্তে সজ্জিতা নারীদের চটুল চোপ তার দিকে কটাক্ষ-বর্ষণ করতে লাগল। উগ্র স্তরভিমাখা জামাকাপড় পরিহিত পুরুষেরা চলতে চলতে খেমে গেল, দ্বারপ্রান্ত-বর্তিনীদের সঙ্গে তারা ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগল। ভূপাশের মদ, মাংস এবং পানীদের লোকান থেকে কেতা এবং বিকেতাদের কথাবার্তা ভেসে এল।

অরিন্দম দ্রুতপদে অগ্গ গলিতে ঢুকল। কিছু সে গলিতেও একই ছবি। বড় বড় পা কেলে সে গলিটা অতিক্রম করতে লাগল

সেই সব নারীদের ডাক তার কানে এল, সে শিউরে উঠে।

"এসো না বাবা"—

"ইস, মাধুবাবা!"

"ও বাবা, হোমার পৌ যে এখানে"—

"তিহিতি"—

হঠাৎ অরিন্দম গলির বাকি খমকে দাঁড়াল। সামনের বাড়ীটার

দোরগড়ায়, চার পাঁচটি মেয়ের মধ্যে সে যাকে দেখতে পেল, তার কথা সে একমুহূর্ত আগেও ভাবেনি। তাকে যে সে এখানে দেখতে পারে সে কথা সে স্বপ্নেও চিন্তা করেনি।

থমকে দাঁড়াল অরিন্দম, যেন সে পাথর হয়ে গেল।

“অমিতা দেবী!”

সেই মেয়েটি গম্ভীরমুখে সঙ্গিনীদের কথাবার্তা শুনাছিল, অরিন্দমের কথা শুনে সে বিদ্যাম্পুষ্টের মত চমকে উঠে মুখ ফেরাল। অরিন্দমকে দেখে তার হুঁচোপের তাগায় একটা বিচিত্র দীপ্তি ঝকঝক করতে লাগল। নির্নিমেষনেই সে তাকিয়ে বইল অরিন্দমের দিকে।

“অমিতা দেবী”—

অমিতাই বটে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে তার। খান ধূতির বদলে এখন রঙীন বেশ্মা সাদী, নিবলকারা এখন শালঙ্করা হয়েছে। কিন্তু অলঙ্কারগুলো যে গিণ্টি-করা তা বুঝতে একটুও দেবী হল না।

অরিন্দম এগোল অমিতার দিকে। তার সঙ্গিনীরা সকৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

“মিসে বোথ হয় চেনা লোক”—

“হ্যালো—৫ হোর কে?”

অমিতা অরিন্দমকে এগোতে দেখল তার দিকে, মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে সে বিদ্যাহ্বসে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

“অমিতা দেবী—শুছন”—

অজ্ঞাত মেয়েরা পিনপিল করে হেসে উঠল

অরিন্দম ভেতরে ঢুকল তাদের ঠেলে, মেয়েরা তার অগ্রসরণ করল।

“অমিতা দেবী”—

কিন্তু ভেতরে দরজা-বন্ধ অনেকগুলো কামরা—কোনটাতে ঢুকেছে অমিতা তা অরিন্দম ঠাहर করতে পারল না।

মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ওপা-তলায় সিঁড়ির বাক
একটা হিংস্র-দর্শন গৌফ-ওয়াল পুরুষ এসে অরিন্দমকে দেখতে লাগল।

একটি মেয়ে বলল, “অমিতা গোসা করেছে—আজ ওর আশা ছেড়ে
নাও ভাই”—

“কিন্তু ওর সঙ্গে যে আমার বিশেষ দরকার আছে—ঠেকে একবার
জেকে দিননা আপনারা”—

“হিহিহি”—

“মরেছে”—

“মিসে মজেছে”—

“কেন, আমাদের বুঝি পছন্দ হয়না?”

একটি মেয়ে এসে অরিন্দমের গায়ে হেন্স দিতে দাঁড়াল, বলল, “আজ
আমার এখানেই চলনা— আমার উরুগুলো ভাল—দেখবে?”

অরিন্দম মেয়েটিকে থেলে দিল, “না”—

আর একটি মেয়ে এল কাছে, জুঁহাত দিয়ে সে অরিন্দমকে জড়িয়ে
ধরল, আধো আধো গলায় সংগে বলল, “তাহলে আমার ঘরে চল—
আমার হাত তুটো কি সুন্দর বলত? আর আমার পাঁজিগুলো দেখো—
রসে টস্‌টস্‌ করছে”—

তাকে থেলে দিল অরিন্দম, বলল, “আমি প্রার্থনা করছি—আমাকে
আপনারা প্রলুব্ধ করেন না, শুভ্রন, অমিতা দেবীকে একবার ডেকে দিন
—দোণাই আপনারদের”—

এগিয়ে সে ওপরে উঠতে গেল আর দিক দেই সময়ে সই গৌফ
ওয়াল লোকটা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

“আই—শুনছ?” কর্কশকণ্ঠে লোকটা তাকে বলল, “ভালো
ভালো এখান থেকে বেরোও”—

অরিন্দম মাথা নাড়ল “না, আমি একবার”—

চক্ষের পলকে কোন্‌র থেকে একটা ছোরা টেনে বের করল লোকটা,

বাকরকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, “আর একটা ও ট্যাফো করবি তো শালা
তোকে লাশ বানিয়ে ফেলব—বাঃ—ভাগ্—”

অরিন্দমকে একটা ধাক্কা দিল লোকটা।

“একে আসতে দাও”—

ওপরের সিঁড়ির মুখে অমিতাকে দেখা গেল।

“ছেড়ে দেব ?” লোকটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

“হ্যাঁ”—

“বা ও মশাই—বাঃ”—

অরিন্দম মুড় হেসে ওপরে উঠে গেল, দাঁড়াল গিয়ে অমিতার সামনে।

অমিতার বুক দ্রুত গোঁমানা করছে, হৃচোথ জলছে তার। কিন্তু
কেন ? উত্তেজনা ? রাগ ?

“ভেতরে আসুন”—

দরজার পরদাটা তুলে দরজা অমিতা—অরিন্দম ভেতরে ঢুকল।
দরজাটা ভেঁজিয়ে দিয়ে অমিতা মেঝেতে একটা আসন পেতে দিল,
অরিন্দম বসল।

ওপরের চাপরিকে তাকাল অরিন্দম। ছোট্ট একখানা পরিষ্কার ঘর।
এককোণে শয্যা বিছানো রয়েছে, দেয়ালের গায়ে বিলাসিনী নারীমূর্তি।
কিন্তু এই কি চেয়েছিল অমিতা ! এই নোংরা পাড়ায় এমনি একটা
ছোট ঘরই কি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল ?

“কি চান আপনি ?”

অরিন্দমের চমক ভাঙল, দেখল যে অমিতার চোখের কোণে
কাঠিন্যের বক্সিস রেখা।

“আপনি এখানে কেন অমিতা দেবী ?”

“আপনাকে তার কৈকিয়ৎ নিতে হবে নাকি ?”

“না—নিছক কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করছি। বাড়ীর সবাই আপনার
ওখা চিহ্নিত—তাঁই”—

“তাই?” অমিতার কণ্ঠে বেন প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ খেলে গেল, “বটে! তাহলে বলেই ফেলি”—

“কি?”—

“সস্ত্রিতি ব্যবসা করছি—ঐ বিছানা দেখছেন—ওখানেই আমার ব্যবসা”—

অরিন্দমের শরীর কেঁপে উঠল, একটা রক্তের উচ্ছ্বাস ঘনাল মুখের ওপর। সে প্রশ্ন করল, “আপনি না একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন?”

অমিতা অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে হাসল, “ঘর বাঁধা!—না, একজনের সঙ্গে ঘর ভেঙেছিলাম আমি”—

“তাহলে ঘর করলেন কেন—আপনি তো তাকে ভালবাসতেন?”

অমিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, “ভালবাসা! কে বলেছে?”

“ভালবাসতেন না?”

“না। আর এও জানতাম যে সেও আমাকে ভালবাসে না”—

“তবে?”

“অমি, জানতাম সে কি চায়—আর সে যা চায় আমিও তাই চেয়েছিলাম বলেই একদিন ভেসে পড়লাম”—

“তারপর?”

“তারপর আবার কি? রক্তমাংসের উন্মত্ততা একদিন শেষ হয়ে গেল, এখানে এসে বাসা পাঁচলাম”—

“এই জীবন ভাল লাগে আপনার?”

“বাড়ীতে বসে থাকার জীবনও কি ভালো লাগে? তার চেয়ে এ ঢের ভাল—আর যাই হোক, আপনাদের স্বর্গপুর সমাজের নাগালের বাইরে আমি। তাছাড়া আত্মকালকার দুর্দিনে বাড়ীর বোঝা হতে থাকে কি ভালো?”

“কিন্তু এই কি চেয়েছিলেন আপনি?”

অমিতা অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে চোট কামড়ান,
তক্তকণ্ঠে বলল, “চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়?”

“যার।”

“না।”

“কি চেয়েছিলেন আপনি?”

অমিতা জলে উঠল হঠাৎ, “আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো? কিসের
জোরে আপনি আমাকে এত ভেয়া করছেন?”

“চলে যাই তবে”—অরিন্দম উঠে দাঁড়াল।

“দাঁড়ান”—

অরিন্দম দাঁড়াল।

অমিতা কাছে এল, তক্ত হেনে ললাটের ওপর খেঁচে চুল সরিয়ে
বলল, “কি আর চাইব? বা সাধারণ চায়—তাই চেয়েছিলাম। স্বামী,
সংসার, শান্তি, ভালবাসা। দিয়ে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী হারালাম—
চাওয়ার পালা ফুরিয়ে গেল। তবু চাওয়া কি থামে? কিন্তু যে সমাজে
নারী ভোগ-সম্পত্তি—যে সমাজে নারী মানুষ না, শুধু একটি ভোগ্যবস্তু—
সেখানে আমার তো আর দাবী নেই। তাই জলতে লাগলাম, মরিয়া
হয়ে উঠলাম”—অমিতা ধামল, স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল অরিন্দমের দিকে,
প্রশ্ন করল, “আরো শুনবেন?”

“বলুন।”

“এমন সময়ে এলেন আপনি—মনের মানুষের দক্ষান পেলাম—দেহ
আর মন লাউ লাউ করে জলে উঠল”—

অরিন্দম মুগ্ধ নত করল। বুকের ভেতরে যেন একটা অবাঞ্ছিত বস্তু
হচ্ছে তার। কেন? কি হল তার?

“মাথা নীচু করছেন! আমার নির্লজ্জতার লজ্জা হচ্ছে বুঝি?”—

“বলে যান”—

“বলবই তো। কি এলছিল—হ্যাঁ—জলে উঠলাম। কাকালের

মত নানাভাবে আপনার কাছে তুলে ধরলাম নিজেকে। আমি জানতাম যে ললিতাকে ভালবাসেন আপনি, ললিতা আমার বোন, তাকে আমি ভালবাসি, তবু পারলাম না, তবু আপনাকে আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু আপনি দুর্বল নন, আপনার প্রেমকে তাই বিপথগামী করা গেল না। তখন? কি করব আমি? একই ঘরে থাকব, আপনাদের ভালবাসা দেখব আর জলব—তা কি হয়? তাছাড়া দেহ যে পুড়ে ছাই হয়ে থাকিল তাই পালাল্যাম, একটা কুকুরকে নিয়ে উধাও হলাম।”

অমিতা খামল, হাসতে শুরু করল। অস্বাভাবিক, প্রাণহীন সে হাসি।

“শুনলেন তো—এবার যান—দয়া করে সারে পড়ুন”—

অরিন্দম অমিতার দিকে তাকাল। সে শীর্ণ হয়েছে, চোখে মুখে তার চিন্তা আর ক্লেশের ছাপ। বুকের ভেতরটা দুঃ দুঃ কাঁপছে। অমিতা যেন প্রতীক। সমাজব্যবস্থার বিষময় পরিণতি। জীবন যেখানে সহজ পথ পায় না, সেখানে সে আঁকাবাঁকা অঙ্ককার পথেই যাত্রা করে। কিন্তু কার দোষ? আমার, তোমার, সবার দোষ। আর কি কাপাল অমিতা! ভালবাসা চায় সে। সে তার অধিকারকে আদায় করতে চায়। অরিন্দম কি করতে পারে? সে ললিতাকে ভালবাসে। সে আজীবন ললিতার। তার প্রতি রোমকূপে লালিতার ছায়া। তবু এই নিপাসার্ত আহ্বার জন্ত সে কি করবে? হঠাৎ মনের ভেতরে যেন বিপ্লব ঘটে গেল।

“অমিতা”—

“যান এবার”—

“শোন অমিতা”—

“আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন! না, আপনি বেয়োন”—

অরিন্দম এগোল, অমিতার কাছে গিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “না, আমি যাব না অমিতা।”

“কিস্ত কেন ? কেন ?”

“তোমার দুঃখের জন্য আমি দায়ী—”

“কি করে ?”

“আমি না এলে তো তুমি গৃহত্যাগ করতে না ?”

“কে জানে হয়ত তবু করতাম ।”

“অমিতা—তুমি ফিরে চল ।”

“আমি নির্লজ্জ—কিস্ত এতটা নই যে বাড়ী ফিরে যাব ।”

“তুমি নিজেকে ধঃস করতে পারো না ।”

“কিস্ত বাঁচবার আর পথ নেই আমার ।”

অরিন্দমের গলা কেঁপে উঠল, উত্তেজিতভাবে সে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলল, “আছে, পথ আছে—”

অমিতা তাকাল, “কি পথ ?”

“আমি ।”

অমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল, তার দুটো ঠোঁট খরখর করে নড়ে উঠল, সে উচ্চারণ করল, “তুমি !”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, ঘরের কোণে দেই শয্যার উপরে বসে বলল, “হ্যাঁ। এই শয্যার ইতিহাস আজ শোন হোক ।”

অমিতার হৃৎ স্রোতে বিশ্বাস, তার অধরদেশ কম্পিত, তার চেতনা মুগ্ধাৱত ।

“তুমি !” সে আবার উচ্চারণ করল ।

“হ্যাঁ, আমি । আমার জন্যই তোমার এই পরিণতি । কিস্ত তা হতে পারে না, তোমার অন্তরের ঈশ্বরকে আমি এই গলির অন্ধকারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিতে পারিনা । অমিতা, আমি তোমার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলাম—তোমার জয় হয়েছে, তুমি নিজেকে সার্থক করো—”

অমিতা মুহূর্তে বলল, “আর ললিতা ?”

বুঝটা যেন ভেঙ্গে যেতে চাইল। যেন সে অসংখ্য মৃত্যুর মাঝে ভলিয়ে যাচ্ছে।

তবু অরিন্দম সোজা হয়ে রইল, তবু সে বলল, “ললিতা? হ্যাঁ, ললিতাকে আমি ভালবাসি—সে আমার অর্ধেক জীবন। কিন্তু তাতে কি? তোমাকেও ভালবাসব আমি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার মন্থকে তুমি প্রকাশ করো।”

অমিতার চোখ বুজে এল, সে বিড়বিড় করে বলল, “তুমি—তুমি আমাকে ভালবাসবে?”

“বাসব বৈকি। এত দুঃখ পেয়েছ তুমি—তোমাকে ভাল না বাসা সে এখন পাপ।”

অরিন্দমের পায়ের কাছে অমিতা বসে পড়ল, অশ্রুটকণ্ঠে বলল, “তুমি আমাকে এই পথবুণ্ড থেকে তুলে নিলে!”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “লিলাহ—তুমি পথভিঁনী বলেই তোমাকে তুলে নিলাল—”

দু’হাতে অরিন্দমের পা জড়িয়ে ধরে তার ওপর মাথাটা রাখল অমিতা।

অরিন্দম বিচলিত হয়ে পড়ল, ডাকল, “অমিতা,—”

“আমাকে ডেকোনা—এতবড় দৌভাগ্য তো আমার জীবনে আর আসেনি—তার স্বাদ পেতে দাও—”

ঘরের ভিতর নিঃশব্দতা নেমে এল। কিন্তু বাইরে থেকে ভেদে এল তবলা আর ঘুড়ুর শব্দ। কেউ নাচেছে। না, সেই স্বরকেশীর নৃত্য নয়, কোন এক জ্ঞানহীনীর এলোমেলো নৃত্য পরজপ। ভেদে এল হানি, জড়িতকণ্ঠের গানের শব্দ আর অগ্নীর রসিকতার টুকরো।

অমিতা মুখ তুলল। তাকে যেন আর চেনাই যায় না। অস্থূল প্রশান্তি তার মুখে, আশ্চর্য এক জ্যোতি তার চেখে।

সে মুহূর্তে প্রশ্ন করল, “বাবা কেমন আছেন? মা? দাদা?”

“বাবা ভালো নন, তোমার মা দাদা একরকম আছেন—দিনকাল ভেঁ
ভাল নয়—”

“কি হয়েছে বাবার? এ্যা?”

“মাথার গোলমাল হয়েছে—”

অমিতার চোখে জল দেখা দিল, ক্রমে তা উপচে গাল বেয়ে নীচে
নামল।

“কানছ!”

“কিছুই তো করতে পারিনি তাদের জন্ত—কানতেও পারব না?”

অরিন্দম চূপ করে রইল। কি বলবে সে?

“আর ললিতা কেমন আছে?”

“ভালোই।”

“ললিতাকে ভালবেসে কিছ—বড় লক্ষী মেয়ে আমার বোনটি—”

অরিন্দম একটু হানবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

অমিতা অরিন্দমের মুখের নিকে তাকিয়ে রইল। একদৃষ্টে। কি বেন

ভাবছে সে।

বাইরে থেকে সমানে ভেসে আসতে সেই ঘুড়ুর শব্দ।

“কিছু থাকে তুমি?”

অরিন্দম হাসল, “এত রাতে! না। এখন বড় ঘুম পাচ্ছে।”

“ঘুমোও তাহলে”—

“হ্যা, ঘুমোব। কিন্তু কাল সকালে আমার সঙ্গে তোমাকে বাড়ী
কিরে যেতে হবে অমিতা।”

বিচিত্র হেসে অমিতা মাথা নাড়ল, পরে বলল, “তুমি ঘুমোও”—

অরিন্দম বিছানায় শুয়ে পড়ল, প্রশ্ন করল, “তুমি?”

“ঘুমোব—পরে।”

অরিন্দম চোপ বুজল। তাহলে? একটা দিন পেছিয়ে গেল সে!
আবার নতুন করে কাল বেয়োতে হবে! তা হোক। এও তার কর্তব্য,

সমাজ আর রাষ্ট্র তো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়। আঃ, কী আশ্চর্য
অহুভূতি। অমিতা বদলেছে, তার পুনর্জন্ম হয়েছে। আর ললিতা
এখন কি করছে! ললিতা, তুমি নির্ভয়ে থাকো, আমি তোমার।
ললিতা, আমায় ক্ষমা করো, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি।
আঃ—যুমের নদী কি গভীর—গভীর—গভীর—

অরিন্দম ঘুমিয়ে পড়ল।

অমিতা তখনো একইভাবে বসে রইলো। তার দৃষ্টি অরিন্দমের
দিকে। দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে অদৃশ্য একটা হাসি
দেখা দিল। কেন তা সে-ই জানে। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার
হৃচোখ ছাপিয়ে আবার অশ্রুর ধারা নামল। মুক্তোর মত অশ্রু।
বাড়ী ফিরে যাবে অমিতা? কিন্তু বাড়ী ফিরে গেলেই কি তার
বিয়োগান্ত জীবনের পরিবর্তন হবে?

শেষরাতে অরিন্দমের ঘুম ভাঙতেই সে উঠে বসল। এদিক
ওদিক তাকিয়ে দেখল যে ঘরে অমিতা নেই। কোথায় গেল
সে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। না, অমিতার কোন সাদা পাওরা
যাচ্ছে না।

“অমিতা—”

কোন জবাব দিল না কেউ।

বারান্দায় বেরোল অরিন্দম।

“অমিতা”—

কোন সাদাশব্দ পাওয়া গেল না।

তবু ডাকতে লাগল অরিন্দম। অন্তিম ঘরের মেয়েরা ভেগে-

উঠল, গঙ্গা গঙ্গা করতে করতে তারা বাইরে এল। এল সেই গৌরীকান্ধালা
লোকটা।

সবাই মাথা নাড়ল। না, তারা কেউ অমিতাকে দেখেনি।

তাহলে? কোথায় গেল অমিতা?

অমিতা আবার হারিয়ে গেল।

কিন্তু কেন? কেন? অরিন্দম বারংবার প্রশ্ন করল নিজেকে।
হঠাৎ বেন বুঝতে পারল সে। অমিতা বুদ্ধিমতী, তাই সে আবার
চলে গেছে। বালির বাধ কি টেকে? বাড়ী ফিরে গেলেই কি
অমিতার ব্যর্থতা সার্থকতায় পরিণত হত? বে সমাজে নারী ভোগের
বস্তু সে সমাজে অমিতার ঘটনা কি আত্মই শেষ হবে? তাছাড়া
কি করে অমিতা ফিরে যাবে? ললিতাকে ঈর্ষা করে সে, কিন্তু
তার ভালবাসা তো মিথ্যে নয়। আজ তার আত্মা জাগ্রত হয়েছে
তাই সে আজ অরিন্দমকে পেয়েও ত্যাগ করে গেল। কিন্তু কোথায়
গেল সে? কোথায়?

কেউ বলতে পারল না। কেউ বলতে পারল না যে রাতের
অন্ধকারে অমিতার পথ গিয়ে গৌরী নদীর শীতল শস্যায় শেষ হয়েছে।

সারাদিন ঘুরে বেড়াল অরিন্দম। এবার? কি ভাবে সে
দেবদত্তের পরামর্শকে রূপ দেবে? অমিতা হারিয়ে গেল। যাক।
ললিতাকে ফেলে এসেছে সে, অমিতা তার কাছে তুচ্ছ। গ্রহরী,
অগ্রসর হও, তোমার পথ সামনে।

সন্ধ্যার পর সে উঁচুপাড়ার একটা হোটেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ভেতরের স্ববেশ ও ধনী নরনারীদেহ লক্ষ্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক একটা যুবতীকে নিয়ে নিকটবর্তী মাঠের দিকে বেড়াতে চলল। অরিন্দম তাদের অনুসরণ করল।

মাঠের একটা নির্জন অংশে গিয়ে একটা কাঠামানে বসল সেই ভদ্রলোক ও যুবতী। অরিন্দম দূরে বসল। ভদ্রলোকটিকে ধনী মনে হচ্ছে।

কি করবে সে? কাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর? খুন করবে?

খুন! অরিন্দমের স্বপ্নে যেমে উঠল। একজন মাতুষ আর একজন মাতুষকে হত্যা করবে! বাঘের মত, শাপদের মত! আত্মাকে বিসর্জন দেবে? তাহলে কিসের জোরে সংগ্রাম করবে সে?

খুন!

না। না। অরিন্দম উঠল, কিরে গেল।

আলোকিত রাস্তাপথ দিয়ে সে হেঁটে চলল। তার চারদিকে আলোক সমারোহে, স্ববেশ নরনারীর জনতা, বাকবাকে গাড়ী আর উদ্দাম জীবন শ্রোত! উঁচুপাড়ার মাতুষদের জীবন যেন একটা উৎসব।

হাসি।

গান।

চটুল চোখের চাহনি।

রঙীন ঠোঁট, কাজল-আঁকা চোখ, উন্নত শ্বশুরের শাহসান আর অনাবৃত বাহুর লালত। শিকার অনুসরণকারী শাপ। চোখের মত পুরুষের চকল চাহনি।

কিছু একটা কিছু করতেই হবে।

কোলাহল। তার চারদিকে বিলাসী নরনারীর মিছিল। অরণ্যের শাপদের মত তারাও নিশাচর।

না, এই ভীড়ে নয়। এখানে সম্ভব নয়।

নির্জন পাড়ার খোঁজে এগোল অরিন্দম। শেষে খুঁজতে খুঁজতে তার একটা পাড়া পছন্দ হল। চওড়া মাঠের পাশে দশ বারোটি মত্ত বড় বড় বাড়ী। তার মধ্যে একটা বাড়ীকে সে তার লক্ষ্যস্থল করল। বাড়ীটার চারদিকে বড় বড় নারকেল আর আমগাছ। মত্ত বড় বাড়ী সে তুলনায় লোকজনদের সংখ্যা কম বলে মনে হল। নীচের তলা অন্ধকার, শুধু ওপরের দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। কোন শব্দ নেই। বেশী লোকজন থাকলে বাড়ীটা নিশ্চয়ই এতটা নিঃশব্দ হত না। আর থাকলেও তারা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। এই বাড়ীই ভালো, তার পেছনকার লৌহনল বেয়ে সে ওপরে উঠবে।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সে, বাড়ীটার চারদিক লক্ষ্য করল। কোন দিক দিয়ে পালাবে তাও সে মনে মনে স্থির করে রাখল। সব ঠিক, রাত আরো গভীর হোক, ওপরের ঘরের আলো দুটো একবার নিভুক।

কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে থাকে। বুকের ভেতরে কে যেন করাঘাত করছে। কে? যেই হও, বিশ্বাস করো আমাকে। আমি মানুষের মঙ্গলের জন্ত সব কিছুই করতে পারি। সব কিছু—এমনকি পাপও। পাপের জন্ত শাস্তি পেতে হবে। আমি রাজী আছি। মানুষের জন্ত আমি নরকগামী হতেও দ্বিধাবোধ করব না। রাতের কোন প্রহর?

আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্রপুঞ্জ কি তাকেই লক্ষ্য করছে? করুক। সে জয়ী হবে।

মাঠের ওপারে অন্ধকার। অনেক দূর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে গিয়ে সেই ডাক মহাশূন্যতায় মিশিয়ে গেল। সব কিছুই শূন্যতায় বিলীন হই। তবু এই অতিশয় মিথ্যা নয় আর মিথ্যা নয় বলেই তার জন্ত সংগ্রাম করতে হবে। অগ্রসর হও। বিশ্বাসই বড় কথা, নিষ্ঠাই বড় কথা।

অরিন্দম লৌহনল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে।

আরো সময় কাটে।

হঠাৎ ক্ষতবেগে নল বেয়ে নামতে থাকে অরিন্দম।

ওপরের ঘর থেকে চীংকার ওঠে, “চোর-চোর-চোর”—

বাড়ীর ভেতর সাড়া জাগে, আলো জলে, কোলাহল ওঠে।

চীংকার চলতে থাকে, “চোর-চোর-চোর”—

এবাড়ীর চীংকারে পাশের বাড়ী জাগে, তারপর অন্তগুলো।

এদিক এদিক উত্তেজিতভাবে দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে বাড়ীর মালিকেরা, তাদের ভৃত্যরা। তারপর একসময়ে নগর-রক্ষীরা এসে জেরা শুরু করে।

অরিন্দম তখন নীচুপাড়ার নিকটবর্তী নির্জন একটা গলিতে। বাম্পীয় আলোকের সামনে দাঁড়িয়ে সে পকেট থেকে সব কিছু বের করল। প্রায় দু'হাজার টাকা নগদ আর দু'তিন হাজার টাকার অলঙ্কার। খুব বেগ পেতে হয়নি তাকে। একটা ঘরে ঢুকে একটি প্রোড দম্পতিকে দুমস্ত দেখতে পায় সে। কাপড় দিয়ে দুজনকেই জাগ্রত হবার আগে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল সে, তারপর ভয় দেখাতেই গ্যাবি পেয়েছিল।

মনে হয়নি। এই তো সুবে শুরু। আরো চুরী করবে সে। তারপর সে দেবদত্তের কাছে যাবে। দেবদত্ত না চিনলেও ক্ষতি হবে না তার। সে এখন বুঝতে পেরেছে তাকে কি করতে হবে। উচুপাড়ায় ভালো ঘর নিয়ে থাকতে আরম্ভ করবে সে, প্রতারণা করবে, দল তৈরী করে ভাণ্ডাতি করবে। তারপর সে যখন বুঝবে যে তার যথেষ্ট টাকা হয়েছে

তখন সে সংবাদপত্রের দপ্তরখানায় গিয়ে হাজার হাজার টাকা বিছিয়ে দেবে। তারপর থেকে প্রতিদিন কাগজে তার ছবি বেরোবে, প্রতিদিন তার প্রশংসা বেরোবে। টাকার জোরে সে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদবে। টাকার জোরে সে শাসন-পরিষদের সদস্য হবে, মন্ত্রী হবে এবং অবশেষে আজবনগরের শাসনকর্তা হবে। তখন? তাঁর ইচ্ছাই সত্য হবে। এক একটা আঘাতে সে অজ্ঞান, পাপ, বৈষম্য, দারিদ্র আর হিংসা নোভকে নিশ্চিহ্ন করবে, মানুষের জীবনে পুতুলের আনন্দময় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হ্যাঁ, ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। কে? কে বলেছিল সে কথা?

দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। কিসের? অরিন্দম তাকাল। আরো কয়েকহাত দূরে একটি নারীর মৃতদেহ। নগ্ন, গলিত। কুকুরেরা তার অঙ্গদেশ টেনে বের করে ফেলেছে।

না, ভয় নেই। গলিত শবের দুর্গন্ধের সঙ্গে বাতাসে নবজাতকের চীৎকারও ভাসছে। জীবনই বড় সত্য।

নিঃশব্দতা।

সমাধিক্ষেত্রের মত নিঃশব্দ নীচুপাড়া।

হঠাৎ পদশব্দ শোনা গেল। অরিন্দম চমকে তাকাল। ছ'জন লোক! তাদের ক্লান্ত দেহ, ঘুম-জড়ানো চোখ। তাদের কাঁধে শবের বোকা।

ক্লান্ত পদক্ষেপে শববাহীরা অন্ধকারে অদৃশ্য হল। ধীরে ধীরে তাদের পায়ে শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার নিঃশব্দতা।

মৃত্যু। পদে পদে মৃত্যু বাধা দিচ্ছে। তবু জীবন অপরাধের অস্বপ্নরস্ত। অরিন্দম, স্থির হও। তোমার কয়েকদিনের জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটল?

রাত কত? কোন প্রহর? কুহকিনী রাতের গান শুনে কি রূপসী নদী এখন আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে? শালবনের অন্ধকারে যুগযুগের

এখন কোন স্বপ্নে বিভোর ? সেই স্বর্ণকেশী নর্তকীর নৃত্যের তালেই বুঝি নক্ষত্রেরা কাঁপছে ? কে ডাকে ? জাগো-ও ও-ও, বিস্মৃতি ও বিস্মৃতি ঠেলে উঠে পাড়াও-ও-ও-। কে ? অসিধারী প্রহরী ! আহি—আমি জেগে আছি-ই-ই-ই—

কিন্তু তবু কি যেন হল। বুকের ভেতর কে যেন করাঘাত করে কেঁদে উঠল। নীচুপাড়ার দিক থেকে একটা কুকুরের কান্না ভেসে এল। রাতের নিঃশব্দতাকে চিরে চিরে যেন নীচুপাড়ার আর্তনাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে চাইল। অরিন্দম যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল। শক্তিমান হওয়ার পথ সহজ নয়। সেই পথে ভিলে ভিলে আত্মাকেও বিনর্জন দিতে হয়। কিন্তু অরিন্দমও কি তাই করবে ? না, না। হে আকাশ, হে, পৃথিবী, হে নক্ষত্রপুঞ্জ, শোন—আমি ব্রতচ্যুত হব না।

কিন্তু তবু থামল না সেই যন্ত্রণানাদক অহুভূতি। তবু থামল না সেই বুকের ভেতরকার করাঘাত। একটা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে অরিন্দম বসে পড়ল, দু'চোখ বুজল। সে সম্পূর্ণ একা।

অন্ধকারে নিমজ্জিত নীচুপাড়ার দিকে তাকিয়ে, সে বিড়বিড় করে বলল, “কবে ? আবার কবে তোমাকে পাব ললিতা ?”

পাঁচ

অবিস্ময় ভাবছিল।

প্রথম চুরির পর কতদিন কাটল? মনে মনে হিসেব করল সে।
আট মাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের ধরতপ্ত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে।
তার সঙ্গে উড়ে গেছে পশ্চিমের ধূলে-ওড়ানো কড়ো বাতাস। তারপর
এসেছে বর্ষা। নিবিড় কৃষ্ণ মেঘের গুরু গুরু ডাক, বিহাতের শিহরিত
দীপ্তি আর আকাশ ভাঙ্গা বর্ষণের শেষে এসেছে সোনালী রৌদ্রালোকে
উজ্জল শরতের নির্মেষ দিন। এসেছে হেমন্ত। বাতাসে আসন্ন শীতের
ঘোষণার সাথে রাতের আকাশ থেকে রাশি রাশি গলিত মুক্তা পড়েছে
পৃথিবীর ওপর। তাও বিগত হয়ে শীত এসেছে, কুয়াশা আর উত্তরের
হিমশীতকে বহন করে। সেই শীতও শেষ হতে চলেছে এখন। আট
মাস কেটে গেছে। কত দিন আর কত রাত্রিভরা আটটি মাস!

এই আট মাসের ইতিহাস? অতি ঘৃণা, অতি কদর্যা, অতি ভয়ঙ্কর
তা। মানুষের মনো শাস্তি এবং প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে যে
সব নীতিবাক্য পালন করতে হয় তাই সে প্রতিপদে অমান্ত করেছে।
চুরি, প্রতারণা, ভোজুরি, জালিয়াতি, ডাকাতি, আরো কত কী!
দেবদত্তকে খুঁজে বের করেছিল সে। দেবদত্ত তাকে কয়েকটা ব্যবসায়
নামিয়েছিল। এক টাকার জিনিষ দশ টাকার বিক্রী করে সে মোটা
মুনাফা করেছে। সবই অসৎ উপায়। কিন্তু... আশ্চর্য! দেবদত্তের
কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। আজ তার হাতে নগদ পাঁচ লক্ষ
টাকা। টাকার জোরে সংবাদপত্রগুলো তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।
প্রতিদিন তার বিষয়ে কিছু না কিছু স্ততিবাদ কাগজে থাকে, প্রতিদিন
কোন না কোন কাগজে তার ছবি বেরোয়। উঁচুপাড়ার রাস্তায়
বেরোলে সবাই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখায় তাকে, কানাকানি করে বলে,

‘কে এই লোকটা? কোথেকে এল? রাতারাতি এত বড় হল কী করে? লোকটার শক্তি আছে।’ শক্তি মানে টাকা। পৃথিবীময় যে শক্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা উচুপাড়ার লোকদের কাছে টাকার আকার ধারণ করে সাকার হয়েছে। টাকা হওয়াতেই তার শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মেছে এ পাড়ার লোকদের। তার সেই শক্তির কথা লোক মারফৎ, সংবাদপত্র মারফৎ গিয়ে পৌঁছেল আজবনগরের শাসনকর্তা আর মন্ত্রীদের কানে। তারা তার ওপর নজর রাখলেন। টাকার জোরে সংবাদপত্রগুলো তার শাসনপরিষদের সদস্য হওয়ার মত যোগাতার কথা ফলাও করে ঘোষণা করল। অবশেষে একটি কেন্দ্র থেকে সে বিনাবাধায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে শাসনপরিষদে গেল। সেখানে গিয়েও সে প্রাধান্য লাভ করল তার ব্যক্তিত্বের জোরে। আর উঁচুপাড়ার ব্যক্তিত্ব মানে আকৃতি, বেশভূষা ও বাকচাতুর্য। সংবাদপত্রগুলোকে আর এক দফা ঘুষ দিতে হল। তারা তাকে মন্ত্রী করার জন্ত সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাতে লাগল। আজবনগরের কর্তাদের চিত্ত চঞ্চল হল তারা অভিভূত হল তার শক্তি দেখে, তারা তাকে একটি মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করল। আজই তার যোগ দেওয়ার দিন। তাই একটু বাদেই দেবদত্ত এসে তাকে শাসনকর্তার প্রাসাদে নিয়ে যাবে। দেবদত্ত আজকাল তাকে বন্ধু বলে মনে করে, টাকার জোরে সে স্বেচ্ছা তার কিছুদিন আগেই মন্ত্রী হয়েছে। তার আগমন-প্রত্যাশাতেই অরিন্দম এখন সাজগোজ করে বসে আছে।

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। মস্ত বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছে সে। মার্বেল পাথরে মোড়া মেঝে, কারুকার্য করা দেয়াল আর দামী দামী আসবাবপত্র সাজানো প্রাতিটি কক্ষ। গোটা ছয়েক দাস-দাসী সর্বদাই তার আদেশ পালনের জন্ত স্রবোধে দণ্ডায়মান। তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নীচুপাড়ার গরিব সেই ভাঙ্গাচোরা পুরোন ঘরের জীবন এসে এই আলোকিত হমেই খেমচেছে।

শক্তি অর্জন করেছে সে। এতদিনে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এইবার সে তার শক্তিকে প্রয়োগ করবে। কিন্তু হঠাৎ অতঃকালে কি গভীর ক্ষতই না সৃষ্ট হয়েছে! আট মাসের ইতিহাস। কত সোনালী দিন আর রূপালী রাতে-ভরা আটটি মাস! হঠাৎ অতঃকালে কে যেন আহতকণ্ঠে আতর্নাদ করেছে, তিল তিল করে যেন তার রক্ত মাংস ফুরিয়েছে, থিক্কারে ও ঘুংগার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে, তবু সে সহ্য করেছে। এই পথ বড় নয়, পথের শেষে পৌঁছে সে পথকে ধ্বংস করবে। কোটি কোটি মানুষের জীবনকে পদ্যের মত সুন্দর ও পবিত্র করার স্তম্ভ সে এই দুঃখবরণ করাত পশ্চাৎপদ নয়।

আট মাস কেটে গেছে। কিন্তু অবস্থার কোনই উন্নতি হয়নি। নীচুপাড়ার অলিতে গলিতে মানুষ মরছে। অনাহারে, ব্যাধিতে, তৃষ্ণে। অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু অল্প উৎপাদন করায় বাস্তব মালিকদের বেশী লোকের দরকার নেই, তাছাড়া শ্রমিকদের শান্তি দেবার স্তম্ভও তাদের বরখাস্ত করা হচ্ছে। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এখনো পর্যন্ত নীচুপাড়ার লোকেরা সংখ্যবদ্ধ হতে পারেনি, পথ সম্বন্ধে মতিস্থির করতে পারেনি। নাথো মাঝে মনিশঙ্করের দল মিছিল করে বেড়ায়। উঁচু পাড়া থেকে রক্ষীয়া গিয়ে অগ্নিগোলক বর্ষণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সন্দেহজনক লোকদের ধরে এনে কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। আত্মমহুয়ায় মুক্তির পথ পাচ্ছে না।

আটটি মাস কেটে গেছে। অরগ্রস্তের মত, ভূতগ্রস্তের মত। এই আটটি মাস ধরে সে ললিতাকে দেখেনি। মুকুন্দেরও কোন সংবাদ জানে না সে। দেখা করারও উপায় ছিল না। ললিতা বলেছিল সে দূরে সরে যাবে, মুকুন্দ বলেছিল সে তাকে ক্ষমা করবে না। তাছাড়া দেখা করলে হয়ত সে তাদের প্রভাব এড়াতে পারত না। অথচ কিই বা করতে পারল তারা? নীচু পাড়ার ইতিহাস একটুও বদলায়নি,

এবং তা ক্রমশই ঘোরতর অবনতির দিকে এগিয়ে গেছে। আট মাস ধরে সে নিজেকে লৌহ-কঠিন শাসনে শাসিত করেছে, নিজের আত্মার আত্মাকে দর্শন করেনি। আট মাস ধরে প্রতিদিন ললিতার কথা স্মরণ করেছে আর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কারণ শক্তিমানদের মধ্যে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত সে কি করে ললিতাকে বোঝাবে তার কথার সত্যতা? আজ—আজ সে দেখা করবে ললিতার সঙ্গে—আজ সে আবার নতুন করে বাঁচবে। শক্তিমানদের অন্ততম হয়ে আজ বনগরের মাছুষদের মাছুষ হবার ব্যবস্থা করার আগে তার নতুন ববে শক্তির দরকার। সেই শক্তি টাকা নয়, প্রেম। আর ললিতার মতোই গচ্ছিত আছে সেই শক্তি।

“হুজুর”—

একটি চাকর এসে ঢুকল ঘরে। তার হাতে একগাদা সংবাদপত্র।

“আজকের ডাক, হুজুর।”

“রেখে ষাও”—গম্ভীর ভাবে বলল অরিন্দম।

বড় লোকের মত মেজাজী অরিন্দমের কণ্ঠস্বর। নিজের মনে বিবর্ণ হাসি হাসল সে। উপার নেই। সংগ্রাম চলছে, কিন্তু আঘাত সে এখনো করেনি। ‘সেই মুহূর্ত’ না আসা পর্যন্ত তাকে এমনি মুখোশ পরেই থাকতে হবে, এইদব আচরণ টেনে নিজেকে গোপন করতে হবে।

কাগজগুলো খুলল অরিন্দম। প্রতিটি কাগজেই তার ছবি বেরিয়েছে। সে আজ মস্তোত্থপদে অভিযুক্ত হচ্ছে তারই সংবাদ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে আজ। অরিন্দম ভূমি কি খুসী! বিষমভাবে সে হাসল। নিজের ছবি দেখে মাছুষ খুশী হয় বটে কিন্তু সে খুশী হতে পারছে না। শক্তি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

“অরিন্দম”—

দেবদত্তের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পরমুহূর্তেই সে ভেতরে ঢুকল।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, সহাস্তে বলল, “এসো মস্তোবর”—

দেবদত্ত রেশমী রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হাসল, বলল, “মন্ত্রী তো তুমিও আজ থেকে।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “সত্যি। ভারী আশ্চর্য মনে হয় কিন্তু—

দেবদত্ত বাধা দিল, “আশ্চর্যের কি আছে এতে?”

“তা নয়ত কি? এত অল্পদিনেই কেউ মন্ত্রী হয়?”

“দিনটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে শক্তি। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি শক্তিমান হবে তা আমিও আশা করিনি। অথচ সেটা কি করে সম্ভব হল জানো?”

“কি করে?”

“তোমার বুদ্ধি আছে বলে।”

“হবে।”

“এবং সেই বুদ্ধি একটা সাংঘাতিক অস্ত্র। তাই দিয়ে আজবনগরের শাসনকর্তা, প্রধান মন্ত্রী এবং আমরা দেশ শাসন করি। তোমার বুদ্ধি আছে, অল্প দিনেই তুমি এত বড় লোক হয়েছ—এতে কতরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।”

অরিন্দম অধাক হল, “চিন্তিত হয়েছিলেন! সে কি!”

“হবেন না?” দেবদত্ত হাসল, “বল কি বন্ধু? অথাত, অজ্ঞাত, সাধারণ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ হয়েও তুমি রাতারাতি বড় হলে যে আমাদের বিপদ হে। শক্তিমানদের চক্রের বাইরে থেকেও কেউ শক্তিমান হবে একথা যে অসম্ভব—তাইতো তোমাকে তাড়াতাড়ি মন্ত্রী করে নেওয়া হল।”

“বটে!”

“হ্যাঁ, আমাদের তাই নিয়ম। যে বুদ্ধিমান, যে শক্তিমান, তাকেই আমরা ভালো চাকরী দিয়ে জয় করে নিই, চক্রের মধ্যে এনে ফেলি, তাকে অধঃপতিত করি।”

“কিন্তু কেন? বাইরে থাকলে ভয়টা কোথায়?”

“ভয় আছে—বাইরে থাকলে, তার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে, শাসকদের বিরোধী হতে পারে সে।”

অরিন্দম হাসল, “ওঃ বুঝেছি। খুব যুক্তিসঙ্গত নিয়ম।”

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে সে প্রশ্ন করল, “তুমি তৈরী আছ অরিন্দম?”

“হ্যাঁ।”

“তবে চল।”

“চল। কিন্তু একটা কথা আছে দেবদত্ত—”

“কি?”

“তোমাকে ধনবাদ দিচ্ছি”—

“কেন?” দেবদত্ত হেসে উঠল, “হঠাৎ তোমার এই দাফিয়া কেন?”

“আজ তোমার নির্দেশ অনুযায়ী চলেই আমি মজা পর্যন্ত হতে চলেছি।”

“থাক ওসব কথা—তুমি আমার বন্ধু। এবার চল, সময় হয়ে এল, আর শোন, আদবকারদা যা শিখিয়ে দিয়েছি তা ভুলোনা।”

“না।”

বন্ধু! মেঘ ও বাঘের বন্ধুত্ব! অস্বাভাবিক তবু যেন সম্ভব বলেও মনে হয়। দেবদত্ত ধনবানদেরই একজন, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা কিছু আছে যার জন্য তাকে ঘৃণা করতে পারা যায় না। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ হয় পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। তা নষ্ট হলে সে সমস্ত গুণকথা প্রকাশ করে কি করে? আচ্ছা, দেখা যাবে, এত দিন যাক।

আজবনগরের শাসনকর্তার প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করল দুজনে।

দ্বাররক্ষী ও অস্ত্রাস্ত্র রক্ষীরা সসম্মানে অভিবাদন করল। শাসনকর্তার

দুপ্তরের একজন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা হলঘরে ।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল । ফটিক-স্বচ্ছ মেঝের চারদিকে বহুমূল্য আসন, আসবাবপত্র ও আলোকবর্তিকা । অগাধ মস্তুরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাছাড়া সরকারী বড় বড় কর্মচারীরা, দাসদাসীরা ।

দেবদত্ত মস্তুরাদের সঙ্গে অরিন্দমের আলাপ করিয়ে দিল ।

প্রসেনজিৎ, মহানন্দ, অবতারনাথ ও বিনায়ক । সকলেই স্মিতহাস্তে সম্বর্দ্ধনা জানালেন অরিন্দমকে ।

প্রধান মন্ত্রী প্রসেনজিৎ বললেন, “ভ্রামর! আপনাকে আমাদের সহযোগী রূপে পেয়ে গৌরবান্বিত—অল্প বয়সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি জীবনে যে সাক্ষ্য অর্জন করেছেন তা বিস্ময়কর ।”

অরিন্দম বিনীতকণ্ঠে বলল, “আমিও গৌরবান্বিত বোধ করছি—আপনাদের মত বিশেষ ব্যক্তিদের সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য আমার স্বপ্নাতীত ছিল । আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, প্রার্থনা করছি যে আপনারাই আমাকে বৃদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করবেন”—

মস্তুরা খুশী হয়ে উঠলেন অরিন্দমের বিনয়-বাক্যে, বললেন, “সাদু—সাদু—”

বোধকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “আপনারা মনোযোগী হোন—মহামায়া শাসনকর্তা আগমন করছেন—”

কে বোঝা করে ? জাগো—ও-ও-ও—। এই কি সেই মণিময় কক্ষ ? হিন্দু কোথায় সেই নৃত্য, সঙ্গীত, বাগাযন্ত্রের মর্মস্পর্শী আলাপ ? অরিন্দম নড়ে উঠল । এ কি দিব্যস্থান দেখছে সে ? কেন সে অত্মমনস্ক হয়ে পড়ছে ? গ্রহরৌর ডাক ? না, সে ভোলেনি । সে জাগ্রত ।

সবাই যুক্ত করে মাথা হেঁট করে প্রণাম জানাল । অরিন্দম দেখল যে আজবনগরের শাসনকর্তা ধনরাজ হলঘরে প্রবেশ করছেন । তার ছই পাশে দুজন অস্থায়ী দেহরক্ষী ।

প্রৌঢ়, মেদ-সমৃদ্ধ ও দীর্ঘকায় ধনরাজের কণ্ঠে হীরক-হার ঝকঝক করছে, চকচক করছে তাঁর ছোটো শ্রেন চকু। বাঁকা নাক, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠ আর পদক্ষেপে তাঁর আত্ম-প্রত্যয় ও চাতুর্ঘ্য সূচিত হচ্ছে। তিনি এসে হলঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন।

প্রসেনজিৎ অরিন্দমকে নিয়ে গিয়ে ধনরাজের সামনে দাঁড় করালেন।

“মহামাত্তবর। ইনিই অরিন্দম—”

অরিন্দম যুক্তকরে মন্তক অবনত করল।

ধনরাজ ভীক্ষু দৃষ্টি মেলে তাকালেন, ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে গভীর কণ্ঠে বললেন, “অরিন্দম বাবু, আপনি যে শক্তিমান তার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি এবং তাই আজ আপনাকে আমার অন্যতম মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করছি। আজ থেকে আপনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আমার তথা আজবনগরের স্বার্থ এবং আপনাদের মন্ত্রীসভার স্বার্থ রক্ষা করবেন এই শপথ করুন—”

“আমি শপথ করছি—”

“মন্ত্রিবর—আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।”

অত্যাগত মন্ত্রী এবং কর্মচারীরা সহর্ষ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল। অরিন্দম ধনরাজকে আবার নতমস্তকে প্রণাম জানাল।

ধনরাজ ঘুরে দাঁড়ালেন, ধীর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আবার ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

প্রসেনজিৎ এসে অরিন্দমকে বললেন, “আমার বাড়ীতে একবার চলুন অরিন্দমবাবু—আপনার সম্মানার্থে আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া সেখানেই আপনার কতবা সম্পর্কে কয়েকটা নির্দেশ দেব আমি। আপত্তি আছে কি?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না আপত্তি কিসের?”

মহানন্দ বললেন, “এত অল্পবয়স্ক মন্ত্রী আর পৃথিবীর কোথাও বোধ হয় নেই প্রসেনজিৎ—সত্যি ভারী বিচিত্র ব্যাপার—”

অঘোরনাথ প্রসেনজিৎকে বললেন, “অরিন্দমবাবুকে আগামী কাল যে সভা আছে তার কথা বলে দাও।”

প্রসেনজিৎ মাথা নাড়লেন “বখার্ব। অরিন্দমবাবু অবশ্যই আসবেন—দপ্তরখানাতে।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

বিনাশক অরিন্দমের কাছে এগিয়ে এলেন, ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, “বয়স এত অল্প যে আপনাকে ‘আপনি’ বলতে কষ্ট হবে মশাই—”

অরিন্দম হাসল, “বেশতো—তুমি-ই বলবেন—”

প্রসেনজিৎ হেসে উঠলেন, “বাঁচা গেল, আমিও তাই বাক্য ভাই—”

অঘোরনাথ ও মহানন্দ সমস্তেরে বললেন, “আমরাও একই দলের ভায়া।”

সবাই হেসে উঠল।

প্রসেনজিৎ অরিন্দমকে হাত ধরে টানলেন, “চল অরিন্দম—আর কেন? অনুষ্ঠানপত্র তো শেষ হল, এবার কাজের পালা। দেবদত্ত, তুমিও চল।”

দেবদত্ত বলল, “চলুন।”

সবাই অগ্রসর হল। অরিন্দম মনে মনে হাসল। ‘এবার কাজের পালা’! কাজ! হ্যাঁ, কাজই বটে। নতুন পদবেশে কাজ শুরু করল সে। কিন্তু তার কাজ মন্ত্রীত্ব নয়; তার কাজ অজ্ঞায়, পাপ, হিংসা ও লোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

এগোতে এগোতে হঠাৎ থামল অরিন্দম। দেওয়ালের গায়ে সোনার কার্ঠামোতে বসানো একটি জ্যোতির্ময় বুদ্ধের প্রতিকৃতি। তাঁর মুখে শিশুসুলভ পবিত্র হাসি, চোখে সুখে প্রেমের জ্যোতি।

সে প্রশ্ন করল, “এটি কার ছবি?”

প্রসেনজিৎ বললেন, “সাধু মোহনদাসের।”

“উনি সাধু?”

“চলতি কথায় সাধু বলতে যা বোঝায় উনি তা ছিলেন না তবে চিন্তায়, কর্মে, বাক্যে উনি সাধু-সদৃশ ছিলেন বলে আজবনগরের লোকেরা তাঁকে সাধু আখ্যা দিয়েছিল।”

“উনি কি বলতেন?”

প্রসেনজিৎ হাসলেন, “কি বলতেন? এই যেমন—‘হিংসা পাপ’, ‘মানুষকে ভালোবাস’, ‘সত্যই ভগবান’, ‘মানুষ হও’—ইত্যাদি—”

অরিন্দমের সবাক্সে শিহরণ পেলে গেল, “উনি বলতেন!”

“হ্যাঁ।”

“সবাই কি তাঁর কথা শোনে?”

“কোনতে চাইলেও তা কি সম্ভব?”

“আপনারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করেন?”

“করি না! নিশ্চয়ই করি—দেবতুল্য লোক তে!”

“তাঁর কথা শোনে?”

প্রসেনজিৎ হাসলেন, “তুমি অল্পবয়স বলেই এমন প্রশ্ন করছ। এইসব সাধুদের কথা বাজে পরিণত করা হুঁকর। তবে হ্যাঁ, আমরা আর সবাইকে বলি তাঁর কথা মানতে আর নিজেরা গভীর শ্রদ্ধা করি—শ্রদ্ধা করি বলেই তো এমনভাবে সোনা দিয়ে মুক্তিও বেগেছি ওর প্রতিকৃতি।”

অরিন্দমের ঠোঁটের কোনে তিক্ত হাসি পেলে গেল, সে বলল,
“তাহলে আমারও শ্রদ্ধা করা উচিত?”

“নিশ্চয়ই—”

অরিন্দম দৃঢ়করে প্রণাম জানাল সেই বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে। মনে মনে বলল, “তোমায় চিনি না, দেখিও নাই কিন্তু তুমি আমার আগে”

এসেছ—তোমার কথা আমারো কথা—স্বর্ণ শৃঙ্খলে বন্দী করে ওরা
তোমাকে সম্মানের নামে অপমান করে—সেই অপমান থেকে আমি
তোমাকে মুক্ত করব সাধু মোহনদাস। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।”

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল, বলল, “চলুন—”

প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে বললেন, “তোমার চোখে জল নাকি
অরিন্দম?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না—ও ধুলো—ওই প্রতিকৃতির গায়ে জমা
ধুলো—”

প্রসেনজিৎের বাড়ীও একটা ছোটখাট প্রাসাদ বললে চলে। তাঁর
বৈঠকখানার ঢকে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। চারদিকে অগাধ
ঐশ্ব্যের ছাপ।

ঘরের মধ্যে চার পাঁচজন লোক বসেছিল, প্রসেনজিৎকে দেখে তারা
সমস্তমে উঠে অভিবাদন জানাল।

প্রসেনজিৎ তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, “আপনারা
একটু বসুন—আমি আসছি”—

দেবদত্ত ও অরিন্দমকে নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করলেন।
সেই কক্ষটি আরো সুসজ্জিত।

“বোস”—তিনি বললেন, তারপর ছাত্রালয়ের দিকে তাকিয়ে হাঁক
দিলেন, “কে আছিঁস্ রে?”

একটি ভৃত্য প্রবেশ করল।

প্রসেনজিৎ বললেন, “যা, দিদিমণিকে খবর দে—বল্ যে নতুন মন্ত্রী-
মশাই এসেছেন”—

ভৃত্য চলে গেল।

প্রসেনজিৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, “শোন অরিন্দম—তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে”—

“বলুন”—

“আশ্চর্য ক্রমত তোমার—বনেদী বড় লোক না হয়েও এত অল্প বয়সে তুমি মন্ত্রী হয়েছ। কিন্তু একটা কথা—আমার নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে”—

“নিশ্চয়ই।”

“মন্ত্রী হলে পর কতকগুলো কথা সব সময়ে মনে রাখবে—তা হচ্ছে : এক, সর্বদা নিজের আত্মীয় বা অত্যাচ্ছ মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মচারীদের আত্মীয় বৃন্দদের সাহায্য করবে। দুই, ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। তিন, বিনয়ের অবতার হবে কিন্তু মুখে যা বলবে কার্যতঃ তার বিপরীত করবে। চার, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য মোটা টাকা নিয়ে ব্যবসায়ীদের কার্যভার দেবে বা নিজেই বেনামীতে সরকারী কাজ করবে। পাঁচ, নৌচ পাড়ার লোকদের অস্ত্র করে রাখবে এবং নিম্নমভাবে তাদের সংঘবদ্ধতাকে দমন করবে। আর এই পাঁচটি কাজ কেন করবে জানো?”

“না।”

“আমাদের শক্তি এবং প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী করতে হবে।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “বুঝেছি। আপনার নির্দেশ আমি পালন করব।”

“বেশ।”

মনে মনে হাসল অরিন্দম : মনিষকরের কথা, মুকুন্দের কথা তা হলে ঠিক। হাড়ের ভূর্গে কে থাকে? এখনো কি তা জানা যায়নি?

প্রসেনজিৎ বললেন, “বেশ। তাহলে কাল থেকে তোমার দপ্তরে যাওয়া শুরু করবে, কেমন? কালকের সভার কথা ভোলনি তো?”

“না।”

দেবদত্ত প্রব্র করল, “কিন্তু কালকের সভার বিষয়বস্তুটা কি প্রধান
মন্ত্রী?”

প্রসেনজিৎ একগাল হেসে জবাব দিলেন, “নতুন কর বসানো হবে
কিনা তাই স্থির হবে।”

দেবদত্ত মুখ বিকৃত করল, “আবার নতুন কর! সেটা অত্যাচার হবে।”

প্রসেনজিৎ ভ্রুকুণ্ডিত করলেন, “অত্যাচার! কেন?”

“আর কর বসালে লোকেরা মারা পড়বে।”

প্রসেনজিৎের চোখে আশ্চর্য ঝলসাল, “দেবদত্ত!”

“কি?”

“তোমার অস্থখ এখনো কমেনি দেখছি।”

দেবদত্ত মাথা নাড়ল, “চিকিৎসক তো কমই বলল।”

অরিন্দম বুঝতে পারল না। ব্যাপার কি? কি হয়েছে দেবদত্তের?

“কি রোগ দেবদত্ত?”

প্রসেনজিৎ বললেন, “দেবদত্তের হৃদয় খুব দুর্বল যে পড়েছে,
না দেবদত্ত, ভালো কথা না, অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা কর।”

দেবদত্ত গম্ভীর হয়ে বলল, “আচ্ছা।”

প্রসেনজিৎ বললেন, “নতুন ব্যবসা কি করছ অরিন্দম?”

“চালের ব্যবসা।”

“ভালো ব্যবসা। আমাদের আছে। তবে কাপড়, ওষুধপত্র আর
অত্যাচার প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবসাও শুরু করো।”

“মানে?”—

“মানে কালোবাজার আর কি?”

“কালোবাজারটা কি?”

প্রসেনজিৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, দেবদত্তও সেই হাসিতে
যোগ দিল। অরিন্দম বোকার মত চেয়ে রইল।

প্রসেনজিৎ হাসি থামিয়ে বললেন, “কালোবাজার হচ্ছে সেই বাজার

বা বাইরের প্রকাণ্ড বাজারে অভাব সৃষ্টি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে সমস্ত জমা করে চড়া দামে জিনিষ বিক্রী করে।”

“কথাটা এখনো বুঝলাম না।”

“বলছি। ধর, তুমি কাপড়ের বলগুলো থেকে সব কাপড় নিয়ে নিজের গুদামে জমা করলে। ফলে বাজারের সাধারণ দোকানে কাপড়ের অভাব সৃষ্টি হল। কিন্তু লোকের চাহিদা থামবে কেন? তারা জ্বাংটো থাকতে পারে না। সুতরাং তারা দর চড়াতে লাগল—যত দাম হোক, লজ্জানিবারণ করার মত একটি কাপড় চাইবেই তারা। ঠিক তখনই তুমি কাপড় ছাড়তে লাগলে বাজারে। এবার মুনাকার কথা ভেবে দেখে—”

অরিন্দম দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বলল, “বটে! তাহলে তো কালো-বাজারের ব্যবসা করতেই হবে।”

“হ্যাঁ কর! বেশী করবার সময় পাবে না—মন্ত্রীও মানলাতে হবে তো। বড় বড় ব্যবসাদার আরো আছে। তারা আসবে তোমার কাছে প্রণামী নিয়ে—ব্যবসা না করেও লাভ হবে।”

“কেন?”

দেবদত্ত হাকল, “বাং, তুমি মন্ত্রী, প্রণামী না দিলে তাদের ধরিয়ে দিতে পারো যে।”

• অরিন্দম শিউরে উঠল, “কিন্তু এই কালোবাজার তো চিরকাল চলতে পারে না—”

প্রসেনজিৎ হাত নেড়ে বললেন, “আমরা চালাব। হু-হু-হু—অমনি কালোবাজার। বহা, ভূমিকম্প—অমনি কালোবাজার। পৃথিবীর বহুদূরে বুদ্ধ বাধল—কালোবাজার। এমন কি অমাবস্তা, পূর্ণিমা আর টিকটিক হাঁচলেও কালোবাজার। সুতরাং বুঝে নাও। আর মজা কি জানো? সারা পৃথিবী জুড়ে এই বাজার চলছে আর এইটেই আসল বাজার। মিলের দ্বালিক দাম চড়িয়ে বিক্রি করল, বড় ব্যবসাদার আর এক দফা

দাম চড়াল, ছোট ব্যবসাদার আর এক দফা দাম চড়াবে। এক টাকার জিনিসের দাম হবে পাঁচ টাকা।”

অরিন্দমের মুখে কথা ফুটল না। চোখের সামনে তার প্রসেনজিতের মুখ। তার আড়ালে সংখ্যাভীত মৃতের মুখ। হাড়ের দুর্গে কে থাকে ?

অরিন্দম মুহূর্তে প্রশ্ন করল, ‘আপনার কি কি ব্যবসা আছে ?’

‘চাল, কাপড় আর গুণ্ড।’ প্রতিপদে মানুষের যা দরকার।”

‘কিন্তু কালোবাজার বারী করে তাদের কি ধরা উচিত নয় ?’

‘উচিত বৈকি। যারা প্রণামী দেবেনা—তাদের। প্রণামী দিয়ে যারা রাজভক্তির পরিচয় দেবে তারা তো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রজা। আর আমরা ? আমরা আইনের উদ্দেশ্যে।’

অরিন্দম হাসল।

প্রসেনজিৎ বললেন, “ওঘরে কারা বসে আছে—এবার তা বুঝলে ?”

“বুঝলাম।”

“বাবা—”

সবাই পেছন দিকে ফিরে তাকাল।

দ্বারপ্রান্তে একটি বড়ি বাইশ বছরের যুবতী।

প্রসেনজিৎ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, “এই যে মা, আর। অরিন্দম, এই আমার মেয়ে মীনাঙ্গী—আজবনগরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য-ভারতী উপাধি পেয়েছে এইবার। বুঝলি মা, ইনিই সেই নতুন মন্ত্রী—”

মীনাঙ্গী পিতৃহাস্তে মুখ উদ্ভাসিত করে, যুক্তকরে বলল, “নমস্কার—নমস্কার দেবদত্তবাবু—”

“নমস্কার”—অরিন্দম গুরু কণ্ঠে বলল।

মীনাঙ্গীর দিকে তাকাল সে। পূর্ণযৌবনা যুবতী। সোনার কাজ-করা বহুলা শাড়ী তার পরনে; হাতে, গলায়, আঙ্গুলে ও কাণে হিরক-খচিত অলঙ্কার। সূর্য-লাগানো চোখের চঞ্চল নির্লজ্জ কটাক্ষ, কবরী ঘিরে ফুলের মালা, বাক্য ভুরু, দুটি পুরু ঠোটে রক্তবর্ণ-প্রলেপ।

কীণ কটি, তবী। স্তম্ভভার স্তন্যগুলকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করানোর জন্য শাড়ীকে আঁটসাঁট করে পরেছে সে। সর্বদিকে মন্দির শান্ত, দেহভঙ্গীতে যেন মত্ততার নিমন্ত্রণ।

“আগনি।” সে বলল, “আপনার ছবি কত দেখেছি—কত নাম শুনেছি আপনার—”

অরিন্দম বিনীতভাবে হাসল শুধু, কথা বলল না। মেয়েটির রূপ আছে কিন্তু তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা রাক্ষসী কুখার ছাপ।

কেন? অরিন্দম অস্বস্তি বোধ করে।

মিনাকী বলল, “কাল আপনাদের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র যাবে বটে—কিন্তু আজই আপনাদের বলে রাখছি আমি। আমাদের ‘মধুকর-সঙ্কেত’ কাল রাতে উৎসব অনুষ্ঠান আছে—সেখানে আসতে হবে আপনাদের।”

“কিসের উৎসব?” অরিন্দম প্রশ্ন না করে পারল না।

দেবদত্ত হেসে উঠল, “কিসের আবার? আনন্দোৎসব।”

“ওঃ—আজ্ঞা নিশ্চয়ই যাব মিনাকী দেবী।”

মিনাকী এগিয়ে এসে তঠাৎ অরিন্দমের হাত ধরল, বিচিত্র হেসে বলল, “ধন্তব্য—এবার চলুন—একটু জলযোগ করতে হবে।”

মিনাকীর হাতের সুকোমল উষ্ণতার অরিন্দম কঁপে উঠল। কিন্তু না, সে বিভ্রান্ত হবে না, কটাক্ষ-শরে সে পরাজিত হবে না। ললিতা, আমি তোমার। ললিতা, আমি আসছি।

আটমাস পরে আবার সে নৌচুপাড়ার পথে পা দিল। সেই পরিচিত পথ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঁড়, আর সেই অন্ধকার গলি, খোলা নালি। আবর্জনা, দুর্গন্ধ, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, গোমহীন কুকুর, ছোট ছোট দোকানপাট, নগ্ন ছেলেমেয়ে। আর এখানে, ওখানে,

রাজার এ বঁকে সে বঁকে—শবদেহ। বাতাস হুগুগে ময়ূর। মৃত্যু।
 মাছুষ এখনো একইভাবে অনাহারে ও ব্যাধিতে অকালে মরছে।
 হাড়ের হুগুগে কে থাকে? বহুদিন আগেকার সেই চোর, সেই খুনী আর
 দামোদরের কথাই তাহলে সত্য ছিল! কিন্তু আর দেহী নেই, সে
 মাছুষের হুঃখকে দূর করবে। কোন প্রহর? দিনমণি সূর্যদেব আস্তে
 গেছেন, আকাশের গায়ে তাঁর রক্তলিপি। রূপসী নদীর তলের ধারে
 হয়ত শালবন থেকে হরিণের পাল নেমে এসেছে। সেই মণিমর কক্ষে
 হয়ত সেই বুড়ো বেহালা-বাদক তরঙ্গ হয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। হৃদয়
 জ্বলছে, পায়ে নীচেকার মাটি কাঁপছে। সেই স্বর্ণকেশী নতকী হয়ত
 নৃত্য শুরু করেছে। ললিতা, তুমি আমার।

আঁকাবঁকা গলি। গলির পর গলি।

বিবর্ণ বাষ্পীয় আলোক-স্তুম্ব।

নগ্ন ছেলেমেয়েদের উদ্দাস চাহনি।

চিস্তাক্রিষ্ট পিতামাতার চোখে স্নেহ।

দরিদ্র যুবক যুবতীর ভালবাসা।

জীবনকে খাসরোধ করার চক্রান্ত চারদিকে। তবু জীবন মহাজীবন
 হচ্ছে। মৃত্যুকে অগ্রাহ করে। ব্যাধিকে ভোগ করে, অভাবকে সহ্য
 করেও জীবন তপস্তা করছে। হুঃখের হোমানলে তার হুঃখজয়ের সাধনা।
 ললিতা, আমি আসছি।

অরিন্দম এগিয়ে চল। বড় বড় পা ফেলে। প্রায় দৌড়ে।

আর তাকে দেখে কানাকানি করল কয়েকজন। তারা তাকে
 অশ্রুসরণ করল। চলতে চলতে তারা অন্তর পথচারীদের কি যেন
 বলল। সবাই তাকাল অরিন্দমের দিকে। হ্যাঁ, তাকে চিনেছে তারা।
 প্রতিদিন সংবাদপত্রে তার ছবি তারা দেখেছে। আজবনগরের অন্ততম
 মন্ত্রী তাঁদের পাড়াতে প্রবেশ করেছে।

অরিন্দম চলতে চলতে তাকাল চারদিকে। সব সেই আগের মতই

আছে। শুধু আরো শ্রীহীন, আরো নিঃশব্দ, আরো বিয়র। ভাইসব, সময় হয়েছে, আর ভর করো না। ললিতা কি ভাবছে? তার কথা? কেমন আছে সে?

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল তারা। প্রতি মুহূর্তে তারা সংখ্যার বাড়তে লাগল। দেখ, উঁচুপাড়ার একজন দেবতা তাদের জগতে এসেছে।

কেমন আছে মুকুন্দ? বলরাম কি আরো পাগল হয়েছে? অতাব কি আরো বেড়েছে? কিছু যায় আসে না, কোন চিন্তা নেই। অরিন্দম থাকতে তাদের হুঃখ হবে না। তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা পাঁচহাজার টাকা এনেছে সে সন্দেহ করে। তাদের সে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। তারপর আর কটা দিন মাত্র। ললিতা, মংলুষের মুক্তির দিন সমাগত।

তারা সমানে অনুসরণ করে চলল তাকে। তাদের চোখে তীক্ষ্ণতা, তাদের পেশীতে কাঠিন্য। তাদের দৃষ্টি অরিন্দমের ওপর।

অবশেষে।

অরিন্দম স্থির হয়ে দাঁড়াল। এই কি সেই বাড়ী?

তারাও এবার গলির বাকি স্থির হয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল।

অরিন্দম বাড়ীর বারান্দায় পা দিল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ীটা নিঃশব্দ। বাড়ীতে যেন মৃত্যুর আবহাওয়া। তবু হৃদয়টা হুলছে, কাশছে, ছলছে—

পা টিপে টিপে ভেতরের দিকে এগোল অরিন্দম।

সামনেই একটা ঘর।

অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দ বসে আছে। হাতে চাষের পাত্র, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোক।

আর ঘরের এক কোণে ললিতা একটা বাক্স খুলে কি যেন হাংড়াচ্ছে। অরিন্দমের মুখে ডাক এল—ললিতা ললিতা ললিতা।

কিন্তু নিজেকে সংযত করল অরিন্দম, ডাকল, “মুকুন্দ”—

মুকুন্দ চমকে ঘুরে বসল, ললিতা চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের ছ’চোখে বিস্ময়।

স্বকতা।

সুগভীর স্বকতা। যেন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাওয়া যাবে।

অরিন্দম একপা এগোল, হাসল, বলল, “আমি—আনি মুকুন্দ, চিনতে পারছ না?”

মুকুন্দ গুঁফ হেসে বলল, “তুমি! না, চেনা যায় না।”

অরিন্দম ললিতার দিকে তাকাল। ললিতা তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু রোগা হয়েছে সে, চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়েছে, তবু সেই ললিতা। সেই বিকৃত কালো সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত কেশপাশ, সেই অর্ধ-চন্দ্রের মত ললাটদেশ, সেই আশ্চর্য রূপ। কিন্তু মুখে হাসি নেই তার, নেই উল্লাসের জ্যোতি চোখে। কেন? এতদিন পর তাকে দেখে ললিতার এ কী হোল? তার কালিন্দী-কালো চোখের তারার কেন বেদনার গাঢ়তা?

অরিন্দম ফিরে তাকাল মুকুন্দের দিকে, প্রশ্ন করল, “আমাকে চেনা যায় না—আমার কি এতই পরিবর্তন হয়েছে মুকুন্দ?”

মুকুন্দ নড়ল না স্থিরভাবে বলল, “হয়েছে বৈকি। লোহার কারখানার মজুর আজ মন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীবর, তুমি এখানে কেন?”

মুকুন্দের কণ্ঠস্বরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। অরিন্দম বিবর্ণ হয়ে গেল, শরীরের রক্ত যেন একমুহূর্ত জল হয়ে গেল। এ কোন্ মুকুন্দ কথা বলছে! তার বন্ধু! কী হল মুকুন্দের?

ললিতার দিকে তাকাল সে। ললিতা দৃষ্টি নত করল, ধীরে ধীরে সে তার পাশ দিয়ে চলে গেল প্রায় টলতে টলতে। তার দেহস্বরূপিণী এসে অরিন্দমের চেতনাকে প্লাবিত করল। কিন্তু কথা বলল না ললিতা! একটা সম্ভাষণও না! ললিতা—ললিতা!

মুকুন্দের কঠিনকণ্ঠ তাকে সচকিত করে তুলল।

“মন্ত্রীবর, এখানে তোমার কি দরকার?”

বেদনার জ্ঞান হয়ে অরিন্দম বলল, “মন্ত্রী হওয়া কি খারাপ মুকুন্দ?”

“হ্যাঁ, খারাপ।”

“কেন?”

“কারণ ঐশ্বর্য না হলে তুমি মন্ত্রী হতে পারতে না। আর কিভাবে ঐশ্বর্য আহরণ করেছ তুমি? পাপ করে, অত্যাচার করে, মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণ করে।”

“কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো জান তুমি।”

“জানলেও বিশ্বাস করি না তোমাকে, কারণ তুমি আদর্শচ্যুত।”

“কি করে? তোমার আদর্শ তো আমারো আদর্শ।”

“না। আমার আদর্শ মানুষের মঙ্গল করা এবং তা অত্যাচার করে করা যায় না। অত্যাচারের দ্বারা অত্যাচারই বাড়ে। ঐশ্বর্য অহঙ্কার বাড়ায়, আত্মাকে ধ্বংস করে।”

“আমার আত্মা জাগ্রত মুকুন্দ।”

“তর্ক করতে রাজী নই আমি। শোন অরিন্দম, বাঘের পালে মেঘশাবক কি করবে?”

“আমি তাদের অস্তরের পরিবর্তন করব।”

“করো—তাই দেখার প্রত্যাশায় রইলাম।”

“তোমার বিশ্বাস হয় না?”

“না। যারা তোমাকে মন্ত্রী করেছে তারা জানে একজন তাদের চক্রকে ধ্বংস করতে পারবে না।”

“মুকুন্দ—”

“সত্যের পথ সোজা। অরিন্দম, সত্যের সঙ্গে পাপের সন্ধি হয় না। পাপ করে পুণ্যলাভ হয় না।”

“মুকুন্দ—”

“তোমার অন্তরে পচন ধরেছে অরিন্দম—”

“মুকুন্দ—”

আরো সোজা করে দাঁড়াল মুকুন্দ, বজ্রকণ্ঠে বলল, “তুমি এবার যাও অরিন্দম—”

অরিন্দম টলতে লাগল, বলল, “একটা কথা মুকুন্দ—”

“বল ।”

“কেমন আছ ?”

মুকুন্দ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে স্নান হাসল, বলল, “ভালো না, আমারো চাকরী গেছে ।”

‘বাবা কেমন আছেন ?’

“উন্মাদ ।”

‘আর পবর কি ?’

“বাচ্চা ভাই ছোটো মারা গেছে—অন্নাহার-জন্মিত রোগে ভুগে ভুগে—”

অরিন্দম চোপ বুজে দরজায় হাত দিয়ে বিকৃতকণ্ঠে বলল, “মুকুন্দ !”

মুকুন্দ তিক্ত হেসে বলল, “হ্যাঁ মস্ত্রীমশাই । তা কি করা যাবে ? নীচপাড়ায় অমন কত শিশুরা মারা যাচ্ছে—পৃথিবীময় অমন কত প্রাণ অর্থহীনভাবে শেষ হচ্ছে । কি যায় আসে ? শুধু মা বুঝতে চায় না—”

অরিন্দম চোপ মেলে তাকাল মুকুন্দের দিকে । মুকুন্দের চোখে স্বপ্নদের ক্রোশ, অথচ তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা । তার প্রতিটি কথা যেন অগ্নিশলাকার মত তার কাণে এসে বিধতে থাকে, বিষের মত ছড়িয়ে পড়ে তার বুকে, মৃত্যুর মত আঘাত করে তার চেতনায় ।

“বুঝলে মস্ত্রী, শুধু মা রাগসীই বুঝতে চায় না—তার মতে অমন ছুটি বাচ্চা নাকি পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না । হাঃ হাঃ হাঃ—”

হা হা করে হাসতে লাগল মুকুন্দ । পাগলের মত ।

অরিন্দম আতঁকণ্ঠে বলল, “থামো মুকুন্দ—থামো—”

মুকুন্দ খামল, "আহা, কষ্ট হচ্ছে বুঝি? আমি সত্যি ভারী দুঃখিত
মন্ত্রীবর—"

অরিন্দম কর্ণপাত করল না, প্রশ্ন করল, "আর সত্যের খবর কি?"

মুকুন্দ চোখ ছোট করল, "তুমি সরকারের লোক—তোমাকে বলব
কেন? শুধু এহুটুকু শুনে রাখো যে আমাদের জয় হবেই। কিন্তু
আর কেন? এবার তুমি এসো—"

"বাচ্ছি।" অরিন্দম ব্যবস্রভাবে হাসল, একটু ইতস্ততঃ করে বলল,
"আমি আজ এসেছিলাম অস্ত্র উদ্ধে—"

"কি?"

"তোমরা আমার ওখানে গিয়ে থাকবে চলো।"

"কি বললে?"

"ই্যা। গতাবের দিন চলেছে—তাই—"

"অরিন্দম।"

"বুঝেছি। তোমরা যাবে না। কিন্তু একটি অনুরোধ করছি—
সেটা রাখলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

"বল।"

"কিছু টাকা এনেছি সঙ্গে—নাও—"

পকেট থেকে কাগজের মুদ্রাগুলোকে বের করল অরিন্দম।

মুকুন্দের দু'চোখ জলে উঠল, দাড়ি গোঁফে টাকা মুখে তার
ঘৃণা কুণ্ডিত হয়ে উঠল, সে বলল, "তোমার স্পর্ধা তো কম নয়
অরিন্দম।"

অসহায় ভঙ্গীতে অরিন্দম বলল, "আমি তোমার বন্ধু মুকুন্দ—"

"বন্ধু!" মুকুন্দ ঘৃণায় ঠোঁট ওলটাল, তারপর স্থির দৃষ্টি মেলে বলল,
"মন্ত্রী হয়েও বটে, কিন্তু বুদ্ধি তোমার খরো খোলেনি। শোন, তুমি
আমার বন্ধু নও আমার শত্রু—"

"শত্রু!" যেন এমটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল অরিন্দম, দু'চোখ তার জলে

ভরে এস, প্রতিবাদ করতে গিয়েও সে আর কথা খুঁজে পেল না, টাকা
গুলো তার হাত থেকে মেঝের ওপর খসে পড়ল।

“কে? এখানে কে?”

অরিন্দম ফিরে তাকাল। বলরাম ঘরে ঢুকছে।

সেই বহুদিন আগেকার মতই হুঁচোখ ছোট করে, এক হাতের তালু
চোখের ওপর রেখে সে বলল, “কে? তুমি কে?”

অরিন্দম মুহূর্তে বলল, “আমি অরিন্দম।”

হুঁ পা পিছিয়ে গেল বলরাম, চোখের তারা বড় করে বলল, “তুমি!
হি হি হি—বটে! তা দিবি আচ্ছ দেখছি।” হঠাৎ মেঝের ওপর নড়র
পড়ল তার, চোখের তারায় স্বপ্ন ঘনাল, গলার সুর নামিয়ে সে মুকুন্দকে
প্রশ্ন করল, “ওগুলো কি সত্যি টাকা?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ।”

“ক’র?”

“অরিন্দমের”—

হুঁ পা পেছিয়ে গেল বলরাম, “কেন এনেছে ওই টাকা?”

“আমাদের দিতে।”

“তুমি নেবে?”

“না। আপনার চাই নাকি?”

বলরাম গর্জে উঠল, “স্ববরদার—আমাকে জলুক করো না
শয়তান”—

মুকুন্দ টাকাগুলো কুড়োতে লাগল।

বলরাম যেন ভয় পেল, ঘরের কোণে গিয়ে কুঁকড়ে দাঁড়াল, চাপা
গলায় বলল, “ছুঁস্নি মুকুন্দ, ছুঁস্নি— ওগুলো বিষাক্ত—ওনছিস্?”

মুকুন্দ টাকাগুলো অরিন্দমের দিকে তুলে ধরল, বলল, “ওনলে তো—
এবার যাও। তুমি এককালে বন্ধু ছিলে বলেই আজ ক্ষমা করলাম।”

অরিন্দম নিঃশব্দে নিল সেই টাকা। কথা বলতে চেয়েও পারল না

সে, তার জিন্স যেন পাখর হয়ে গেছে, নড়তে চেয়েও পারল না সে, তার শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

বলরাম হাত নেড়ে দূরে যাবার ভঙ্গী করতে লাগল, “হ্যাঁ—চলে যাও, চলে যাও তুমি অরিন্দম। কি ভেবেছ তুমি? টাকা দিয়ে সাহায্যের নামে দয়া করতে এসেছ?” বলরাম হাসল, “সেই ছোটবেলা থেকে কষ্ট সয়ে আসছি, আধপেটা খেয়ে আসছি—মাঝার চুলে পাক ধরেছে, এরার মরতেও চলেছি—কিন্তু আমার ইতিহাস কি?—বলরাম দাস গরীব কিন্তু মানুষ।”

“শুনুন”—অর্ধকুট কণ্ঠে বলতে চাইল অরিন্দম।

পাংগল উত্তেজিত হয়ে উঠল, “না, শুনব না, আমি বধির। বুঝে শুনেছ? আমার বাচ্চা ছেলোময়ে ছোটো ভবনদী পার হয়েছে—বুঝে না? মরেছে। মানে চুলোয় গেছে। খেতে পাই না, খাওয়াতে পারি না—লজ্জায় আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে করে তবু ভিক্ষা নয়, দানগ্রহণ নয়, শরতানের প্রয়োজনের কাছে মাথা নীচু করা নয়। মরে যাব—মরে মানুষের বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাব—তবু আমার ইতিহাস কি?—গরীব কিন্তু মানুষ—হি টি হি”—

বলরাম একটানা হেসে চলল।

মুকুল বলল, “অরিন্দম”—

“টলতে টলতে বাইরে পেরোল অরিন্দম। না, ওরা বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না তাকে। কর্মের দ্বারা প্রমাণ না দিলে ওদের ডর করতে পারবে না সে। কিন্তু ললিতা? সেও কি তার আগের মতই পোষণ করছে? না, ললিতা যে তাকে ভালবাসে। কিন্তু তা’হলে সে অমনভাবে চলে গেল কেন? কেন? ছ’চোখ ছাপিয়ে তার জল বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু না, মৈনিকেরা কাদে না।

বারান্নায় পা দিল অরিন্দম, এদিক ওদিক তাকাল। না, কেউ কোথাও নেই।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, অপেক্ষা করল। যদি ললিতাকে দেখা যায় ? কিন্তু না, ললিতার ছায়াও দেখা গেল না।

মুহূর্তে একবার ডাকল সে, “ললিতা”—

সাদা পাওয়া গেল না।

টলতে টলতে এগোল অরিন্দম। প্রতি পদক্ষেপেই সে যেন শিকড়-জঙ্ঘ একটা বিরাট গাছকে টেনে তুলছে, তার পা সরতে চাইছে না। কিয়ৎ যত্নেই হবে। ললিতাও মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

গলিতে পা দিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আবার তার কানে সেই বেহালাবাদকের বাজনা ভেসে এল। সেই বাজনার মধ্যে যেন নাইটিংপের ডাক, পপলার গাছের মর্মর ধ্বনি, অলস মধ্যাহ্নের দরখানার আর প্রেমিকদের পরপর শ্রবণ। সেই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট নত নীর চেয়ে হাজারগুন রূপসী এক নারীকে সে গলির মুখে দেখতে পেল। একটা দেওয়ানের গায়ে ঝুঁকিয়ে ছাঁচি বিষম চোখ মেলে তার দিকে তাকায় আছে।

“ললিতা”— অরিন্দম যেন নতুন করে প্রাণ পেলে।

ললিতা সেই বিষম কৃষ্টি তুলে ধরল, বলল, “কি ?”

অরিন্দমের গলা কেপে উঠল, “আমার সঙ্গে চল তুমি।”

“কোথায় ?”

“উঁচু গাড়ি। কিছুদিনের মধ্যেই শক্তিম্যানদের মত বদলাব আমি।

কিন্তু এটা, বড় একা মনে হয়—তুমি চল আমার সঙ্গে।”

ললিতা দীর্ঘ দীর্ঘে মাথা নেড়ে বলল, “না—”

“না!” অরিন্দমের হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল, “কিন্তু কেন ললিতা ?

তোমার দাদা আর বাবার মতই কি তোমার মত ?”

“হ্যাঁ। তুমি পাপের সঙ্গে সন্ধি করেছ। চুরী করে শক্তিম্যান হয়েছে তুমি, চোর কি চোরদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে ? না, অন্তায় করে অন্ততকে দূর করা যায় না।”

থেমে গেল। সেই বেহালার বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, নাইটিংস্বেলরা উড়ে গেল। স্বর্ণকেশীর নৃত্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

অরিন্দম অনুনয়ের সুরে বলল, “কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো ললিতা—আমি মানুষের হুঃখ তাড়াতাড়ি দূর করার জন্তই এমন করেছি।”

“বিষ খেয়ে ব্যাধি দূর করলেও বিষই যে আবার প্রাণ হরণ করে।”

“ললিতা”—

“কি?”

ললিতার ছাঁটি হাত চেপে ধরল অরিন্দম, বলল, “তোমার দাদা আর বাবা আমাকে ভুল বুঝলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু তুমি ভুল বুঝলে যে আমার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হয়ে যাবে। আমার সংগ্রাম করার শক্তি যে তুমি।”

সেই বিষয় দৃষ্টিকে নত করে ললিতা প্রশ্ন করল, “আমি কি তোমার কাছে এতই দামী?”

অরিন্দমের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল, “তুমি! তুমি আমার আত্মার আত্মা।”

ললিতা কঁপে উঠল একটু, বলল, “তাহলে আমার কথা শোন”—

“বল—বল”—

“সমস্ত ঐশ্বর্য ফেলে এসো, নীচুপাড়ায় এসে দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম কর।”

অরিন্দমের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। একি পরীক্ষা? আদর্শ না প্রেম? মনুষ্যত্ব না ভালবাসা? আর মনুষ্যত্ব গেলে কি থাকবে? না, ভুল করেনি, আজ না বুঝলেও ললিতা ভবিষ্যতে বুঝবে তার কথা। সাময়িকভাবে তার অন্তঃস্থ হুঃখ আছে। তবু বুক ভেঙ্গে যেতে যায়।

“ললিতা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?”

“আমার কথার জবাব তো দিলে না?”

“তার আগে বল ।”

অরিন্দমের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছুটো ছাড়িয়ে নিল ললিতা, কান্না-মেশানো হাসি ফুটে উঠল মুখে। ছুটি চোখের সেই আশ্চর্য ও বিষন্ন দৃষ্টি মেলে সে বলল, “ভালবাসি বৈকি—ভালো না বাসলে কি লোকলজ্জার মাথা খেয়ে গলিতে এসে দাঁড়াইতাম একটু দেখার জন্য ?”

“তবে ? তবে ?”

“তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু কোন্ তোমাকে ? যে তুমি অন্যায়কে উপেক্ষা করেও মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে, যে তুমি প্রথম দর্শনেই আমার হৃদয় জয় করেছিলে। কিন্তু আজকের তুমি আমার অপরিচিত”—

“ললিতা!”—

“ই্যা, আবার যেদিন তোমার সেই পুরোন সত্তা জেগে উঠবে সেদিন তুমি ইশারা করলেই তোমার পাশে গিরে দাঁড়াব ।”

“ললিতা, আমাকে ভুল বুঝো না ।”

ললিতা হাসল, “যাকে ভালবাসি, তাকে ভুল বুঝি না আমি। কিন্তু যে মানুষ অন্য় করে বড় হয় তাকে আমি চিনি না, তাকে আমি বুঝতে চাই না ।”

অরিন্দম ভগ্নকণ্ঠে বলল, “না চিনলে, না বুঝলে। কিন্তু বিশ্বাস করো ললিতা, আমি অসাধ্য সাধন করব। আমি যে আদর্শজুট্ট হইনি তার প্রমাণ দেব। গিগ্গীরট্ট দেব। আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে বেথানে পৌঁছেছি সেখানে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব। ললিতা, শোন, আমার কোন পরিবর্তন হয়নি ।”

ললিতার ডাঙর ডাঙর চোখে জল দেখা দিল, মাথা নেড়ে সে বলল, “তুমি বুঝতে পারছ না—ভালো করে তাকিয়ে দেখো নিজের দিকে। তোমার চোখে মুখে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ—ঐশ্বরের কালো ছায়া ।”

“ললিতা”

“তুমি এবার যাও—”

“ললিতা !”

আর কথা বলল না ললিতা, ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়াল । ক্ষণকাল অপেক্ষা করল অরিন্দম, ভাবল, তারপর পা বাড়াল ।

“বাই ললিতা—”

“যাও ।” নির্মম একটি কথা । নির্মম আদেশ ।

টলতে টলতে এগিয়ে গেল অরিন্দম । পায়ের নীচে মাটি কাপছে, ছ’পাশের ভাসাচোরা বাড়ীগুলো হুলছে । শব্দ নেই, সুর নেই, চেতনা নেই । ললিতাও তাকে পরিত্যাগ করল । তার কেউ নেই পৃথিবীতে, কেউ না । সে একা । পশুর রাজ্যে সে একা সংগ্রাম করবে বেশ, তাই হবে । কোটি কোটি মানুষের জন্ত সে আজ ললিতার অশ্রুকেও উপেক্ষা করেছে, একাই সে মানুষের ভাগ্য বদলে দেবে । না হত্যা হরণো না বুক চপে ধর, পেশী কাঠিজে শপথকে ঘোষণা করবে ।
এগোও—

গমিতে অন্ধকার রাতের ছায়া । দহদহে একটি আলোককুণ্ড ।

ছায়ামূর্তির ২৬ মানুষের মিছিল ।

গমিটা বাক ফিরল । পা টেনে টেনে এগিয়ে চলল অরিন্দম ।

“তারিও তাকে অনুসরণ করল আবার । অসংখ্য লোক । অরিন্দমের সেদিকে লক্ষ্য নেই ।

সে কি পেছন ফিরে তাকাবে ? ললিতাকে কি দেখে যায় ? না, আর দেবী নয়, এবার তাকে যুদ্ধ-ঘোষণা করতেই হবে । এর বেশী শক্তিশালী হওয়া কি সম্ভব ? আজবনগরের শাসক হওয়া ? হয়ত সম্ভব, কিন্তু তা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ । দেবীই যদি হয়, তাহলে মুকুন্দদের পণ কি দোষ করল ? না এখুনি সে যুদ্ধ-ঘোষণা করবে—আর ক’দিন পর । তারপর ললিতা, তারপর ?

গলিটা গিয়ে একটা রাস্তায় পড়ল। তার পাশে একটা ছোট মাঠ। আবর্জনার তার অর্ধেকটা ডরাট।

“বিশ্বাসঘাতক—”

অরিন্দম চমকে উঠল। একসঙ্গে অনেকে তার পেছনে চোঁচাল।
কারা? ঘুরে দাঁড়াল সে, দেখল যে অসংখ্য লোক—প্রায় তুঁতিনশ।

“বিশ্বাসঘাতক—” লোকগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠল।

কাকে বলছে তারা? কেন? অরিন্দম অবাক হয়ে দাঁড়াল।

লোকগুলো কাছে এল, আরো কাছে। বুতাকারে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অরিন্দম দেখল যে তাদের পরিধানে ছিল বস্ত্র, তাদের মুখে অনশনের শুষ্কতা, তাদের চোখে ঘৃণা।

“কাকে বিশ্বাসঘাতক বলছ তোমরা—কি চাই ভাইসব?” অরিন্দম প্রশ্ন করল।

ভীড়ের ভেতর থেকে এবার লোক এগিয়ে এল। অরিন্দম তাকে চিনল—সে ইঞ্জ।

“ওরে! তুমি!”

ইঞ্জ ক্ষেপে ফেলল না তার কপায়, হিংস্র ভঙ্গিতে সে বলল,
“তোমাকে বলছি আজবদলের মন্ত্রী—তুমি বিশ্বাসঘাতক।”

“কিছু কেন?”

ইঞ্জ জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চীৎকার করে দাঁড়াল, “এই লোক, এই ঘৃণা কার এককালে তোমাদের জন্মের ভগ্ন সংগ্রাম করছিল—কিন্তু সেই মহৎ উত্তরে সে পালন করেন। উচুপাড়ার পাশব জীবন তাকে প্রলুব্ধ করেছে—তোমাদের পরিত্যাগ করে সে পশুবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পাপ করে বড় হয়েছে। যে একদিন তোমাদের বন্ধু ছিল সে আজ তোমাদের শত্রু হয়েছে—ভাইসব, একে ক্ষমা করো না—”

“বিশ্বাসঘাতক—শত্রু”—একসঙ্গে গর্জে উঠল সবাই।

“ভাইসব”—মরিয়ার মত অরিন্দম বলতে গেল।

ইন্দু গর্জে উঠল, “ভাইসব—ওকে শিকা দাও”—

হঠাৎ একটা ইঁট এসে অরিন্দমের গায়ে লাগল। কে একজন
চৌচাল, “মারো—শত্রুকে মারো”—মুহূর্তে যেন কিন্তু হয়ে উঠল সবাই।

“মারো—মারো—”

ইঁটের পর ইঁট এসে অরিন্দমের গায়ে পড়তে লাগল।

“ভাইসব—শোন—”

কেউ শুনল না। ঘুণার একটা তরঙ্গ হিংসার ভেঙ্গে পড়ছে তার
ওপর। হু'হাতে মুখ ঢেকে অরিন্দম বসে পড়ল, মাটিতে লুটিয়ে
পড়ল। কপাল ফেটে তার বস্ত্র পড়ছে।

হঠাৎ কার কোমল স্পর্শে অরিন্দম মুখ থেকে হাত সরাল, দেখল
যে ললিতা এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে।

“ললিতা—সবের ষাও”—অরিন্দম ভীতকণ্ঠে বলল।

ললিতা জনতার দিকে তাকাল। বলল, “একজনের ওপর প্রতিশোধ
নিলেই কি আমাদের দুঃখ দূর হবে?”

ইন্দু বলল, “ডুখে না মিটুক, আশা মিটবে।”

দৃঢ়কণ্ঠে ললিতা বলল, “তাহলে আমাকে মারো।”

স্বকৃত্য।

জনতা রুদ্ধ আক্রোশে কানাকানি করতে লাগল, অপেক্ষা করল
কিছুক্ষণ, তারপর একে একে চলে যেতে লাগল।

শেষে এক সময়ে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

“ললিতা”—অবসন্ন কৃতজ্ঞতার অরিন্দম ডাকল।

শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে অরিন্দমের ললাটের দরুণ মুছে দিল ললিতা,
ক্ষত বোধে দিল, তারপর বলল, “বাড়ী বেতে পারবে?”

“পারব। ললিতা, তুমি না দেখলে আজ কি হত?”

ললিতা সে কথাই জবাব দিল না, বলল, “তাহলে আমি যাঁই।”

অরিন্দম ব্যাকুলভাবে চলল, “আমার বিষয়ে তোমার মত কি কিছুতেই বদলাবে না?”

ললিতা উঠে দাঁড়াল, মুখ ফিরিয়ে বলল, “না।”

“আবার কবে দেখা হবে ললিতা?”

“যেদিন তুমি নীচুপাড়ার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে।”

অরিন্দম আর কথা বলল না, শুধু অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখল যে গভীর একটা মর্মস্পর্শী চাহনি নিক্ষেপ করে ক্ষতপদে চলে গেল ললিতা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেদনা জর্জর দেহ, ক্ষতের আলা, অবসন্ন চেতনা। সে বিশ্বাসঘাতক। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। রাত কত? কোন প্রহর? সেই গুণবান গায়কের মধুকণ্ঠ তো শোনা যায় না? ললিতা চলে গেল। তার কাছে যে প্রেম, ললিতার কাছেও সেই একই প্রেম। প্রেম বড় না আদর্শ বড়। তার এবার অগ্নিপরীক্ষা। অরিন্দম, তুমি পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছ। এবার লাক দেও, প্রমাণ করো তুমি বিশ্বাসঘাতক নও। আর দেরী করো না, মানুষেরা মরছে, তুমিও তিলে তিলে মরছ। ওবা ইট দিয়ে মেরেছে তোমাকে। ললিতা না এলে হয়ত আরো মারত। মারুক, তবু ভয় পেরো না। সিদ্ধিলাভ করলেই তুমি অমৃতলাভ করবে।

একা। সে একা। আকাশের তারারা কি নিভে গেছে? কে ডাকে? জাগো ও-ও—বিশ্বুতি ও বিভ্রান্তি হৈলে উঠে দাঁড়াও—ও-ও-ও-ও—। একা! না, সে একা নয়। তার সঙ্গী আছে, সহযোদ্ধা আছে। অসিধারী সেট প্রহরী ২য় অস্তরেই আছে। আমন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়, তার মুখে হাসি ছড়াল। না, ভয় নেই। ললিতা, তোমাকে আমি পাবই পাব।

মহাকাব্যের আহত বীরের মত অন্ধকারেই পড়ে রইল অরিন্দম।

পরের দিন।

ঠিক নিদিষ্ট সময়ে দপ্তরে গিয়ে হাজির হল মালিকের শ্রীযুত অরিন্দম।

দ্বারপথে আয়োজ্যধারী রক্ষা ও তত্ত্বাবধারী ভূতারা সদস্যগণে অভিবাদন জানান তাকে। সম্পদ নতুন পরিবেশ বলে আরন্দম অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল।

তার দপ্তরখানায় গিয়ে বসল সে। ছোটখাটো ঘর, মাঝে মাঝে মোড়ানো নৈকে, চক্ৰকে চেয়ারে চেঁচনি, কুক্ককে পর্দা ও আলো, 'অরিন' ও বাজনিয়াতর বই ভিত্তি আলমারী। আজকালকার ৬ পুঁজিবাদ মনোচিত্র, কাগজপত্র, পাতা, কলম তারবাণী বাক্‌বাক, বেতাপর বহু, বিজলী পাখ, ফার্পেট এবং আরো অনেক পুঁজিনাটী চিত্র।

পাখাটা চালিয়ে দিল সে। বেছে তার প্রচণ্ড বেদনা, কাল অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিল সে, ভাল ঘুমও হয়নি। তাত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রতন সে, বসে বসে ভাবতে লাগল।

মুকুন্দা উদ্বেজনী এবং জনতার দুখার কারণ যেন সে উপলব্ধি করল। হ্যাঁ, তাদের যুক্তি আছে। কিন্তু লালিতা? তাঁর বাসাতেও কি মাতুষের দুখের বিশ্বাস রাখার মত ক্ষমতা জন্মায় না? কিন্তু না, লালিতা ভাবই করেছে। আদর্শ গেলে মাতুষের থাকে কি? সেই আদর্শকে লালিতা বড় বেশি স্বীকার করেছে। আরন্দমেরও একই আদর্শ কিন্তু পথ ভিন্ন বলেই এই বিরোধ। কিছু যায় আসে না, মাতুষের মঙ্গল দিয়েই কথা।

ঢং—ঢং—

সময় যন্ত্রের ঘণ্টা বাজল। বেলা দুটো।

অরিনন্দ উঠল, কক্ষ থেকে বেরোল। বার-বাক সন্তুষ্টভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল তাকে দেখে। অরিনন্দের অহমিকা প্রশ্ন করল—
তাকে সম্মান দেখান ঐ রক্ষী? আমাকে? অরিনন্দ আত্মতৃপ্তিতে মুগ্ধ হাসল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষল। এক দিনেই সে ভুলে যেতে বসেছে যে ঐ সম্মান কোন ব্যক্তিকে নয়—
কোটি কোটি লোকের শুভাশুভের দায়িত্ব যে পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই পদকে। শক্তি মানুষ্যের মনে বিকারের সৃষ্টি করে—কথাটা কি তবে সত্য?

একটি লম্বা অরিনন্দ। অরিনন্দ শেষে একটি বড় কামরা। সেইটি মহীদের মন্ত্রণা-কক্ষ।

সবাই উপস্থিত ছিল। প্রসেনজিৎ অঘোরনাথ, দেবদত্ত, মহানন্দ ও বিনায়ক। অরিনন্দের উপস্থিতিতে মন্ত্রণাসভা পূর্ণাঙ্গ হল।

প্রসেনজিৎ বললেন, “এসো ভায়া—এসো”—

মহানন্দ মহাশয় বললেন, “তোমার কি হল ভাই? হেঁ হেঁ—
কপালটা ফেটে গেছে দেখছি”—

বিনায়ক মহাত্মভিঃস্বঃ শব্দ করে বললেন, “যথার্থ, অনেকখানি
ফেটে গেছে যে—ইস্”—

অঘোরনাথ প্রশ্ন করলেন, “কোন চুলোয় গিয়েছিলো ভাই—খুব
নেশা হয়েছিল বুঝি?”

প্রসেনজিৎ মাথা নেড়ে বললেন, “নেশা কী? তো ভাগই হত—
ভায়া আমাদের সে সব গুণ নেই—তিনি গিয়েছিলেন নীচুপাড়ায়”—

অরিনন্দ অবাক হয়ে গেল, “আপনি কি করে জানলেন?”

“জানেনা যে মেয়ালের ভেতরেও আমাদের কান আছে?”

মহানন্দ থুং থুং করে হেসে বললেন, “নীচুপাড়ায় কেন প্রধানমন্ত্রী?”

“কেন আবার—সেখানে ওর একটি ইয়ে আছে”—

প্রসেনজিতের ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রসেনজিৎ বললেন, “কিন্তু অরিন্দম, তোমার আর নীচুপাড়ায় যাওয়া চলবে না। একা গেলে অমনিভাবেই সেখানকার জানোয়ারেরা তোমাকে মারবে—তাছাড়া তুমি একজন মন্ত্রী। তার সঙ্গে মেলামেশা তোমার নিষেধ। এখন থেকে কোথাও গেলে তোমার জন্তু নির্দিষ্ট যে বাষ্পযান রয়েছে তাতে চড়ে দেহরক্ষী নিয়ে যাবে।”

প্রতিবাদ করবে কি? অরিন্দম একবার ভাবল, তারপর মুখের কথা গিলে ফেলে বিনীতভাবে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন থেকে আপনার নির্দেশই পালন করব।”

বেশ, প্রসেনজিৎ বললেন, “এবার তাহলে আজকের আলোচনা শুরু হোক। তোমরা জানো যে একটি নতুন করে বিষয়েই আজকের আলোচনা। এখন বল দেখি কিসের ওপর কর ধার্য করা যায়?”

সবাই ভাবতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে দেবদত্ত বলল, “কিন্তু আর তো কোন নতুন করে সুযোগ দেখছি না আমি। নুন, তেল, কাপড় থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি গ্রাসের জন্তুই মানুষেরা কর দেয়—আর কি নতুন কর হতে পারে?”

প্রসেনজিৎ হাসলেন, “ভেবে দেখো—ভেবে দেখো—”

অরিন্দম একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা আর নতুন কর বসাবার দরকার কি?”

অধোরনাথ বললেন, “দরকার নানাবিধ। খরচে কুলোচ্ছে না সরকারের—”

“কি খরচ করতে হয় সরকারকে?”

“প্রথম দেশরক্ষা। তার জন্তু সৈন্যদলকে পুষতে হয়, না পুষলে

আমাদের শক্তি ক'দিন টিকবে? নীচুপাড়ার লোক আর বিদেশী রাষ্ট্ররা
 যাতে আমাদের বিপন্ন না করে তার জন্ত তা বারান্বকভাবে দরকার।
 দ্বিতীয়, বিদেশী রাজদূতদের থাওয়াতে হয়, তাছাড়া ভোজ-উৎসব আছে,
 সরকারী দপ্তর থেকে নেতৃত্ব আর যানবাহন নির্মাণ করতে হয়—কত
 কি আছে।”

প্রসেনজিৎ বললেন, “ভাবো—ভেবে দেখো—”

স্বকতা।

‘কি হল?’

বিনায়ক মাথা নাড়লেন “উঁহ—ভেবে পাচ্ছি না—”

প্রসেনজিৎ বললেন, “তাহলে শোন। আমরা শাসন করি বলেই
 দেশে শান্তি বজায় আছে, মানুষেরা বেঁচে আছে। অথচ এই যে বেঁচে
 থাকা বাপারটা—এর জন্য মানুষ কি কিছু স্বাধীন দেয়?”

অঘোরনাথ বললেন, “না তো।”

“তাহলে তাই করতে হবে—বেঁচে থাকার জন্ত শতকরা দশটাকা কর
 দেবে সবাই।”

দেবদত্ত ও অরিন্দম ছাড়া সবাই বলল “চমৎকার প্রস্তাব
 প্রধানমন্ত্রী—চমৎকার—”

প্রসেনজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন দেবদত্তের দিকে, প্রশ্ন
 করলেন “আর তোমরা কি বল?”

দেবদত্ত গম্ভীরভাবে তাকাল প্রসেনজিতের দিকে, তারপর বলল,
 “আমি আপনার প্রস্তাবকে সমর্থন করি না।”

মন্ত্ৰণা-কক্ষে যেন বাজ পড়ল।

চারদিকে প্রশ্ন উঠল, “কেন? কেন? কেন?”

দেবদত্ত বলল, “এই কর মানুষের বিরোধী।”

বিনায়ক প্রশ্ন করলেন, “মন্ত্ৰী—সে আবার কি?”

প্রসেনজিৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে দেবদত্তের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ

গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, “এসব আলোচনা নিরর্থক, তোমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখ—দেবদত্ত তরংকর অশুভ—”

সবাই মনোযোগ সহকারে দেবদত্তকে লক্ষ্য করতে লাগল।

অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। কি শুনেছে সে? এরা কারা?

দেবদত্ত আবার বলল, “না—এই করকে আমি সমর্থন করি না—”

প্রসেনজিৎ বললেন, “শুনছ? তোমরা এখনি চিকিৎসালয়ে চল—

দেবদত্ত অশুভ—দেবী হলে হয়ত বিপদ হয়ে যাবে—”

মহানন্দ সার দিলেন, “যথার্থ, এখনি চল—”

ছুপা পেছিয়ে দেবদত্ত বলল, “এই কব ধার্য হলে নীচুপাড়া ক্ষেপে যাবে—”

প্রসেনজিৎ কর্কশকণ্ঠে বললেন, “তুমি চিন্তা করো না—ডাঙা দিয়ে তাদের ক্ষেপামি আমরা দূর করব—”

দেবদত্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “না, তা করবেন না— তাতে কল মোটেই ভাল হবে না—”

প্রসেনজিৎ বাধা দিয়ে গর্জে উঠলেন, “অঘোরনাথ আর সমস্ত নষ্ট করো না, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল—”

দেবদত্ত মাথা নেড়ে বলল, “না—না—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে, পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সবাই তাকে ধরে ফেলল।

দেবদত্ত চীৎকার করে উঠল, “আমাকে ছেড়ে দিন— ছেড়ে দিন—”

কিন্তু কেউ শুনল না, দেবদত্তকে টেনে তারা বাইরে নিয়ে গেল।

“গাড়ী—শিগ্ৰুর একটা গাড়ী আনো—” রক্ষীদের হুকুম করলেন প্রসেনজিৎ।

রক্ষীরা ছুটে গেল।

গাড়ী এল।

“ওকে গাড়ীতে ওঠাও—”

দেবদত্তকে গাড়ীতে ওঠানো হল। সবাই চড়ল গাড়ীতে। বিন্দু
হতবাক অবিন্দম ও উঠল, ভাবল, দেখাই যাক না কি হয়?

দেবদত্ত চীৎকার করে বলতে লাগল, “না, আমি সমর্থন করি না—
না—”

প্রসেনজিৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “দেখেছ, দেবদত্তের রোগ
কতটা বেড়েছে? আহা-হা—”

চিকিৎসানন্দ বহির্কক্ষে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল।

অবিন্দম ভাবতে লাগল। চুপ করে থাকাটাই এখন বুদ্ধিমানের
কাজ, দু’একদিন এদের সব কিছুই দেখে নেবে সে? কিন্তু দেবদত্তের
ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মাতাল লোক হলেও তার
কতকগুলি গুণ আছে, যা উতুপাড়ায় আর কারো নেই। তাছাড়া আজ
কবের বিষয়ে সে যা বলল তা তো মিথ্যে নয়, তার প্রত্যেকটি কথাই
সত্য। তবে? তবু কেন যথীরা তাকে অস্বস্থ বলে সাব্যস্ত করছে!
বহুশ্রম ব্যাপার। চিকিৎসক সমস্ত পরীক্ষা করে সোজা ভেতরে নিয়ে
গেল তাকে, বলল যে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার না করলে রোগীর মাথা এবং
বুক দুই-ই খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাধিটা কি? আর কত দেরী
হবে? দু’ঘণ্টা সময় তো কেটে গেল।

সুস্থতা।

সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। কি হল? আর কত দেরী?
অস্ত্রোপচারে কি ভালো হল না?

আরো কিছুক্ষণ পরে শব্দ শোনা গেল।

খট্—খট্—খট্—

জুতোর শব্দ। সবাই উৎকর্ণ হয়ে তাকাল।

পদা সরিয়ে চিকিৎসক ভেতরে ঢুকল, রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে একটা চেয়ারে বসল।

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করলেন, “কি খবর, এ্যা?”

চিকিৎসক হেসে বলল, “কোন ভয় নেই, রোগী নিরাপদ অবস্থায় আছেন।”

“কি পেলেন অস্ত্রোপচার করে?”

চিকিৎসক সহাস্তে বলল, “একটা মাংসপিণ্ড—হৃদয়ের ঠিক নীচের দিকে। তা থেকে পাংলামত দুটি মাংসের শাখা মস্তিষ্কের দিকে মাথা তুলেছিল—আমরা তা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। মাংসপিণ্ডটির একটি বিশেষ নাম আছে—আপনারা তা নিশ্চয়ই জানেন?”

“তবু শুনি।”

“বিবেক।”

অরিন্দম দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল। এরা কারা? হাড়ের ভূর্ণে কি তাহলে এরাই থাকে? আর দেহদত্তের কি হবে? স্তম্ভ হওয়ার পর বোধ হয় সে আর সত্যি কথাই বলবে না। একি দাংঘাতিক কথা! বেলা কত? কোন প্রহর? এ কোন পানরাজো সে এসেছে? এখানে বিবেক একটা ব্যাপি, নীতি এক প্রকারের দুর্নীতি, মনুষ্য একটা অজ্ঞাত, অকিঞ্চিৎকর বস্তু! প্রহরী, সাবধান, শত্রুদের চক্রবাহে তুমি সম্পূর্ণ একা। প্রহরী, তুমি তোমার অসি নিকাষিত করো, প্রস্তুত থাকো, পৃথিবী থেকে পশুত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে—

অরিন্দম বাড়ী কিরে চূপ করে বসেছিল তার বহির্কক্ষে। সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু ঘরের আলো তখনো সে জ্বালেনি। অন্ধকারই ভালো লাগছে তার। সামনের খোলা জানালা দিয়ে উচুপাড়ার সৌধ-শীতলোকে দেখা যায়। পাহাড়ের সারির মত চারনিকে বিভূত হয়ে গেছে তা, নীচুপাড়ার কোটি কোটি মানুষের নগ্নতা, দারিদ্র্য আর দুর্বলতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেখা যায় আলোকিত কামরার টুকরো বাড়ীগুলোর জানালা দিয়ে। দেখা যায় বিহ্বলবাহী তারের সারি, অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝিকঝিকি ঝঞ্জশ তারার মেলা।

রাত হয়ে এল। নেমন্তন্ন আছে আজ মরুক-সঙ্গে। অরিন্দম ঠিক করেছিল যে দেবদত্তের সঙ্গে সে পাবে। কিন্তু দেবদত্ত আজ অহুস্থ, চিকিৎসালয়ে তাকে অস্থতঃ চার পাঁচদিন থাকতে হবে। তাহলে? একা, অপরিচিত পরিবেশে যাওয়ার মত হালুকা মন আর তার নেই। ঘুরে কিরে ললিতার মুখটা মনে পড়ছে। কানের কাছে সন্ধ্যের অক্লান্ত তেউয়ের মত ললিতার কথা, মুণ্ডনের কথা আর জনতার বহুনির্নোয় বারংবার ভেসে আসছে। একা, সে বড় একা।

ক্লিক করে একটা শব্দ হল আর মুহূর্তে ঘরের ভেতরকার শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল। অরিন্দম চমকে উঠল।

“কে?”

অল্পচক্চের হাসি শোনা গেল, অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল।

দয়জার হৃদয় পরদার সঙ্গে গা লাগিয়ে মিনাকী দাড়িয়ে আছে। ভুবনমোহিনী ইন্দ্রাণীর মত পোষাক পরেছে সে। অতি হৃদয় নীলাভ কার্পাসবস্ত্রের ওপর সোনালী জরির তারা বসানো। আঁটসাঁট ব্লাউজের বাবাকে ভেদ করে তার স্তনের উপরার্ধ ঘন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তাদের মধ্যবর্তী অনাবৃত উপত্যকা প্রদেশের ওপর ছলছে একছড়া মুক্তোর হার, দুই কানে দুটি রক্তপ্রবালের ফুল, হাতে স্বর্ণবলয়, আঙুলে হীরকানুযায়ী। স্বর্ভা-চূর্ণ দিয়ে সযত্ন-রঞ্জিত মুখ, রক্ত-রঞ্জিত গষ্ঠীধর, টানাটানা ভুঁকুর নীচে কাজল-আঁকা দুটি মদির চোখ—কামনা বেন মূর্তিমতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিনাক্ষী হাসল, লঘুকণ্ঠে বলল, “আমি। এসে দেখলাম যে অন্ধকারে বসে আছেন—একটু সঙ্কোচ হল ডাকতে—তাই”—

অরিন্দম হাসবার চেষ্টা করে বলল, “তা বেশ করেছেন—আম্বন, বহন”—

মিনাক্ষী আগের মতই হাসল, “বাক্সঃ, আপনি যে কায়দা-দুরূহ ভদ্রতা দেখাবার জন্য রীতিমত ব্যস্ত হ’য়ে উঠেছেন। আচ্ছা, কি ভাবছিলেন বলুন তো? কারো মুখ?” গলার স্বরটা একটু নানিয়ে সে একটা চোখের ভুরু তুলে প্রশ্ন করল, “কোন মিষ্টি মুখ? কোন মেয়ের মুখ?”

অরিন্দম মনে মনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, তবু সে শুককণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ, হয়ত কোন মেয়েরই মুখ”—

“সে কে?”

ভদ্রভাবে হাসল অরিন্দম, বলল; “সে কথা আপাততঃ আমার গুপ্তকথা হয়েই থাক্-মিনাক্ষী দেবী”—

মিনাক্ষীর ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝিকঝিকিয়ে উঠল, সে বলল, “বেশ, তাই থাক্। এবার উঠুন দেখি”—

“কোথায়?”

“বাঃ, আজ যে আপনার নেমন্তন্ন। দেবদত্তবাবু ভাস্কর্য তৈরি আমিই এলাম, আপনি তো আর চেনেন না।”

“ধন্যবাদ—আমিও তাই ভাবছিলাম যে বাই কি করে।”

“তবে চলুন।”

যাওয়াই থাক। দেখতে হবে এরা কি করে, এত ঐশ্বর্য কিভাবে ব্যয় করে। মনে পড়ে—দেবদত্ত একদিন বলেছিল যে নিরাপত্তার জন্তই এরা এত ঐশ্বর্য চায়। কিন্তু কিম্বের জন্ত নিরাপত্তা? তাদের ভোগ-বিলাস যাতে নিরবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে তার জন্তই নিরাপত্তা চাই। বেশ, দেখতে হবে এদের কাণ্ডকারখানা।

অরিন্দম বলল, “চলুন মিনাকী দেবী”—

বাইরে বেরিয়ে বাড়ীটার ভেতর দিকে মিনাকী একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করে বলল, “এত বড় বাড়ী—অথচ চাকর বাকর ছাড়া আর কাউকেই তো দেখছি না অরিন্দমবাবু”—

অরিন্দম হাসল, “আমার আর কেউ নেই।”

মিনাকী চোখ বড় করে রুহিম খেদের সঙ্গে বলল, “আহা, কথাটা তো ভাল নয়—তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন হাঙ্গল।”

এই প্রগল্ভা নারীকে কি উত্তর দেবে অরিন্দম, নিঃশব্দে সে শুধু আর একবার হাসল, জবাব দিল না।

মিনাকী'র গাড়ী অপেক্ষা করছিল, তাতেই চড়ল ঢা'জনে। চালক গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ীর ভেতরে মিনাকী অরিন্দমের কাছে সরে এল, গা ঘেঁষে বসল। অরিন্দম মিনাকীর হাত আর উরুর পার্শ্বদেশের কোমল স্পর্শে কঁপে উঠল, সরে যেতে গিয়ে দেখল যে আর সরবার জায়গা নেই। মিনাকীর দেহনিঃসৃত উত্তেজক স্রাবটি তার চেতনাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে তুলল।

মিনাকী কপট রোমের সঙ্গে বলল, “আপান ভারী নিষ্ঠুর অরিন্দমবাবু।”

“কেন?” অরিন্দম কথাটার কোন হেতু খুঁজে পেল না।

“কেন?” মিনাকী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাসল, “তা নয়ত কি? আমার বেগভূষা দেখে আজ সবাই কত প্রশংসা করেছে—কিন্তু কৈ, আপনি তো

বিছু বললেন না? সেই মিষ্টি মুখের স্বপ্নে কি এখনো বিভোর হয়ে
আছেন?”

অরিন্দম একবার তাকাল মিনাক্ষীর দিকে, মুহূর্তে বসে বলল, “তা
আছি, সব সময়েই থাকি—কিন্তু আপনার মুখটিও কম মিষ্টি নয় মিনাক্ষী
দেবী। সত্যি, আপনার বেশভূষা এবং রূপকে আমার প্রশংসা করা
উচিত”—

“কেন? আমি বললাম বলে?”

“না, আপনি রূপসী বলে, আপনার কচি আছে বলে।”

“দেখবেন, আমার ভক্তদের প্রতিবাদকে আপনি ছাপিয়ে না যান।”

“আপনার ভক্তদের সংখ্যা কত?”

“তার অসংখ্য।”

“তারা কি বলেন?”

“বলেন অনেক কিছু। আমি নাকি চাঁদ, তারা ফুল, ঝরণা—সে
একগাঙ্গা বিশেষণ। মিনাক্ষীকে দেখে তারা মীনকেতনের শায়কে বিক
 হয়, তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তারা আমরণ ক্রীতদাসত্ব ঘোষণা
 করে, তাকে বিয়ে করতে চায়।”

“বিয়ে করবেন না আপনি?”

“মনের মত পুরুষ না পেলো শেকল পরে লাভ কি?”

“তা পান নি?”

মিনাক্ষী হাসল, একটু ঝুঁকে বলল, “মনে হচ্ছে পেয়েছি—হয়ত
এবার আমার ভক্তদের মত আমিই হাঁটু গেড়ে বসব তার কাছে।”

অরিন্দম মুখটা একটু পেছনে সরিয়ে নিল, বলল, “তিনি কে?”

মিনাক্ষী গলার সুরটাকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে স্থিরদৃষ্টি মেলে মহাশয়ে
বলল, “সে কথা আপাততঃ আমার গুপ্তকথা হয়েছে থাক অরিন্দমবাবু—
সময় হলেই বলব।”

অরিন্দমও হাসল, কিন্তু নির্দারুণ অবস্থিতে তার সর্বদেহ সঙ্কুচিত

হয়ে উঠতে লাগল। ব্যাপার কি, কি বলল মিনাকী? তার নির্ভর
কথার অর্থ খুব দুর্বোধ্য নয়—তাই কি? অরিন্দম, সাবধান। নিন্তা,
তোনার প্রেমই আমার রক্ষা-কবচ।

গাড়ীটা থামল।

মিনাকী বলল, “আমরা পৌছে গেছি।”

গাড়ী থেকে নামল তারা। অরিন্দম দেখল যে একটা প্রশস্ত উগানের
মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। উগানের চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরে
একটা মস্ত বড় তেতলা অট্টালিকা। বড় বড় থাম, সূচিক্রিত মৃৎ
প্রস্তরকলকে ঢাকা মেঝে আর চোখ-ধাঁধানো আলো। সুবেশ নরনারীর
দল উগানের ভেতর, অট্টালিকার কামরাগুলোত গল্পগুজব করছে। হাসি,
কোলাহল, বাজনার শব্দ।

অট্টালিকার বারান্দায় উঠল তারা আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে
গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। টং টং—টং টং—টং টং—

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “ও কিসের শব্দ?”

“মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।”

“ভেতরে মন্দির আছে নাকি? কোন্ দেবতার মন্দির?”

“উচুপাড়ার উপাস্ত্র দেবতা—অর্ধদেব।”

“ওঃ”—

“চলুন দেখবেন।”

মিনাকীকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল অরিন্দম। ভেতরে একটা
কাঁকা, নিরাবরণ জায়গার মাঝখানে একটা স্বর্ণচূড়া-শোভিত মন্দির।
মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল তারা। বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম
হয়েছে সেখানে—সবাই মধুকর-সম্ভের সভ্য বা নিমন্ত্রিত। মন্দিরের

ভেতরে অসংখ্য শক্তিশালী বিজুলী বাতি জ্বলছে। বিগ্রহের সামনে নানা ভোগ ও অর্ঘ্যের সমারোহ।

অরিন্দম বিগ্রহ দর্শন করল। স্বর্ণ-নির্মিত বিরাটকায় নগ্নদেহ মূর্তি—কিন্তু তা না পশু, না মাতৃষের মত। ছোট্ট একটা মাথা তার, অক্ষিগোলক-হীন চোখের অন্ধ দৃষ্টি মেলে ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মাথার অস্থপাতে তার উদর ও লিঙ্গটি বহুগুণ বড়। তার হাত ও পাগুলিও ক্ষুদ্রাকার কিন্তু নখগুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার।

ভক্তবৃন্দের দিকে তাকাল সে। বহু লোককে সে চিনতে পারল। উচুপাড়ার সেরা লম্পট, প্রতারক, শোষণকারী ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও গণিকার দল সেখানে গদগদকণ্ঠে প্রার্থনা করছে, প্রণাম করছে, স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করছে দেবদক্ষিণা হিসেবে। অর্দময় এক মোটা পুরোহিত একটা বড় ধূতুচিতে আগুণ জ্বালিয়ে তার আরতি করছে আর অপর একজন পুরোহিত মন্ত্র বড় একটা কাঁসার ঘণ্টা বাজাচ্ছে—*ঢংঢং—ঢংঢং—ঢং ঢং*—*মিনাক্ষী ভক্তিনয়কণ্ঠে বলল, “উনিই দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ”*—

জানু পেতে প্রণাম করল মিনাক্ষী। অরিন্দম এদিক এদিক তাকিয়ে পরম ঘৃণাভরে একবার দু’হাত ধুক্ক করল, মনে মনে বলল, ই্যা, তোমার বীভৎস শক্তিকে আমি স্বীকার করছি যে অর্ধদেব কিন্তু প্রতিজ্ঞাও করছি যে তোমাকে আমি ধ্বংস করব, কল্যাণের দরিদ্র দেবতাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করব তোমার আসনে। উচুপাড়ার অন্ধ দেবতা—সাবধান।

মিনাক্ষী উঠে দাঁড়াল, “এবার হলঘরে চলুন।”

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে। একটা চওড়া অলিন্দপথ। দু’পাশে ঘরের সারি।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “এই ঘরগুলো কিসের?”

মিনাক্ষী কটাক্ষ বর্ষণ করে বলল, “প্রেমিক যুগলদের গুহন-কন্দ, ওপরেও অর্ধদেবের ঘর আছে।”

অরিন্দম অর্ধদেবের রূপের ব্যাখ্যা যেন এতক্ষণে খুঁজে পেল।

হলঘরের দরজায় গিয়ে অলিন্দটা ঘিমুখী হয়ে আবার ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে। হলঘরের ভেতরে ঢুকল হুজনে।

মস্ত বড় হলঘরটার ছাদ বড় বিচিত্র ধরণের। একপ্রান্তে তা নীচু, বড় জোর হাত বারো, ক্রমে তা উঁচু হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে অপর প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। হলঘরের সমস্ত আলো ছাদের ভেতরে গ্রবিত, আকাশের গায়ে লাগানো টান আর নক্ষত্রদের মত। যে প্রান্তদেশে নীচু—সেখানে একটা দু'হাত উঁচু গোলাকার বেদীর ওপর একদল বাগ্গ বহুবিদ। বেহালা, পিয়ানো, বাঁশী, সেতার, বীণা, তব্লা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাগ্গবহু সেখানে বাজাচ্ছে যত্নীরা। তাদের প্রত্যেকের পোষাক একই রকমের—শ্বেতবর্ণ ও বহুমূল্য। ঘরের মেঝে কালো পাথরে মোড়া—তা এত মসৃণ যে দেখে কৃষ্ণবর্ণ নর্পণের কথা মনে পড়ে। বিপরীত প্রান্তে অর্ধ-চন্দ্রাকারে একটি টেবিলের দু'পাশে চেয়ার। অন্ততঃ দুশোজন লোক সেখানে বসতে পারে। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য কাপড় বিছানো, তার ওপর আপেল, কমলা, কলা, নানাবকমের ফল ও সারিবদ্ধ ভাবে পাত্র সাজানো আছে। ঘরের অপর দুই অর্ধচন্দ্রাকার প্রান্ত জুড়ে এক সারি করে চেয়ার ও ছোট ছোট টেবিল। সেখানে স্নানজিত নর-নারীরা বসে হাসছে, শাড়ী গয়না পোষাক, নাটক ও চলচ্চিত্র, কেছা ও কুৎসার গল্প করছে, চা এবং সবৎ পান করছে, কেউ কেউ মগ্গপানও করছে। চারদিকে অসংখ্য জানালার বাইরে থেকে কাকনলতার শাখা-প্রশাখা প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছসমেত ঘরের ভেতরটা উঁকি মেয়ে দেখার চেষ্টা করছে। হলঘরের দে'য়ালের গায়ে একসাৎ কঙ্কালের নৃত্য, নরনারীর রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গী ও বিভিন্ন ভাবে মাহুকে হত্যা করার বীভৎস ছবিগুলো অঙ্কিত আছে। দেখে অরিন্দমের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। পশুদের ভীড়ে কেন এসেছে সে? কেন?

তবু রইল সে, সহ্য করল, নিঃশব্দে সব কিছু দেখতে লাগল।

মিনাকী মুচকি হেসে বলল, “প্রাচীরগাত্রে ছবিগুলো দেখছেন? আজবনগরের সেরা শিল্পী উৎপল কুমারের আঁকা। ভালো না?”

অরিন্দম মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, “এমন ছবি আর দেখিনি।”

হলঘরের লোকদের দিকে তাকাল অরিন্দম। সেখানে সে অজ্ঞাত ভীড়ের মধ্যে আধোরনাথ প্রসেনজি ও বিনায়ককে দেখতে পেল। একদল যুবতীর মধ্যে তারা হাসাহাসি করছিলেন।

মিনাকী চারদিকে একবার তাকিয়ে অরিন্দমের হাত ধরল। তাকে গোলাকার বেদীটার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে বাছনা ধামিয়ে দিল।

গলা চড়িয়ে সে ঘোষণা করল, “শুভ্রন, আজ আমাদের সঙ্গে একজন মাননীয় অতিথি পদার্পন করেছেন—ইনি—শ্রীযুক্ত অরিন্দম, আজবনগরের নতুন মাননীয় যন্ত্রীই সেই অতিথি। আপনারা জানেন যে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত অল্প বয়সে তিনি এত সম্মানের অধিকারী হলেন—এমন একজন যোগ্য অতিথিকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ নিজেকে খুশি মনে করছি।”

সহর্ষ কবতালি ধ্বনিতে হলঘর মুখর হয়ে উঠল।

প্রসেনজি এগিয়ে এসে অরিন্দমকে একপাশে টেনে নিয়ে সতাস্তে বললেন, “নাও, এবার জীবনটাকে উপভোগ কর—শক্তির স্বাদ পাও—”

অরিন্দম হাসল। কিন্তু প্রসেনজির কথার অর্থ কি?

মিনাকী ঘোষণা করল, “এবার সবাই খাবারের টেবিলে চলুন—আমাদের মাননীয় অতিথির সম্মানার্থে এবার প্রীতি-ভোজ হবে—”

সবাই গিয়ে খাবারের টেবিলে বসল। অরিন্দমকে নাক্ষত্রিক বসিঘে তার পাশে বসল মিনাকী।

নেপথ্যে একটা ঘণ্টা বাজল, সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ পুনর্জিত ভূত্যেরা খাবার বয়ে আনতে লাগল।

কতরকমের খাবার। পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট, সিদ্ধ মাংস

মাংসের ঝোল, ঝলসানো মাংস, কাবাব, মাছ, বসগোল্লা, সন্দেশ, পান্ডুরা
ক্ষীরের সন্দেশ, রাবড়ি, সব, দই, পায়ের। আরো কত নাম-না-
জানা খাবার। আর শশকে খেতে লাগল সবাই, চিবোতে লাগল,
গিলতে লাগল, আবেশে চোখ তাদের বুজে এল, ঠোঁটের কোনে
পরিতৃপ্তির রেখা হাশুময় হয়ে উঠল। আর শুদিকে যত্নীরা আবার
বাজাতে শুরু করল। উত্তেজক সুর ও তাল।

অরিন্দম বিষম খেল। নীচুপাড়ার কোটি কোটি মাল্লবের রক্ত আর
মাংস বেন খাচ্ছে সবাই, খাচ্ছে সে।

“কি হল, কি হল?”

“আহা—কি হল?”

মিনাক্ষী গায়ের উপর ঢলে পড়ে প্রশ্ন করল, “কি হল আপনার?
এখনো সেই মিষ্টি মুখের কথা ভাবছেন?”

অরিন্দম হাহল, বলল, “না। এখন দুটি মিষ্টি মুখের কথা ভাবতে
গিয়ে ধাকা খেলাম।”

মিনাক্ষী ঝকঝকে দাঁত মেলে বলল, “ইস্, আপনি যে দুটো দেখতে
পাচ্ছি”—

আবার চলল সেই গোগ্রাসে খাওয়ার পাল্লা, কলহাস্ত আর
কলগুঞ্জন। চলল সেই উদ্দাম, উত্তেজক বাজনা। আর অরিন্দম ভাবতে
লাগল। অর্থদেবের মূর্তির রূপটা যেন চেনা যাচ্ছে। কিঙ্ক এ কোথায়
এসেছে সে? এই কি সেই হাড়ের ভুগ? রাত কত? কোন প্রহর?
এতো সেই মনিময় কক্ষ নয়। সেই বীণকাণে বীণার তারে তো এখানে
নটমল্লার মুখর হয়ে ওঠেনি। তবে? তবে?

মন্তবড় কয়েকটা রূপোর আসবাব নিয়ে এল ভূত্যেরা, প্রত্যেকের
পানপাত্রে তারা একপ্রকার তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে গেল। সবাই তা
পিপাসার্তের মত সাগ্রহে পান করল। অরিন্দম স্পর্শ করল না।

মিনাক্ষী প্রশ্ন করল, “আপনি খেলেন না?”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “না। এটা কি বলুন তো?”

“কাকন-মদিরা—সোনা থেকে যে রস নির্গত হয় তা দিয়ে তৈরী—
বহুমূল্য ত্রিনিচ আর শক্তিবর্দ্ধক। খান”—

“না”—

সকলে তাকাল অরিন্দমের দিকে। মুহূর্তে চীৎকার শুরু করল সবাই।

“খান”—

“খান”—

“মস্ত্রীবর, পান করুন”—

“পান করুন”—

মিনাক্ষী দ্রুতকণ্ঠে বলল, “শিগ গীর খেয়ে ফেলুন, কাকন-মদিরা পান
না করলে অপমানিত হবেন সবাই, শিগ গীর, সবাই উত্তেজিত হয়ে
পড়েছে”—

“নেশা হবে যে। আমি তো নেশা করি না।”

“কে বললে নেশা হবে? মদুর চেয়েও মিষ্টি ত্রিনিচ—অমৃতের মত।”

অরিন্দম তাকাল চারদিকে। সবাই তার দিকে কুটিল দৃষ্টি মেলে
তাকিয়ে আছে। তারা যেন তাকে নন্দেহ করছে। পান না করলে
হয়ত এখনি একটা গুগোল শুরু হয়ে যাবে। না, তা উচিত হবে না।
অরিন্দম পাত্রটা তুলে মুখে লাগাল। তরল, রক্তবর্ণ পানীয়, সত্যি ভারী
সুস্বাদ। সমস্তটা পান করল সে।

মিনাক্ষী তার হাতের উপর হাত রেখে মুহূর্তে বলল, “আপনি যক্ষী
ছেলে অরিন্দমবাবু”—

অরিন্দম জবাব দিল না। রক্তবর্ণ এই তরল পানীয়ের সঙ্গে কি
কারো রক্ত মেশানো আছে?

অধোরনাদ উঠে দাঁড়ালেন, গলা চড়িয়ে বললেন, “আমাদের নৃতন
মস্ত্রী দীর্ঘজীবী হোন”—

সবাই প্রতিধ্বনি তুলল, “নতুন মস্ত্রী দীর্ঘজীবী হোন”—

অধোরনাথ বললেন, “তাহলে এবার নাচগান আর কুঁড়ি আর হোক”—

সবাই প্রতিধ্বনি তুলল, “কুঁড়ি হোক”—

বাজনার স্বর বদলে গেল, তাল দ্রুত হয়ে উঠল, হলঘরের আলোর স্বঃ অদৃশ্য কোন হাতের স্পর্শে নীলাভ হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মাঝখান থেকে একটি ঘোল মতেমতে বছরের স্নানরী যুবতী দৌড়ে হলঘরের মঞ্চের মেঝের ওপর গেল আর তাকে অত্মসমর্পণ করল একটি কুঁড়ি বাইশ বছরের স্নানরী যুবক। যুবতীকে ধরতে গেল সে, যুবতী লীলাচ্ছলে সরে গেল, ছুটে পালাল আর একদিকে। বাজনার দ্রুততালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুবকটি আবার ছুটে গেল যুবতীর দিকে। এঁকেবেঁকে, বৃত্তাকারে পালাতে লাগল যুবতী কিন্তু হঠাৎ যুবকটি একবার গতিবেগ বাড়িয়ে যুবতীকে ধরে ফেলল। যুবতী হাত ও চোখের ভঙ্গী দিয়ে যুবককে সদয় হতে অত্মরোধ জানাল। যুবক শুনল না, সে তার শাড়ী ও ব্লাউজ ধরে টান দিল। শাড়ী ও ব্লাউজ মেঝেতে পড়ে গেল। যুবতীর দেহে শুধু অস্বাভাবিক ও বক্ষবাস। অস্বাভাবিক শুভ্র দেহকান্তি দেখে হলঘরের পুরুষেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। যুবতী ক্ষণকালের জন্ত মাথা নীচু করল, যুবক তার চারদিকে বৃত্তাকারে একবার ঘুরে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। হঠাৎ যুবতী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, সেও এবার যুবকের পোষাক ধরে টান দিল। শুধু অস্বাভাবিক-পরিহিত যুবকের পেশল দেহ-সৌন্দর্য দেখে হলঘরের মেয়েরা দু’হাতে মুখ ঢাকার ভান করে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আবার তাকে দেখতে লাগল। বাজনা আরো উদ্দাম হয়ে উঠল, যুগল ধ্বনিত হল। কামোদ্দীপিত নৃত্য শুরু করল যুবক যুবতী।

মিনাক্ষী অরিন্দমের গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে বলল, “চমৎকার—তাই না?” তার গলাটা যেন জড়িত, কল্পিত মনে হল অরিন্দমের।

মাথা নেড়ে অরিন্দম কিছু বলতে গিয়ে কথা বলতে পারল না।

সবিস্ময়ে সে অসুস্থ করল যে তার জিভটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে, ক্রমশঃ তার মাথাটা বিম্বিম্ব করছে, তার সমস্ত স্বায়ত্তে যেন একটা অদৃশ্য কস্পন খেলে যাচ্ছে। কি হল তার? সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পায়ল না। তার সমগ্র চেতনাতে যেন একটা ঝিল্লীরব শুক হয়ে গেল, তার পেছটা যেন একটা বিরাট শূন্যতার মাঝখান দিয়ে সবেগে নীচে নেমে যাচ্ছে। একি হল তার? নেণা? মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সে এই অবস্থাস্থরকে যেন বেড়ে ফেলার চেষ্টা করল কিন্তু কমল না, ক্রমেই তার নেণা বাড়তে লাগল। তার চোখের সামনে যেন মাঝে মাঝে একটা হৃদয়, স্বচ্ছ যবনিকা দুলতে লাগল। ক্রমেই তার চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল।

মিনাকীর গলা শোনা গেল কানের পাশে, “অবিন্দম বাবু, আপনার কেমন লাগছে?”

“উ?”

“ঝিমিয়ে পড়লেন যে?” মিনাকীর ডাচোখে কৌতুক।

মাথা নেড়ে নেড়ে হাসল অবিন্দম, বলল, “উও”—

প্রিমিত, আর্জুনের দৃষ্টি মেলেন সে নামনের দিকে তাকাল। যদ্বীরা পাগলের মত বাজছে, মূলধ্বনিবাদে মাঝা ঘরটা যেন ধরধর করে কাঁপছে। সেই নৃত্যরত যুবক যুবতীর দেহলাস্র, চোখের চাহনি, তাদের আলিঙ্গনের ভঙ্গী আরো উদ্দাম ও অগ্নীল হয়ে উঠেছে। আর কি আশ্চর্য ঐ যুবতী নর্তকীর দেহকাঙ্ক্ষা! অতি জ্বীনভাবে মনে পড়ল তার। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই মনিনীপ্তি? নটমল্লারের মন নয়, বাহারের আলাপ নয়, দেবী ভেনাসের মত মত স্বন্দরী সেও নীলনয়না নর্তকী নয়, সেই স্বদর্শন নর্তক নয়, সেই আনন্দময় পুতুলেরা নয়। এরা কারা, কারা? বহুব্র ব থেকে কে যেন ডাকছে! কে? কি বলছে? না, আর শোনা যাচ্ছে না, আর মনে পড়ছে না। কে তার হাত ধরল? তার হাতটা যেন কার উত্তপ্ত স্পর্শে পুড়ে যাচ্ছে! পাশের দিকে তাকাল

সে। মিনাকী তার দিকে তাকিয়ে হাসল। মিনাকীর ঠোঁট দুটো
কী লাল?

হঠাৎ সেই নীল আলো যেন জ্বলি উঠে গেল। যেন অসম্ভাব্য
পৰবর্তী প্রতিপদের চম্ভালোক। ক্ষীণ, রহস্যময়। ঘরের সবাই এবার
নাচতে শুরু করল। প্রত্যেকের পদক্ষেপ অশব্দত, প্রত্যেকের পরিধেয়
শিথিল হয়ে পড়েছে, মেঝেতে লুটোছে। নৃত্যের গতিবেগ বাড়াল।
পুরুষেরা সঙ্গিনীদের অদলবদল করল। প্রত্যেকেই পরস্পর, পর্ষদ
বোনের সঙ্গে নাচতে শুরু করল। অরিন্দম চমকে উঠল, সর্পনির্মোকে
মত মঞ্চ অথচ উত্তম ছুটি হাত দিয়ে তাকে বেঁটন করে আকর্ষণ
করছে মিনাকী।

“নাচুন অরিন্দমবাবু”—

“আমি—জা—নি—না”—

“না জানলেও এখানে নাচতে পারবেন”—

অরিন্দম হাসল, মিনাকীর আকর্ষণে পা বাড়াল। আর ঠিক সেই
সময়েই ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

“একি হোল?” অরিন্দম ভড়িতকণ্ঠে বলল, “দেখতে পাচ্ছি না যে?”

মিনাকী তার কানে কানে বলল, “এটা সাময়িক। একটু বাদেই
আবার আলো জ্বলবে, আবার নিভবে। প্রত্যেকবারে অন্ধকারে সঙ্গী
সঙ্গিনীদের বদলে নিয়ে এই নাচের খেলা চলবে। কিন্তু অরিন্দম—”

“উ?”

মিনাকী অরিন্দমের গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে ল, বলল, “আমি
বদলাতে চাই না তোমাকে—”

“কেন?” মিনাকীর দেহ কি কোমল! তার দেহের উত্তাপ যেন
অরিন্দমের দেহেও সঞ্চারিত হচ্ছে।

“কিন্তু?”

“ভনব।” নারীদেহের স্পর্শ আর গন্ধ কি বিচিত্র! কে? কার মুখটা ভেসে গেল? না, চিনি না, জানি না।

“তবে ওপরের একটা ঘরে চল।”

“চল।”

ঘর থেকে বেরোবার জন্য সতর্পণে এগোল দুজনে। ঘরের মধ্যে তখন খিলখিল হাসি আর নানাবক্যের শব্দ ও পদক্ষেপ। আর আশ্চর্য এই বাজনা, নারীদেহের মতই উত্তেজক।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল দুজনে। সামনেই একটা ঘর—তার দরজাটা কারাগৃহের লোহার শিকওয়ালা দরজার মত। সেই দরজা দিয়ে প্রায় তিরিশ জন হুন্দরী যুবতীকে দেখা গেল। তাদের বেশভূষা ছিন্ন, মলিন।

“ওরা কারা?”

মিনাকী হাসল, “নতুনদের স্বাদ পাবার জন্য অনেকে ফুলে, টাকা দিয়ে কিনে, জোর করে ধরে, টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এদের নিয়ে আসে। শেষ রাতে এরা ঐ সব কামরাঙুলোতে অনেকেরই শব্দ্যাসদ্বিনী হবে। এই যে আমাদের ঘর—”

ঘরের ভেতর প্রবেশ করল তারা।

মিনাকী বলল, “অরিন্দম, দরজা বন্ধ করে দিলাম”—

অরিন্দমের চেতনা লোপ পেয়ে গেছে, জড়িতকণ্ঠে সে হেসে বলল,
“দাও—দাও”—

দরজা বন্ধ করে অরিন্দমের পাশে এসে দাঁড়াল মিনাকী।

অরিন্দম টলতে টলতে চারদিকে তাকাল। কোণে থেকে বারো চোদ্দ হাত উঁচুতে ছাদটা পঁচিশ গজ সমান্তরাল ভাবে গিয়ে হঠাৎ অর্ধচন্দ্রাকারে ওপরের দিকে উঠে গেছে আর ঠিক সেইখানের মেঝে থেকে দশধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠে একটা মঞ্চাকার জায়গায় থেমেছে। সেই মঞ্চের দুপাশে কারুকার্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভ, পেছনদিকে

লতামণ্ডিত দেয়াল ও জানালা আর মাঝখানে একটি পালক। ছদ্ম-
ফেনিভ শয্যার পাশে একটা ছোট টেবিলে রাখা আছে একগুচ্ছ
বস্ত্রপদ্ম। ঘরের মাঝখানে কয়েকটা দামী আগবাবপত্র আর দে'য়ালের
গায়ে সেই হলঘরের মতই ছবি আঁকা।

“অরিন্দম—”

“ঊ?” নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানে অদ্ভুত লাগে। ওকি?
মিনাক্ষীর চোখ দুটোতে ও কিসের নিমগ্নতা? আমি কোথায়?

“ভুলবে?” মিনাক্ষীর কণ্ঠস্বর যেন তার নরম হাতের ছোঁয়াচের মত।

“বল—বল—” বেশ লাগছে, মাথার ভেতর যেন ফুরফুর করছে!
আর মিনাক্ষীর হাসি কি সুন্দর!

মিনাক্ষী এগোতে লাগলো সেই মঞ্চটার দিকে, যেতে যেতে তার
শাড়ীর আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর। ওপরে উঠে সেই পালকের
উপর সে ললিত ভঙ্গীতে বসে মুহুমন্দ হাসতে লাগল।

“বল—বল—” সমস্ত দেহেই এ কিসের আকৃতি, কণ্ঠে তার এ
কোন পিপাসা?

মিনাক্ষী বলল, “তুমিই আমার মনের মাহুষ অরিন্দম—ঊঃ, বড়
পরম—” বলেই সে তার জামার বোতাম খুলতে শুরু করল।

অরিন্দমের শরীরটা যেন শূণ্যতার ভেতর দিয়ে পড়ছে, পড়ছে,
পড়ছে। মিনাক্ষীর বক্তৃতা কি শুভ্র!

“মীনাঙ্কী—”

“এসো”—

“তুমি সুন্দর”—

“এসো”—

পা টলে, তবু এগোল অরিন্দম। চোখের সামনে সব কিছু যেন
ঝাপসা, চেতনা যেন কোন অতল সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। শুধু একটিমাত্র
অস্বভূতি—সে পুরুষ। শুধু একটি মাত্র কামনা—মিনাক্ষীকে সে বুকে

নিখে গিবে ফেলবে। হুঁচোখ জ্বলতে থাকে তার, ঠোঁটটা তকিয়ে
আসে, একটা উত্তাল তরঙ্গ দেহময় গড়াতে থাকে।

সিঁড়ির ওপর পা দিল সে।

“মিনাকী”—

“এসো”—

“তোমার ঠোঁট দুটো কি প্রবালের?”

“এসো”—

হঠাৎ টাল সামলাতে পারল না অরিন্দম, ওপরের ধাপ থেকে সে
পা পিচলে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

“অরিন্দম!”

অরিন্দম জ্ঞান হারাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য। জ্ঞান ফিরে আসতে
উঠে বসল সে। সারা দেহে তার অসহ্য বেদনা। জিভে একটা লবণাক্ত
স্বাদ পেয়ে সে ললাটে হাত দিল। কেটে গেছে দেখানটা, রক্ত বেরোচ্ছে।
এ কোথায় এসেছে? কোথায়? মনে পড়ল। সব কিছু মনে পড়ল। সে
ঘুরে বসল। সামনে মিনাকী।

“খুব লেগেছে অরিন্দম?”

অরিন্দম জবাব দিল না। মিনাকীর অর্ধ নগ্ন দেহ।

“চল, বিছানায় শুয়ে একটু জিরোও”—মিনাকীর হাতটা সাপের মত
অরিন্দমের কণ্ঠবেষ্টন করল।

“না”—মিনাকীর হাতটা সরে সরে ছাড়িয়ে দিল অরিন্দম।

মনে পড়েছে। কুয়াশা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, পায়ের জ্বলায় শরৎ
পৃথিবী ফিরে এসেছে। কে ডাকছে? বুঝেছি। শুনেছি গ্রহণী, আমি
জেগে আছি। ললিতা, আমি তোমার।

দরজার নিকে পা বাড়াল অরিন্দম। এখনো নেশার রেশ আছে।
খন্তবাদ হে সিঁড়ি, তুমি আমার চৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছে।

“অরিন্দম—কোথায় যাচ্ছ?”

“বাড়ী।”

“কেন?”

“আমার ভাল লাগছে না, আমার শরীর খারাপ, আমার খুশী।”

“না”—

ছুটে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল মিনাকী, নিজের দেহকে অনাবৃত করে দিয়ে বলল, “না, তুমি যেতে পারবে না”—

অবিন্দম তাকে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে।

তার চোখের অস্বাভাবিক চ্যাপ্তি দেখে মিনাকী হুঁহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়াল। ঘৃণা, অবিন্দমের চোখে ঘৃণা।

দরজাটা খুলল অবিন্দম। তাড়াতাড়ি। তারপর সে ছুটে পালাল নিড়ি বেয়ে। কোনদিকে তাকাল না সে, উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে বেরোল, ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল।

রাগা থেকে একটা গাড়ী ভাড়া করে সে সোজা বাড়ী গেল। কি কেন মনে পড়ল তার। সোজা ঘরে গিয়ে সে আলো জ্বালল, দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ললিতার কথা ঠিক। তার গোখে কালো ছায়া। শক্তি আর ঐশ্ব্যের হিংস্রতা তার মুখকে অঙ্ককার করে তুলেছে। রাজহস্ত চাঁদের মত অঙ্ককার হয়ে গেছে তার আশ্রয় মুখ। সে ভয় পেল, বাতি নিভিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে অঙ্ককারেই সে বসে রইল। রাত গভীর হল, তবু তার ঘুম এল না, কাকন মন্দিরার পীড়াদায়ক প্রতিক্রিয়াটা তখনো তার দেহে, মস্তিষ্কে ঝিমঝিম করতে লাগল। উচুপাড়ার ঘরে ঘরে তখনো যন্ততার আলো জ্বলছে। বহুব্র থেকে বিচিত্রপুরের অল্প কোন মহরগামী একটা লৌহশব্দে তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি ভেসে এল। একা। ললিতা পরিত্যাগ করেছে। মুহূর্ত তাকে ঘৃণা করে, নীচুপাড়ার জনতা তাকে শত্রু বলে মনে করে। হ্যাঁ, তাদের কথায় সত্যতা আছে। শক্তি মানুষকে রক্ত মাংসের দাস করে, শক্তি মানুষের মনে বিকারের সৃষ্টি করে। না, আর দেবী কথা যায় না, আর

ধেরী করলে সে হয়ত আজকের চেয়েও মারাত্মক বিপদে পড়বে। আজ সে দৈবক্রমে জান কিরে পেয়েছে, কিছ অজ্ঞাদিন? ললিতা তুমি কোথায়? সমস্ত ইঞ্জিয়ার একটি আকুল প্রার্থনা, তার আত্মার একটি তৃষ্ণা—ললিতা। সে একা, তার আত্মা বিপন্ন—কালই সে তার আত্মার আত্মার কাছে যাবে। কিছু বলবে না সে, কিছু চাইবে না, শুধু দূর থেকে দেখবে একবার। দেখতেই হবে তাকে, পাহাড়ের চূড়ো থেকে তাকে যে এবার লাক দিতেই হবে। প্রহরী, তোমার ডাক যেন না খানে।

রাতটা যেন আর শেষ হয় না।

সারারাত বসে বসে কাটাল অধিনন্দন। সারারাত ধরে অপেক্ষা করল ভোরের জন্ম। ভোর হোক, ভোর হোক, সে আর সহ্য করতে পারছে না। মাতৃষের জীবনে এ কী অদ্ভুত ব্যাপার এই ভালবাসা! একটি নারীর মুখ কিভাবে দুঃখ করে পুরুষকে, কিভাবে নিরুদ্বেগ করে তার সমস্ত কর্ম! না, সে তার উর্ধে। তবু সে সে মাতৃষ, রক্ত আর মাংসের ভেতর তার আত্মার পিপাসা। ললিতা, তুমি প্রসন্ন হও।

ভোর হল। রাতের কুহকজাল রক্তবর্ণ সূর্যদেবের রথের চাকার ধুলোর মত উড়ে গেল। আজবনগরের জীবনযাত্রা নতুন করে শুরু হল।

ললিতাকে দেখতে হবে একবার।

কিন্তু নীচুপাড়ার জনতা যদি আজও তাকে চিনতে পারে।

অত্যন্ত সাধারণ পোষাক পরে অধিকম বেবোল। সফল, এরিক শক্তিক তাকিয়ে। প্রসেনজিতের কথা মনে পড়ল তার। মঙ্গীলের নীচুপাড়ায় যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং তাকে সাবধানে যেতে হবে। শুশ্রূষ এবং নীচুপাড়ার জনতা—সবার দৃষ্টিকে এড়িয়ে।

নির্জন অলিগলি দিয়ে চলতে শুরু করল সে।

মাথার ওপরে সূর্যদেবের আলো। শীত শেষ হয়েছে, আজ থেকে

বসন্ত হুক হল, তবু বাতাসে শীতের আমেজ আছে। আলোর মধ্যে আছে উত্তেজক উত্তাপ। আর আকাশ কি ঘন-নীল!

একটা গলি শেষ হল একটা বড় রাস্তায়। সেটা অতিক্রম করে আর একটা গলিতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে হবে। তা নইলে কেউ চিনে ফেলতে পারে।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে গলির মুখে থমকে দাঁড়াল সে। বড় রাস্তার ডানদিক থেকে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোকের একটা বিগাট জনতা।

জনতার ঘোষণা ভেসে এল তার কানে, “আমাদের মুক্তি দাও, মাহুষ হতে দাও”—

“আমাদের মাহুষ হতে দাও”—

“মাহুষ হতে দাও”—

সবাক্‌ কেঁপে উঠল অরিন্দমের।* আনন্দে, উরাসে। মাহুষ জাগছে, মনবৎ হচ্ছে। তার স্বপ্ন তাড়লে মাথক হবে?

মিছিল কাছে এগিয়ে এল। রাস্তার দু'পাশে কৌতূহলী মানুষেরা জড় হল, বাতায়ন-পথে নারীদের মুখ দেখা গেল। অরিন্দম মুখ ঢাকল, তাকে কেউ না দেখতে পার। জনতার দৃশ্য পরক্ষণে আর ঘোষণা তার বুকে এক উদ্‌গম আবেগের স্রষ্ট করল, মনে মনে সে বলল, তোমরা আমার স্বপ্ন, তোমাদের এই রূপটিই তো পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত করতে চাই আমি। ভাই সব, তোমরা একদিন বুঝবে যে আমিও তোমাদের দলের দলী।

অদ্বায় তার মাথা হঠাৎ অবনত হয়ে এল। জনতার পুরো ভাগে সে যাকে দেখতে পেল সে আর কেউ নয়, মনিশহর। অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার—শরীরটা রোগা হয়ে গেছে আরো। সারা দেহে চিন্তা, ক্রান্তির স্পষ্ট ছাপ। কিন্তু তাছাড়াও আরো কিছু ছিল তার মুখে চোখে। এক অস্বাভাবিক জালা আর আগুন ধিক্‌ ধিক্‌ করে জ্বলছে তার মধ্যে।

“আমাদের মাহুয হতে দাও”—

“অন্ন দাও”—

“বস্ত্র দাও”—

“জীবনকে সুন্দর করতে দাও”—

“স্বপ্নকে সত্য করুতে দাও”—

“মাহুয হতে দাও”—

ই্যা, ই্যা, মাহুযকে মাহুয হতে দাও ভাই মাহুয, জীবনকে সুন্দর মত বহিমান, পদের মত পবিত্র করতে দাও। ওঠো—জাগো—
বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াও—ও—ও—

ওকি!

জনতা হঠাৎ চকল হয়ে উঠল, তাদের দৃষ্টি সামনের দিকে তাকায়
স্বপ্নায় জলে উঠল। অরিন্দম তাকাল সেদিকে। বাষ্পীয় শকটে চড়ে
অন্ততঃ দুশো আগেরোস্ত্রধারী রক্ষী অক্ষচে মিছিলের দিকে।

এসে পড়ল রক্ষীরা। তারা লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। ছ'পাশের
দশকেরা গলির মাঝে দৌড়ে আব্দগোপন করল, বাতায়ন থেকে শিশু ও
নারীদের শব্দিত ভয়ানক মুখ অদৃশ্য হল।

একজন উর্জপদস্থ রক্ষী-প্রধান চীৎকার করে উঠল, “ফিরে যাও,
বাড়ী যাও, সরকারের প্রতি হিংসা করো না”—

মনিশঙ্কর একপা এগিয়ে নিভীক কণ্ঠে উত্তর দিল, “আমরা হিংসাকে
স্বপ্না করি তাই সরকারের হিংসাকেও স্বপ্না করি। আমাদের মাহুয
হওয়ার দাবীকে সরকার মেনে নিক, আমরা মানলে বাড়ী ফিরে যাব”—

রক্ষী-প্রধান কবশকণ্ঠে চোঁচিয়ে উঠল, “যাবে না?”

“না—আমাদের মাহুয হতে দাও”—

“যাবে না?”

“না”—

“তাহলে আক্রমণ কর রক্ষীরা”—

একদল রক্ষীয়া কাঁপিয়ে পড়ল মনিশঙ্করের ওপর। তাকে তারা টেনে নিয়ে গেল একপাশে।

মনিশঙ্কর বজ্রকণ্ঠে বলল, “ভাইসব, পেছ হটো না—ওদের হিংসার সামনে অটলভাবে মাথা তুলে দাঁড়াও। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তার প্রমাণ দাও”—

“চোপবও শালা”—

ভারী জ্বতোর লাথিতে মনিশঙ্কর মাটিতে মুখ খুঁবে পড়ল।

জনতার বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হল, “আমরা নড়ব না, পেছাব না”—

“আমরা অনেক সহ্য করেছি”—

“মানুষ হয়ে পশুর মত থাকব না আমরা”—

“কোটি কোটি মানুষের ঘোষণা শোন”—

“আমাদের মানুষ হতে দাও”—

রক্ষী-প্রধান উম্মাদের মত গর্জে উঠল হঠাৎ, “আগুনের গোলা ছাড়া—মারো—মেরে বাঞ্চুদের লাশ করে দাও”—

মুহূর্তে ঘন ভোজবাজীর মত নিমেষে ঘটল সব। বীভৎস দৃশ্য। আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। বাকুদের ধোঁয়া আর গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে উঠল। আতর্জনাদ করে লুটিয়ে পড়ল অনেকে—অনেক ইন্দ্র, মুকুন্দ আর মনিশঙ্কর। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটল, রক্ত গড়াল জলের ধারার মত কালো পথ বেয়ে। আতর্জনাদ, গর্জন, অগ্নিবর্ষণ। আতর্জনাদ, গর্জন, অগ্নিবর্ষণ। উন্নত মনিশঙ্করের চীংকার আর রক্ষীপ্রধানের পদাঘাত। রক্ষীদের বীভৎস, হিংস্র, নিষ্ঠুর মুখ, আগ্নেয়াস্ত্রের কক্কে নল আর আগুন। ওদিকে রক্তদার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাড়ীতে আতর্জনাদ আর সভর চীংকার।

অবিন্দন চোখ বুজল। চেতনা তার লুপ্ত হবার উপক্রম হল। কি করছে সে? এই গলিতে দাঁড়িয়ে তার মহত্ত্ব কি শুধু দর্শকের কনিকাতেই তৃপ্ত ও শান্ত থাকবে?

চোখ মেলল সে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। মিছিল ভেঙে গেছে, লোকেরা পালিয়েছে। শুধু নিঃশব্দ ও আহতেরা পড়ে আছে।

রক্ষীদের গাড়ী ফিরে চলতে আরম্ভ করেছে। বহু লোককে গ্রেপ্তার করেছে তারা। মনিশঙ্কর কোথায়? অরিন্দম তাকে দেখতে পেল না। শুধু তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কানে।

মনিশঙ্করের কণ্ঠস্বরে যেন অভিশাপ, “হিংসা, হিংসার সামনে মানুষের পশুত্ব হার মানল, কিন্তু আজই তো শেষ কথা নয়, আজই তো ইতিহাস শেষ হল না। আজ পালাল, মরল, কিন্তু অহুদিন? অহুদিন তারা ভয় পাবে না, মরবে না, পালাবে না, হিংসাকে ঠেলে এগোবে তারা— শোন, শোন”—

গাড়ীগুলো এসে গেল।

ধূলো উড়ল।

ধূলো সরে গেল।

রক্ত আর মৃত মানুষেরা।

আহতদের আর্তনাদ।

অরিন্দমের শরীর অবশ হয়ে এল। কি করছে সে? কি করল সে? কি করবে সে? ওরে ক্লীব, ওরে ভীক, ওরে পলাতক বাপুরুষ, আর কত দেবী? কত দেবী? নিজের অহমিকার দুর্গে আত্মগোপন করে তুই কবে বীরত্ব দেখাবি, কবে তোব মত্তশ্রমের প্রমাণ দিবি?

এদিক ওদিককার গলি থেকে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসছে নারীরা, পুরুষেরা। আহতদের তারা কাঁদতে কাঁদতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর মৃতেরা? ওপরের মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা সূর্যদেবের দানকে গ্রহণ করেছে। কাকুন-মদিরা নয়। সূর্যবর্ন মদিরার মত উত্তেজক আলো। মৃত্যু দিয়ে তারা জীবনের জয়গান করে গেল। মহাজীবনের প্রতিষ্ঠা করে গেল।

আর না, আর এখানে নয়, আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব নয়।

অবিন্দম পা বাড়াল।

কৃতপদে, চোরের মত, তস্করের মত সে এগিয়ে চলল।

গলির অস্থহীনতা অবশেষে শেষ হল।

উত্তেজিত ভগ্নকণ্ঠে সে ডাকল, “ললিতা”—

বাড়ীটা নিখুম।

এখানেও বাকুদের গন্ধ।

মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা হাওয়া।

“ললিতা”—

বাড়ীর ভেতরে একটা চাপা কান্না শোনা গেল এবার। কে যেন চাপা কণ্ঠে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। কে? কে কাঁদে? কেন? মুকুন্দও কি ছিল ঐ মিছিলে? মুকুন্দ কি?—

“ললিতা”—

কোন শব্দ নেই, সাড়া নেই। শুধু সেই কান্না। একটানা। মেরুপ্রদেশের হাড়-কাপানো ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসের মত। কে কাঁদে? নীচুপাড়ার লক্ষ্মী?

“ললিতা”—

মৃদু পদশব্দ।

ললিতা।

“ভূমি! আবার এসেছ!”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ ললিতা”—

কিন্তু এ কোন ললিতা! ছান্নিনেই একি চেহারা হয়েছে তার? কক্ষ কেশপাশ, ভারী গাল, নিশ্চিন্ত চোখ, ক্ষীণ কণ্ঠ, বিরোগান্ত মর্মর-মূর্তির মত প্রাণহীন! কেন?

“কেন এসেছ ভূমি? কি চাও?”

“তোমাকে দেখতে চাই।”

“কি হবে দেখে?”

“পাহাড়ের চূড়া থেকে লাক দেবার আগে একবার শক্তি চাই।

“কিন্তু আমার কোন শক্তি নেই। ক্ষুধায় আমার ভাই বোন মারা গেছে—আমার শক্তি গেছে—যা ছিল তাও গেছে আজ”—

“কি বলছ তুমি ললিতা?”

“মদ্রীবর, তুমি দেখবে?”

“কি?”

“যা বলছি”—

“কি?”—

“এসো”—

নিঃশব্দে ললিতাকে অহুসরণ করল অরিন্দম। কি বলছে ললিতা? কি দেখাবে সে? কেনই বা বাড়ীটা আজ নিরুন্ম? আর কে ধাঁদছে?

ভেতরের একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ললিতা। দরজাটা ভেজানো।

সে বলল, “দাঁড়াও”—

দরজাটাকে দৃষ্টপূর্ণে ঠেলে খুলে দিল ললিতা, বলল, “দেখো”—

কি দেখল অরিন্দম? যা দেখল তা কি দিত্য? হুঁচোখ রগড়ে দেবল অরিন্দম। না, মিথ্যে নয়। ঘরের মাঝখানে, ছাদের বাশ থেকে একটা দড়ি ঝুলছে আর সেই দড়িতে ঝুলছে বলরাম। গলায় দড়ি দিয়েছে সে। মুখের, গলার শিরগুলো তার কালো হয়ে ফুলে আছে। বিস্ফারিত চোখের কোণে, হাঁ-করা মুখের কসে রক্ত জমে আছে। আর জ্বিতা বেরিয়ে এসেছে তার, প্রায় আধ হাত। বীভৎস দৃশ্য।

ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। সে আর সহ্য করতে পারছে না।

ললিতার কথা শোনা গেল, “দেখছ? আমার আর শক্তি নেই। কি শক্তি দেব তোমায়? আমার ওপর নির্ভর করো না। কি করে থাকে শক্তি? ক্ষুধার জ্বালায় বাপকে পাগল হয়ে যেতে দেখেছি, পাগল হয়ে আত্মহত্যা করতেও দেখলাম। এত দেখাতে শক্তি কি ফুরাবে ন?”—

“ললিতা—খামো”—

“খামছি। তারপর? আর কি চাই তোমার? আমাকে আলিঙ্গন করবে”—

“ললিতা—তুমি নিষ্ঠুর হয়োনা”—

“না না, আমি নিষ্ঠুর হব না। নিষ্ঠুর হবে আজবনগরের শাসকেরা—
তুমি—তুমিও তো তাদের একজন। এখানে বসে বসে আমি বাকুদের
গল্প শেয়েছি। আমি জানি যে আজ অসংখ্যের মৃতদেহের ওপর
তোমাদের বিজয়পতাকা উড়ছে”—

“ললিতা, আমি যাই”—

“যাবে? এখনি? আমার আজ শক্তি নেই—কিন্তু তুমি আমার
প্রিয়তম বলে আমার আজ বুক নিতে পারো, চুমু খেতে পারো—
আমাকে তোমার বিলাস-শয্যা নিষ্পেষিত করতে পারো”—

“ললিতা, আমি যাই”—

“যাবে কেন, বোস—গল্প কর—কি ভাবছ? ঐ কান্না? মা বুড়ী
কাদছে। উহঁ, ভালবাসা নয়। কে খাওয়াবে বল? দালা তো
হতচ্ছাড়া। বাপ বেকার ছিল, তবু কাজ পেতেও তো পারত।”

“না, আর সহ্য করতে পারছি না আমি”—

“শোন। আমার গয়না পরার সখ ছিল বরাবর, তুমি তো ময়ী
থয়েছ—দাঁড়না কয়েকটা গয়না এবার? বাবা মরেছে বলছ? মরুকগে
চাই—পৃথিবীতে বেঁচে থাকে কে?”

বিকৃতকণ্ঠে গর্জে উঠল অরিন্দম, “ললিতা—সাবধান”—

ললিতা খামল, হাসতে গেল, হাসতে গিয়ে ঝাঁপে ফেলল, মাটিতে
বসে পড়ল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে কান্নাকে চাপতে লাগল।

অরিন্দম কথা খুঁজে পেল না। কি বলবে সে? সব কথা এখন
নিরর্থক। ঘরের মধ্যে বলরাম ইহসানারের ওপর জ্বিত বের করে দুলছে;
বাইরে মাটির ওপর অসংখ্য বীরেরা শেনিত-শয্যা সমাপ্তি-হীন

স্বপ্ন দেখছে—বাড়ীর ভেতরে পতিহীনা নারী কঁাদছে, শায়ের কাছে কঁাদছে তার হৃন্দরী নারী।

জলে যাচ্ছে বুক, কণ্ঠ, চোখের দৃষ্টি, মস্তিষ্ক, সর্বাঙ্গ। ক্রোধ আর ঘৃণার তরঙ্গ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ওবে ক্লীব, যাহূয হ, পুরুষ হ।

“ললিতা”—

নিঃস্বকতা।

“আমি আবার ফিরে আসব”—

স্বকতা।

“আমার জ্ঞাত অপেক্ষা করো”—

সাদা নেই।

“তোমার অরিন্দম আবার ফিরে আসবে ললিতা।”

লোহার মত কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল অরিন্দম।

ললিতা নড়ল না, তাকাল না, কথা বলল না।

গলিতে নেমে মনে মনে বলল অরিন্দম। আজই। এখনই।

কিন্তু তার আগে একবার মনিষকরের খোজ নিতে হবে।

বসন্ত এসেছে কিন্তু বাতাসে আজ ফুলের সৌরভ নেই, তাকে হরণ করেছে বারুদ আর চাপ চাপ বক্তের গন্ধ। বক্তের রং কী লাল! হিংসা, হিংসায় উন্নত পৃথিবী। হিংসায় সৃষ্টি বিপন্ন। এই হিংসার স্রোতে সেই মনিষর কক্ষে হয়ত আশাবরীর আলাপ থেমে গেছে, বীণকাদের বীণা ছিন্নতার হয়ে শুক্ক হয়েছে, নেই নর্তকীর নৃত্য-চঞ্চলতা রুদ্ধ হয়েছে। প্রহরী তুমি কি করছ? তুমি কি ভীত, কর্তব্যচ্যুত? প্রহরী, তুমি আমাকে ডাকো, আমাকে জাগ্রত করো, আমাকে অগ্নিময় চেতনার উদ্ভুদ্ধ করো—ও-ও-ও—

উচুপাড়ায় গিয়ে রক্ষীদের দপ্তরে গিয়ে সে হাজির হল।

সবাই তাকে চিনতে পারল, তাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

“আমুন মাছবর”—

“বমুন”—

“আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি হুজুর”—

অরিন্দম বসল, বলল, “আজ নীচুপাড়ায় গোলমাল হয়েছিল?”

একজন রক্ষী বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর”—

“যে রক্ষী-প্রধান নীচুপাড়ায় দমন-কার্য পরিচালনা করেছিলেন
তাঁকে ডাকো”—

“আজ্ঞে।”

একমিনিটের মধ্যে সেই রক্ষী-প্রধান এসে হাজির হল সামনে,
দ্রুতকরে প্রণাম জানিয়ে বলল, “কি আদেশ হুজুর, আপনার পদলেহন
করব?”

“না।”

“তবে?”

“নীচুপাড়ার নেতা মণিশঙ্করকে আমি দেখতে চাই।”

“এইদিকে আমুন হুজুর”—

রক্ষী-প্রধান অরিন্দমকে নিয়ে একটা লৌহ-কামরার সামনে গেল।
তার দরজার সামনে বারো জন সশস্ত্র রক্ষী।

লৌহদ্বার খুলে দিল একজন রক্ষী।

অরিন্দম মণিশঙ্করকে ভেতরে শায়িত অবস্থায় দেখল। কটিন,
অনার্যত প্রস্তর-মেঝের ওপর। তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।
মাথা, মুখ আর আঙ্গুলের উগায় রক্ত। নিরাবণ দেহের সর্বত্র চাবুকের
কালো ও লালচে দাগ, ছুঁচোথ মুদ্রিত।

অরিন্দম কহিনকণ্ঠে বলল, “আনামী নড়ছে না কেন?”

রক্ষী-প্রধান ঠোঁট লেহন করে ডুপ্ত ভদ্রীতে বলল, “মুছো গেছে
হুজুর”—

“কেন?”

রক্ষী-প্রধান একগাল হেসে বলল, “শালাকে খুব মেরেছি হুজুর।”

“কি ভাবে মেরেছ?”

“চাবকেছি, তাপর কবল মুড়ে ডাঙা দিয়ে ঠেকিয়েছি, ব্যাটার
অঙকোষে লাথি মেরেছি, আগুনের ছ্যাকা দিয়েছি পাছায়, আলপিন
ফুটিয়ে দিয়েছি ওর হাত আর পায়ের আঙুলে—তাছাড়া। কল, চড়,
ঘুমি তো ছিলই”—

“কিছু কেন? কেন মারলে?”

“আজ্ঞে?” রক্ষী-প্রধানের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হল, “আজ্ঞে হুজুর?”

“কেন মারলে?”

“কিছুতেই বলল না যে ব্যটা”—

“কি বলল না?”

“দলের অগ্রাগ্র লোকের নাম ঠিকানা।”

“ওঃ”—অরিন্দম তাকাল রক্ষী-প্রধানের দিকে, একটু ভাবল,
তারপরে বলল, “তোমাকে কাজ করতে হবে”—

রক্ষী-প্রধান সমগ্রমে বলল, “বলুন হুজুর”—

“ওকে আমার হেঁকাজতে ছেড়ে দাও”—

“আজ্ঞে?”

“শোনানি আমার কথা?”

রক্ষী-প্রধান গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, “আজ্ঞে শুনেছি।”

“তবে?”

“তা তো পারব না হুজুর।”

অরিন্দম বিরক্ত হল, “কেন?”

রক্ষী-প্রধান হাসল, “হুম নেই।”

অরিন্দম উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, “কিদের হুম? তুমি জান যে আমি
একজন মহী?”

“আজ্ঞে জানি।”

“আমি হুকুম করছি।”

“কিন্তু আপনার ওপরে প্রধান মন্ত্রী—তার হুকুম না হলে তো হবে না হুকুম”—

অরিন্দম গর্জে উঠল, আমি তোমাকে শান্তি দেব—

রক্ষী-প্রধান হাসল, “তাতেও প্রধান মন্ত্রীর সম্মতি লাগবে”—

“বটে!” দাঁতে দাঁত ঘষল অরিন্দম, মুহূর্তকাল শুক্ন হয়ে থেকে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল বাইরে।

এবার ?

এবার ?

প্রধানমন্ত্রী ! বটে ! তাহলে তার শক্তি নিতান্তই নীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জগু অপেক্ষা করারও তো সময় নেই আর। আর দেবী না। সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে তার। আর প্রতীক্ষা নয়, অপেক্ষা নয়, কৌশল নয়। এবার সংগ্রাম-সংগ্রাম।

শাসন-দপ্তরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। অরিন্দম ভাবল একবার। প্রসেনজিৎ হয়ত দপ্তরেই এসেছেন, সুতরাং তার বাড়ীতে যাওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া সেই বিকৃত-মস্তিষ্কা নারী, সেই মিনাকীকে সে আর দেখতে চায়না। ঠিক, সে শাসন দপ্তরেই যাবে।

আদালতের মধ্যে সে তৈরী হয়ে দপ্তরে পৌছোন।

মোজা গিয়ে সে প্রসেনজিৎের ঘরের দরজায় করাঘাত করল।

“ভেতরে এসো”—প্রসেনজিৎের গলা শোনা গেল।

ভেতরে ঢুকল অরিন্দম।

“এসো, এসো”—একগাল হেসে প্রসেনজিৎ আহ্বান করলেন,

তারপরে চোখ দুটো ছোট করে কৃত্রিম তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন,
“তুমি ভারী ছেলেমানুষ অরিন্দম”—

“কেন?”

“তা নইলে কালকে অমন পালিয়ে গেলে কেন? জীবনকে ভোগ
করতে ভয় পাও?”

“আজ্ঞে না—লুপ্ত করে ভোগ করতে ভয় পাচ্ছি, উচ্ছৃঙ্খলতাকে
ভয় পাচ্ছি”—

“কি বললে!” প্রসেনজিৎ অবাক হয়ে তাকালেন অরিন্দমের দিকে,
“কি বলছ হে?”

অরিন্দম দীরকণ্ঠে বলল, “আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে প্রাণের
মন্ত্রী, ডরুরী কথা”—

“বল।”

“আজ নীচুপাড়ায় একদল লোক মিছিল করে আসছিল—তাদের
অনেককে হত্যা করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে—এর আগেও হয়েছে
তা”—

প্রসেনজিৎ সোজা হয়ে বসলেন, “বেশতো—তাতে হয়েছে কি?”

অরিন্দম তাঁকঁদৃষ্টি মেলে বলল, “আমরা অত্যাচার করছি না তো?”

“অত্যাচার! বিদ্রোহ দমন করা কি অত্যাচার?”

“না। কিন্তু বিদ্রোহ কেন, তা ভেবেছি কি আমরা?”

“ভেবেছি বৈকি। অর্থহীন সে কারণ। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা
করছি সবাইকে সুখী করতে কিন্তু ব্যাপার কি জানো, মানুষ নিজের
কৃতকর্মের ফলভোগ করে, পূর্বজন্মের কর্ম তার এজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে”—

“কিন্তু”—

“জানি তুমি কি বলবে? মৃত্যু। মানুষ মরছে—এইতো? কিন্তু কি
করবে? ওরা জানোদারের মত শুধু মেয়েদের গর্ভসঞ্চারণ করবে আর”—

“অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়ে গেছে বলেই দুঃখ?”

“তাই।”

“ধরলাম তাই। কিন্তু আজবনগরের ঐশ্বর্য, শস্ত্র আর সম্পদ সবাইকে সমভাবে বণ্টন করে দিলে কি দোষের হয়?”

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়ালেন কঠিনকণ্ঠে বললেন, “ব্যাপার কি অরিন্দম, তোমারও কি দেবদত্তের মত মাথা খারাপ হয়েছে?”

অরিন্দম প্রসেনজিৎয়ের প্রশ্নের জবাব দিল না, বলল, “আর ওদের হত্যা করারই বা দরকার কি?”

“তাহলে কি করব?”

“বুঝিয়ে বললে হয় না?”

“না। ওরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে, তাই ওদের শাস্তি দেওয়াই উচিত।”

“ওদের তাহলে কি করা উচিত?”

“অহিংসভাবে দাবী করা উচিত।”

“নিরস্ত্র লোকের মিছিল তো হিংসা ঘোষণা করে না।”

“কিন্তু রাষ্ট্রকে যে তারা বদলাতে চায়।”

“তা কি হিংসা?”

“হ্যাঁ।”

“হিংসাকে তাহলে হিংসা দিয়ে বোধ করতে হয়?”

“নিশ্চয়ই।”

“কিছু মনে করবেন না প্রধান মন্ত্রী—আমি আপনাদের মধ্যে নতুন, আপনার কাছে আমাকে শিক্ষা নিতে হবে বলেই এত প্রশ্ন করা ছ।”

প্রসেনজিৎ যেন হাক ছেড়ে বাচলেন, “তাই বলা, আমি তো তোমার বিষয়ে রীতিমত চিহ্নিত হয়ে পড়েছিলাম।”

অরিন্দম হাসল।

প্রসেনজিৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, “ব্যাপার কি জানো? সব মানুষের দুঃখ কোন দিনই দূর হতে পারে না।”

অরিন্দম মাথা নাড়ল, “খথার্থ। কিন্তু হিংসায় যে হিংসা বাড়ে”—

“নিশ্চয়ই।”

“পৃথিবীতে শক্তিকে চিরস্থায়ী করতে হলে মানুষকে হিংসা বর্জন করতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।”

“ঠিক বলেছ।”

“তাহলে ওদের বলপ্রয়োগে দমন করাও তো হিংসা?”

“খানিকটা।”

“তার দরকার কি?”

“রাষ্ট্রকে বজায় রাখার জন্য—নিজেদের শক্তি বজায় রাখার জন্য।”

“ওরা নিজেরাই যদি নিজেদের ভাগা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়?”

প্রসেনজিৎ হাসলেন, “হাঃ হাঃ হাঃ—হাসালে তুমি। ওরা তা পারবে কেন? মুখ, অশিক্ষিত—ওদের বুদ্ধি কোথায়?”

অরিন্দম হাসল, “আর ধরুন ওরা যদি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান হয়?”

প্রসেনজিৎ মাথা নেড়ে হাসলেন, “আবার বললেন, “তাহলেও না।”

“কেন?”

“শক্তিকে হারাতে বলছ? তুমি পাগল”—

“আমি কিছুই বলছি না প্রধান মন্ত্রী—আমি জানতে চাইছি।”

“ঠিক। তাহলে শোন। শক্তি মানে ভোগ—সমস্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া, সমস্ত মানুষের ভয় ও সম্মান পাওয়া। তা কেউ হারাতে চায় না—আমরাও না।”

“কিন্তু একা ভোগ করা কি স্বার্থপরতা নয়?”

“পৃথিবীর সবাই স্বার্থপর।”

“সে তো পশুর ধর্ম।”

“হবে—তাছাড়া আমাদের ভাগা—আমরা ভাগ্যবান।”

অরিন্দম থামল। আর কথা নয়, তা নিরর্থক। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন প্রসেনজিৎ। যন্ত্রের গানের মত। ছন্দ না থাকলে, অহুত্ব না থাকলে কেউ সমগ্র মানুষের কথা ভাবতে পারে না, বুঝতে পারে না।

স্বকৃত।

প্রসেনজিৎ বললেন, “এখন বুঝলে তো?”

অরিন্দম বিনীতকণ্ঠে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আর একটা কথা আছে।”

“কি?”

“নীচুপাড়ার নেতা মনিশঙ্করের কথা বলছি। তাকে একবার আমার হাতে ছেড়ে দিন—তাকে বুঝিয়ে আমি তার মন বদলাতে চাই।”

প্রসেনজিৎ কাছে এসে অরিন্দমের পিঠে স্নেহ চাপড় মেরে বললেন, “তুমি দেখছি আমাদের সাধু মোহনদাসের চেলা—আরে, ওদের বদলানো যায় না। আমরা বড়বার ওদের কাছে অহিংসা আর প্রেমের কথা বলেছি।”

“তবু”—

“উঃ”—হয় না। তাজাড়া ওদর লোককে এত মিষ্টি কথা বলে বোকাবার দরকার নেই। ওদের স্বভাব সাপের মত—যত তোয়াজ্জই করো না কেন—দংশন করবে।”

অরিন্দমের চোখে আগুনের আভা পেল গেল, সায় দেবার ভাণ করে সে বলল, “আপনি কবোটা ঠিক বলেছেন। তাহলে মনিশঙ্করকে ছাড়বেন না আমার হাতে?”

“না।”

“তাই ভাল।”

স্বকৃত। নেমে এল।

এবার? মনিশঙ্কর আর মুক্তি পাবে না। একেবারে নিশ্চিত। শ্রীভিক্ষুদের একজন জবানবন্দী দিল। তারপর?

পদশব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে একে একে অঘোরনাথ, মহানন্দ ও বিনায়ক প্রবেশ করলেন।

অরিন্দম নিজের ঘরে যাবার জন্ত পা বাড়াল।

প্রসেনজিৎ ডাক দিলেন, “এখন যেয়ো না অরিন্দম। এতক্ষণ অল্প কথার চাপে তুলেই গিয়েছিলাম। বোস, আমাদের একটা জরুরী পরামর্শ আছে।”

অরিন্দম বসল।

অঘোরনাথ কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কিস্ কিস্ করে বললেন, “কাল কি হয়েছিল হে ভায়া?”

অরিন্দম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।”

অঘোরনাথ স্নেহাজড়িত হাসি হেসে বললেন, “ভবিষ্যতে আর ঘাবড়ে না কিঙ্ক”—

“না।”

সবাই বসলেন।

প্রসেনজিৎ একটা মানচিত্র খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর, বললেন, “কাল থেকে যে আমাদের শাসনপরিষদের অধিবেশন শুরু হবে তা বোধ হয় জানতে না তোমরা?”

অঘোরনাথ নাথা নাড়লেন, “না তো—কেন?”

প্রসেনজিৎ বললেন, “জরুরী দরকার পড়েছে।”

“কি দরকার?”

“বলছি।” প্রসেনজিৎ অরিন্দমের দিকে তাকালেন, “আমরা যে আমাদের দেশের লোকদের জন্ত চিন্তা করি তারই প্রমাণ হবে এবার।”

মানচিত্রের ওপর আঙ্গুল রেখে একটা জায়গা দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, “এই দেশটার নাম কি জানো তোমরা?”

মহানন্দ মাথা নাড়লেন, “জানি। গুটা রূপনগর।”

“হ্যাঁ, রূপনগর। আকৃতিতে এবং জনসংখ্যায় আমাদের বিচিত্রপুরের একচতুর্থাংশ। কিন্তু রূপনগর তা সত্ত্বেও বেশ সম্পদশালী দেশ, কেন জানো?”

বিনায়ক বললেন, “জানি—ওখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তেলের খনি আছে বলে।”

প্রসেনজিৎ ক্রমাল বের করে মুখ মুছলেন, সহাস্তে বললেন, “মথার্ব।”

অরিন্দমের মুখে এতক্ষণে কথা ফুটল, সে প্রশ্ন করল, “কিন্তু তেলের খনির সঙ্গে শাসন-পরিষদের অধিবেশনের যোগটা কোথায়?”

প্রসেনজিৎ প্রশান্ত হেসে হাত তুলে বললেন, “বলছি। কাল শাসন-পরিষদের অধিবেশনে আমাদের রূপনগরের বিকল্পে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে হবে।”

“কিন্তু কেন? রূপনগর কি বিচিত্রপুরুষকে আক্রমণ করেছে?”

“না।”

“তাহলে?”

প্রসেনজিৎ অঘোরনাথদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আক্রমণ এইজন্য যে রূপনগরের তেলের খনি আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে। আমাদের দেশে ও জাতীয় খনি বেশী নেই। রূপনগর থেকে বহু অর্থব্যায়ে আমাদের বাকী প্রয়োজন মেটে—তাই রূপনগরকে জয় করলে আমাদের সেই অভাব দূর হবে। তাছাড়া পৃথিবীর অগ্ন্যান্ত দেশ তেলের জন্য আমাদের নৃণাপেক্ষী হবে—একচেটিয়া ব্যবসা করে আমরা মোটা মুনাফা করব। ফলে আমাদের দেশের লোকদেরও অবস্থা বদলাবে—রূপনগরে ভালো চাকরী করবে তারা, বাবল্য করবে—বিজিত দেশে বিজয়ীরাই তে অগ্রগণ্য। তাছাড়া রূপনগরের জনবল আমাদের পরে উত্তুনগরকে জয় করতে সাহায্য করবে। তারপর—গোটা পৃথিবী আমাদের।”

মহানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, “চমৎকার—আপনার প্রস্তাবের তুলনা নেই প্রধান মন্ত্রী।”

অরিন্দমের সর্বাঙ্গে যেন অগ্নিপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল, সে প্রশ্ন করল, “কিন্তু শাসন পরিষদের অগ্ন্যান্ত সদস্যরা যদি এ প্রস্তাবকে সমর্থন না করে?”

প্রসেনজিৎ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “করবে, কারণ তাদের সত্য কথা বলা হবে না।”

“কি বলবেন তবে?”

“বলব যে তারা বিচিত্রপুর আক্রমণ করেছে।”

“পৃথিবীর অজ্ঞান রাষ্ট্র যদি বিরোধিতা করে?”

“তুমি পাগল। প্রচারের যুগ এটা। শিল্প যেমন কলনাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে প্রচার-শিল্প তেমনি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করে। প্রচারবলে আমরা পৃথিবীর সমর্থন লাভ করব। তাছাড়া ছোটকে বড় গ্রাস করে, এইতো প্রকৃতির নিয়ম।”

বিনায়ক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, “সাদু—সাদু—সাদু—”

প্রসেনজিৎ বললেন, “আমাদের দেশের কিছু লোকেরা অযোগ্যতা বশতঃ সব কিছু ভোগ করতে পারে না—ফলে তারা বিপ্লবের সোনারী স্বপ্ন দেখছে। রূপনগর আমাদের সৈনিক থেকেও নিশ্চিন্ত করবে।”

অরিন্দম কৌতূহলী হয়ে উঠল, “তা কি করে সম্ভব হবে?”

“এইভাবে। রূপনগর থেকে খাজনা এবং ব্যবসায় বাবদ আমরা যে মুনাফা করব তা দেশের লোককে একটু বেশী শাসনাত্মক বাপারে সহায়তা করবে। আমার দেশবাসীকে তো আমি গানি—অল্পতে তুষ্ট হতে তাদের মত কেউ পারে না।”

অঘোরনাথ উৎসাহভাবে সায় দিলেন, “ঠিক বলেছ প্রধান মহী—
ঠিক”—

অরিন্দম তির্যক হেসে বলল, “সব বুঝলাম—আপনার যুক্তি সত্যি চমৎকার কিন্তু পরিষদের সদস্যরা যদি সত্য কথা জানতে পারে?”

অঘোরনাথ বললেন, “আমাদের গুপ্তকথা বাইরের লোকেরা কি করে জানবে?”

“ধরুন কোনমতে জানল”—

অঘোরনাথের কালো মুখে সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠল, “নিশ্চিন্ত

থাকো ভাই। সত্য কথা জানলেও তাদের মত বদলাবার ক্ষমতা আছে আমাদের—তাছাড়া তারা বিরোধিতা করবে না এই কারণে যে যুদ্ধ হলে তাদের মোটা লাভ হয়।”

“কি করে?”

“ঠিকেশ্বরী বাবসা আর চোরাবাজার।”

“হু”—অরিন্দম প্রদেনজিতের দিকে তাকাল, “কিন্তু যুদ্ধ করা কি হিংসা হবে না?”

“দেশের স্বার্থের জন্য হিংসা অস্ত্রায় নয়।”

“কিন্তু অনেকে বলে যে হিংসা সর্বাবস্থাতেই নিন্দনীয়।”

“মিথো কথা।”

“আমাদের দেশের লোকের ভাল হলেও রূপনগরের মানুষদের তো দুঃখ বাড়বে”—

প্রদেনজি তোলো করে হেঁচো উঠলেন, “তুমি আজ শুধু হাসাচ্ছ অরিন্দম। আমাদের কাছে আমাদের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ বড়—তারপর আর কোন কিছুই বড় নয়। যাক ও সব কথা—এবিষয়ে তাহলে তোমাদের সবার মত আছে?”

অখোরনাথ, মহানন্দ ও বিনায়ক সম্মুখে মাথা নেড়ে বললেন, “নিশ্চয়—আমরা তোমার সঙ্গে একমত।”

সবাই সায় দিল, শুধু অরিন্দম একবার মাথা নেড়েই নির্বাক হয়ে রইল। তার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ আর তার কোন কিছু বলার নেই। মন্ত্রীদেব মত সে জানল আর মন্ত্রীদেব মতই ধনরাজের মত। বাকী শুধু সদস্যদের মতামত। আচ্ছা, কাল দেখা যাবে। কাল—রাষ্ট্রখানে শুধু কয়েকটা প্রশ্নের ব্যবধান। অরিন্দম, প্রস্তুত থাকো।

আজও তার চেখে খুম এল না।

বসে বসে ভাবতে লাগল অরিন্দম। আজকের দিন তার মনে থাকবে।

বিকলে পরিষদ থেকে ফিরবার সময় সে আবার রক্ষীদের দপ্তরে মনিশঙ্করের খোঁজে গিয়েছিল। সেই রক্ষী-প্রধান তাকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল বটে কিন্তু তাতে উত্তাপ ছিল না। অরিন্দম স্পষ্ট বুঝেছিল যে সে অগ্ন্যান্ত প্রভুদের মত কথা না বলায় রক্ষী তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। মনিশঙ্করকে একটু সদয়ভাবে দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল সে। কিন্তু উত্তরে সেই মনুষ্যরূপী পশু সত্যসত্তা তাকে জানিয়েছিল যে তপ্পুরে মনিশঙ্করকে আর একদফা মার দেওয়া হয়েছিল—সেই মার হজম করতে পারেনি সে। মনিশঙ্কর মারা গেছে। শুনে অরিন্দম শূন্য হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ঘৃণায়, কোপে, উদ্বেজনায তার চোখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত জল বেরিয়ে এসেছিল।

এখনো সেই কথা ভাবছে অরিন্দম। মনিশঙ্কর মারা গেছে। নীচুপাড়ার লোকেরা একজন মহাবীরকে হারাল। এবার ? অহমিকায় অন্ধ অগ্ন্যান্ত নেতৃত্ব—দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিমে মিলন কি হবে ? কে ঘটাবে এই মিলন ? মৃত্যু। দামোদর মারা গেছে। বলরাম মারা গেছে। মনিশঙ্করও গেল। মৃত্যু। মহাশূন্যতা। তারপর ? তারপর কি হবে ?

কদিনের জীবন তার কিন্তু এরি মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটল ! সেই তপ্পরের কথা, সেই হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ল। দামোদরের কথা, ইন্ডের কথা—সবার কথা মনে পড়ল। সেই বারবণিতা। আর অমিতা। কোথায় গেল সে ? আশ্চর্য কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল সে ? আর ললিতা যা বলেছিল ? হ্যাঁ, তাদের কথাই সত্য। পথ এক। নং গ্রাম। শক্তিমানদের একজন হয়েও কিছু করা যায় না ওদের চক্রান্তজাল এমনি অদ্ভুত যে ওদের ভেতরে গিয়েও কোন দল হয় না।

সেই অনেকদিন আগেকার স্বপ্ন মিথ্যে নয়। সেই নরক। কতাল,

মৃতকহীন মাছুষ, লোমশ হাত, বক্তের নদী আর হাড়ের দুর্গ। কারা
থাকে সেই হাড়ের দুর্গে? অরিম্মম তাদের চিনেছে এখন, আর নংশর
নেই তার, আর ভ্রান্ত বিশ্বাস নেই। পথ এক।

রাত অনেক। কত? কোন প্রহর? বাইরে উচুপাড়ার আলো
অগ্নান। আকাশ পর্বস্ত সেই আলোকে আলোকিত। মত্ততার উৎসব
চলেছে উচুপাড়া জুড়ে। তার ওপর নক্ষত্র-খচিত মহাকাশ। আশ্চর্য
মাছুষের জীবন। কর্মে ও বর্মে অপরূপ, চিন্তায় ও স্বপ্নে বিচিত্র, প্রেমে
ও ভ্যাগে মগ্ন।

কে? অরিম্মম কান পাতল। কারা যেন চাপাগলায় কথা বলছে
তার চারদিকে। কে? কি বলছে? আবার কান পাতল সে, শুনল
অসংখ্য লোকেরা ডাকছে—‘ভগবান—ভগবান—ভগবান’—। অসংখ্য
লোকেরা তাকে ডাকছে। কে যেন কাদে? সেই বহুদিন আগেকার
স্বামীহীনা নারী! আবার কে কাদে? দুর্গাবতী! নিরাপত্তা নেই।
মাছুষ হবার সুযোগ নেই। কারা, চারদিকে শুধু দীর্ঘশ্বাস। কোন
প্রহর? রূপসী নদীর দুপাশে, শালবনে আর প্রাস্তরে কি নিঃশব্দতা
নোড়র কেলেছে? কি গান গাইছে সেই স্তব্ধ গায়ক? বেহাগের বিলাপ
কি মনিময় কক্ষের বৃকে স্পন্দন তুলেছে? কে! কে ডাকে! জাগো
ও-ও-ও—বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি গেলে উঠে দাঁড়াও-ও-ও-ও। ডাকো
প্রহরী, ডাকো—ডেকে ডেকে আমার বৃকে এক মহান অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত
করো-ও-ও-ও—

হ্যাঁ, সেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান দূর হয়ে গেল এক সময়ে।
সময় যন্ত্রের কাঁটাটা অধিবেশন সূর্য হওয়ার প্রহর-চিহ্নে এসে থামল।
বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল—১২—১২—উননন—। সবাই জানল যে

সময় হয়েছে। এখানে ওখানে যে সব সদস্যেরা গল্প করছিল তারা সভাগৃহে প্রবেশ করল, নিজের নিজের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে উপবেশন করল। অরিন্দমও গিয়ে মন্ত্রীদের আসনে বসল।

সভাগৃহটি মস্ত বড় ও গোলাকার। প্রবেশ দ্বারের বিপরীত দিকে একটি গোলাকার বেদীর ওপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সেখানে শাসনকর্তা ও মন্ত্রীদের জুতা দামী চেয়ার ও টেবিল। প্রবেশ-পথ থেকে বেদী পর্যন্ত কার্পেট বিছানো চলাচলের পথ, তার দুপাশে, বেদীর কুড়ি হাত দূর থেকে চারটি বড় বড় দাপ উঠে গেছে। সেই সব ধাপের ওপর সদস্যদের আসন। সব-সমেত একশ জন সদস্য। সভাগৃহ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্মিত, ফলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বক্তৃতা শুনতে পাবে।

বেদীর ওপর মন্ত্রীরা আসীন হলেন।

ঘোষক ঘোষণা করল, “মহামান্যবর শ্রীযুক্ত ধনরাজ, বিচিত্রপুরের সুযোগ্য শাসনকর্তা পদার্পন করছেন”—

সভাগৃহের সকলে সম্মান প্রদর্শনের জুতা দণ্ডায়মান হল।

বক্ষী-পরিবৃত ধনরাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন, মুহূর্ত্ত হাসতে হাসতে চারদিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে, তিনি বেদীর উপর গিয়ে পরিষদের সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে অপরিচিত আরো কয়েকজন ছিল তারার বেদীতে এসে বসল। অরিন্দম তাদের চিনল না। স্তম্ভতা।

ধনরাজ বললেন, “সভা আরম্ভ হোক।”

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, “সভাপতি মহাশয় এবং বক্তৃতা, আজকের সভার গুরুতর প্রস্তাবটির আগে একটা ছোট প্রস্তাব আমি পেশ করছি। প্রস্তাবটি নূতন কর ধারের বিষয়ে। আপনারা জানেন সম্প্রতি আমাদের খরচ বেড়ে গেছে। যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে সব প্রয়োজন আমাদের মিটেছে না। নূন, জল, আলো, বাতাস, অন্ন, বস্ত্র, বই, শুষ্ক এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিষের ওপরই আমরা কর ধার্য করেছি,

কিন্তু তাতেও সমস্তার সমাধান হচ্ছে না। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে একটি কর বসানো হোক—মাছুষের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এখন সরকারের তখন তার জন্য শতকরা দশ টাকা কর দিতে বাধ্য করা হোক প্রত্যেক ব্যক্তিকে।”

অঘোরনাথ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, “প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।”

প্রসেনজিৎ বললেন, “এবার আপনারা তাহলে রায় দিন।”

অরিন্দম নড়ে বসল। এখন প্রতিবাদ করবে কি সে? না, এখন নয়। গুরুতর প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করবে সে। সেই প্রস্তাবকে বানচাল করে তবে অল্প কাজ। কারণ যুদ্ধ দাবানলের মত—পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়ে মাছুষকে রাতারাতি পশুদের স্তরে নামাবে। আশু বিপদের হাত থেকে মাছুষকে উদ্ধার করে তবে অল্পকাজ।

মভাগুহে গুঞ্জনশব্দ শোনা গেল। সদস্যেরা কানাকানি করে পরামর্শ করতে লাগল।

প্রসেনজিৎ প্রশ্ন করলেন, “এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কারো কি প্রতিবাদ করার আছে?”

সদস্যদের মধ্য থেকে একজন উঠে বলল, “দশটাকার জায়গায় আট টাকা ধাধ হোক—দশ টাকা একটু বেশী”—

বহু সদস্য প্রতিধ্বনি তুলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ—দশটাকা বেশী”—

প্রসেনজিৎ বললেন, “আপনাদের কথা মানলাম। তাহলে এই প্রস্তাব গৃহীত হল?”

সমর্থন ধ্বনিত হল, “হ্যাঁ, এই প্রস্তাব গৃহীত হ।”

প্রসেনজিৎ আত্মতৃপ্তিতে হাসলেন, বললেন, “ধন্যবাদ। এবার আসল প্রস্তাব। কিন্তু তার আগে কয়েকটা সংবাদ জানতে হবে আপনাদের। তা এতদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি—এইজন্মে হয়নি যে তাতে হয়ত ফল বাগ্প হত। খবর কি জানেন? রূপনগর

আমাদের দেশ এবং জাতির সম্মানকে বিপন্ন করে তুলেছে। স্বল্প দেশ
রূপনগরের মরণ-পাখা গজিয়েছে, অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা ধরাকে
স্বা জ্ঞান করছে।”

সভাগৃহে যেন বিদ্যুৎগতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল।

চারদিক থেকে একই সঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল সবাই, “কি করেছে, কি
করেছে রূপনগর?”

প্রসেনজিৎ হুঁহাত তুলে মহাস্তম্ভে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করলেন,
বললেন, “গত ছ’মাস ধরে রূপনগরের সৈন্তরা প্রায়ই আমাদের সীমান্ত
অতিক্রম করে মাতৃবঙ্ধন করেছে, ভাঙাতি করেছে”—

সভাগৃহ গুঞ্জনধ্বনি তুলল।

“অনেক সময় তারা আমাদের সৈনিকদের ওপরেও অগ্নিবর্ষণ
করেছে।”

সভাগৃহ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

“শুধু তাই নয়, নারীদের ওপরেও অত্যাচার করেছে তারা, হরণ
করেছে তাদের”—

সদস্যেরা গর্জে উঠল, “আমরা তার প্রতিকার চাই—প্রতিকার
চাই”—

প্রসেনজিৎ মূপেচোখে করুণ একটা ভাব ফুটিয়ে আনলেন, বললেন,
“প্রতিকার—ঠিক কথা। আপনাদের মতই আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম
প্রথমে। কিন্তু দায়িত্ব আছে তো? তাই আমি রূপনগরকে সাবধান
হবার জ্ঞাত দূত পাঠিয়েছিলাম”—

সভাগৃহ প্রশ্ন করল, “তারপর? তারপর?”

হতাশার ভঙ্গী করে প্রসেনজিৎ বললেন, “কোন জবাব দেয়নি তারা,
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সীমান্ত এলাকায় দেড়শজন সৈন্ত
এবং তিনশ জন সাধারণ লোক নিহত হয়েছে, পাঁচশ’ লুট ও ভাঙাতি
হয়েছে, নারীবর্ষণ একশ’টি, নারীবর্ষণ পঞ্চাশটি”—

সভাগৃহে যেন বাজ পড়ল।

একশ'জন সদস্য গর্জন করে বলল, “আমরা এর শোধ নেব”—

“প্রতিশোধ চাই”—

“এতদূর আশ্রয়!”

“এ অপমান আমরা সহ্য করব না”—

প্রসেনজিৎ হাত তুলে আবার থামবার ইঙ্গিত করলেন সবাইকে, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ, আমরা সহ্য করব না, আমরা শোধ নেব। সেইজন্যই আমি প্রস্তাব করছি যে আমাদের মহান দেশের স্বাধীনতা এবং সম্মানকে বজায় রাখার জন্য আমরা আজ রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। জানি, যুদ্ধ ভালো নয়, তা আমাদের আদর্শবিরোধী। কিন্তু উপায় কি? বন্ধুগণ, আপনারা বিবেচনা করে মতামত ব্যক্ত করুন”—

সদস্যেরা গর্জে উঠল, “যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই”—

অরিন্দম ধৈর্যে উঠল। আর দেরী নয়।

প্রসেনজিৎ বললেন, “ভেবে দেখুন আপনারা, আবেগ যেন আপনাদের আচ্ছন্ন না করে”—

“যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই”—

“রূপনগরকে ধ্বংস করতে হবে”—

“শোধ নিতে হবে”—

“যুদ্ধ চাই”—

একজন সদস্য উঠে দাঁড়াল, বলল, “কিন্তু একটা প্রশ্ন প্রধান মন্ত্রী”—

প্রসেনজিৎ বললেন, “আমি উত্তর দেব।”

“যুদ্ধ-ঘোষণা করার মত সৈন্যবল কি আমাদের আছে?”

“আছে।”

“অস্ত্রবল? রূপনগর ছোট হলেও নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে ওরা”—

প্রসেনাজিৎ হাসলেন, তার তীক্ষ্ণ চোখে কৌতুক ঝিলিক মায়ল, তিনি বললেন, “এ বিষয়ে আমি জবাব দেব না—আমাদের বন্ধু, আজীবনগরের সেরা বৈজ্ঞানিক সত্যকামবাপুট বলবেন এ বিষয়ে”—

অরিন্দম দেখল যে বেদীর পেছনে উপবিষ্ট অপরিচিত লোকদের মধ্য থেকে একজন প্রাচীন লোক উঠে এল সামনে। অরিন্দম বুঝল যে তাঁরা সবাই বৈজ্ঞানিক এবং ঐ বৃদ্ধই সত্যকাম। সোমা, শান্ত মৃতি তাঁর।

সত্যকাম সামনে এলেন, মুহূর্তেই বললেন, “সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ, যুদ্ধের বিষয়ে আজ আলোচনা হবে জেনেই আমি এবং আরো কয়েকজন সহকর্মী এখানে এসেছি। যুদ্ধ করতেই হবে তা আমি বলি না। তবে একথা ছোর গলায় বলব যে আপনারা যদি যুদ্ধ করেন তাহলে অস্ত্রবলের বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন।”

প্রশ্ন এল চারদিক থেকে, “কেন? কেন?”

“কেন? তাহলে শুধুন। রূপনগর কখনোই ও ভাবেতে পারবে না যে না আমরা কি আবিষ্কার করেছি। ব্যাবির বীজাণু ছড়িয়ে আমরা তাদের মধ্যে মডক সৃষ্টি করতে পারি। এখানে বসে একটা বোমা ছুঁশো মাইল দূরবর্তী জায়গায় ফেলতে পারি। সেই বোমার মাঝে এক একটা শহর আর একলাখ করে শত্রু ধ্বংস হবে”—

* সদস্তেরা করতালি দিয়ে উল্লাস জানাল, “সাদু সত্যকাম সাদু”—

বেদনায় অরিন্দমের মুখ একবার ত্রান হয়ে উঠল। এই কি বৈজ্ঞানিকের সাধনা? গ্রহ তারকা, নক্ষত্র, দেহ, জড়জগতের সংস্কৃতিকে ছিন্নভিন্ন করে মানুষকে শক্তিশালী করার সাধনা যার তিনি আজ এ কী করছেন! শুধু আত্মপ্রসঙ্গী অস্ত্রনির্মাণেই কি তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত হবে? কারা? এরা কারা?

সত্যকাম সোৎসাহে বলে চললেন, “শুধু তাই নয়—এমন শক্তিশালী আলোকে আমরা আবিষ্কার করেছি যে তার সংস্পর্শে এলে বিমানযান, অর্ধবায়ন, মানুষ, গাছ,—সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে”—

“সাধু সত্যকাম, সাধু। বৈজ্ঞানিক সত্যকাম দীর্ঘজীবী হোন”—

উল্লাসে ফেটে পড়ল সদস্তেরা, “যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই।”

আর সহ্য করতে পারল না, অরিন্দম দাঁড়াল। মৃত্যুদূতেরা চারদিকে। সমস্ত দেহ তাঁর কাপড়ে, তার দেহের পেশীগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

ধনরাজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “মহামাত্তব্য, আমার কিছু বলবার অন্তিমতি দিন।”

ধনরাজ মুহূর্তে মাথা নাড়লেন, “বেশতো—বলুন।”

প্রদেনজিৎ সদস্তের উদ্দেশ্যে বললেন, “শুধুন, আমাদের নূতন সহকর্মী কিছু বলবেন”—

সদস্তেরা কণ্ঠস্বর দিয়ে সহকর্মী জানাল।

অরিন্দম একবার চারদিকে তাকাল। সবাই কোঁড়হলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে, কান পেতে আছে তার কথার জন্ত। একবার মনটা কেমন যেন ছুঁল মনে হল কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সামলে নিল। তার চোখের নামনে অসংখ্য মৃতের মুখ ভীড় করে এল। সেই যুদ্ধ শ্রমিক, দামোদর, বলরাম, মনিষকর, অচেনা ক-ত মানুষ। এক মুহূর্তে তার মস্তিষ্কের কোষে যেন আগুন জলে উঠল।

সে বলল, “সভাপতি মহাশয়, প্রদানময়ী এবং বন্ধুগণ, যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের সিদ্ধান্ত শুনে আমি প্রতিবাদ না করে পারছি না”—

অশ্রুটকণ্ঠে প্রদেনজিৎ বললেন, “প্রতিবাদ!—

অরিন্দম বলে চলল, “আপনারা রূপনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, কিন্তু আমি আপনাদের অত্যাচার করছি যে একবার ভেবে দেখুন, যুদ্ধকে আপনারা প্রত্যাহার করুন। যুদ্ধ পশুত্বের নিদর্শন—আপনারা কি সেই পরিচয় দেবেন? যুদ্ধের সঙ্গে আসে মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি—এমন সাংঘাতিক অবস্থাই কি আপনারা দেশের মধ্যে চান? আমি অত্যাচার করছি—আপনারা যুদ্ধকে প্রত্যাহার করুন। শান্তির পথে

অগ্রসর হোন। হিংসায় হিংসা বাড়ে। আজ রূপনগর পরাজিত হলেও তার জালা মিটবে না, ভবিষ্যতে হয়ত আবার তারা আমাদের আক্রমণ করবে আর এমনভাবেই অনন্তকাল চলবে—। শুধুন—”

প্রসেনজিৎ বাধা দিয়ে চীৎকার করে বললেন, “কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা? আমাদের মধ্যাদা? বন্ধুগণ, মধ্যাদাহীন জীবন কি বাঞ্ছনীয়? পরাধীন জীবন কি সুখের?”

সদস্ত্রেরা একযোগে মাথা নাড়ল, “না—না—না—”

ধনরাজ প্রসেনজিৎকে কানে কানে বললেন, “ব্যাপার কি প্রধান মন্ত্রী?”

প্রসেনজিৎ বিব্রতকণ্ঠে বললেন, “তাইতো—অরিন্দমের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না—”

অরিন্দম খামল না, বলল, “মধ্যাদা আর স্বাধীনতা তো আমাদের বিপন্ন হয়নি। সীমাস্ত্র এলাকার গোলমাল অত্র উপায়েও খামানো যেতে পারে। তার চেয়ে বড় কাজ আমাদের সামনে—আত্মন আমরা তার সমাধান করি। আমাদের দেশের লোকেরা অর্ধাহারে, অনাহারে, ব্যাদিতে মারা যাচ্ছে, তাদের দুঃখ দূর করুন। স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতার কথা বলছেন আপনারা? দেশ? দেশ মানেই তো দেশের মাতৃঘ—আগে তাদের দুঃখ দূর করুন, তাদের মাতৃঘের মধ্যাদা দিন—তারপর যুদ্ধের কথা ভাববেন। বন্ধুগণ—”

“বন্ধুগণ”, প্রসেনজিৎ গভীর গলায় বললেন, “আমাদের নূতন মন্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করেননি বলে আমি দুঃখিত। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে তাঁর ধারণা ভ্রান্ত—অতএব আপনারা কি—”

ধনি উঠল, “যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই—”

কি হিংস্র চাহনি সবার! কি গভীর দ্বণা সবার চোখে মুখে! আঘাত কর, ওদের চৈতন্য কিরিয়ে আনো।

আবেগের সঙ্গে অরিন্দম বলল, “শুধু, আপনারা যুগা আর হিংসা ছড়াবেন না পৃথিবীময়। আপনারা দেশের জন্ত দায়ী বলেই তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবার অধিকার নেই আপনারা। বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, অশান্তির যত নগর, ব্যাধি, মড়ক আর হুভিক্ষ কি চান আপনারা? রাজ্যময় জনতা অশান্ত, ক্ষুধা, বিপ্লবের জন্ত তৈরী—এসময়ে কি আপনারা বন্ধু সাজে?”

সদস্যরা টেবিল চাপড়ে গোলমাল শুরু করে দিল। উত্তেজিতভাবে কানাকানি করতে লাগল তারা।

“কি বলছে নতুন মন্ত্রী?”

“পাগল, ব্যবসার সুযোগটা নষ্ট হবে—”

“নিশ্চয়ই, যুদ্ধ না হলে কি কালোবাজার জমে?”

সবাই চীৎকার করে উঠল, “বু—বু—বু—উ—উ—উ—”

কেউ শুনছেন না তার কথা।

কিন্তু তবু তারবে না অরিন্দম, সে হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগল, “বন্ধুগণ—বন্ধুগণ—”

প্রসেনজিৎ ধনরাজকে বললেন, “আর সন্দেহ নেই মহামান্যবর—”

ধনরাজ মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ, শু ছদ্মবেশী শত্রু—ওকে তাড়াও—”

অরিন্দম চীৎকার করে বলল, “শুধু—আপনারা নিজেদের স্বার্থের জন্ত দেশের লোকের জীবন বিপন্ন করবেন না। শুধু কি তাই? পৃথিবীর মানুষের জন্তও কি আপনারা কোন দায়িত্ব নেই? শুধু, ইতিহাসের কাহিনী শ্রবণ করুন—যুদ্ধে কারো কোন লাভ হয় না—যুদ্ধের ফল চিরকাল এক—

প্রসেনজিৎ লাফিয়ে সামনে গেলেন, অরিন্দমের কথা চাপা দিয়ে গলা ফাটিয়ে বললেন, “বন্ধুগণ, আপনারা কি এখনো এই অসংবদ্ধ প্রলাপ শুনতে চান? এই ভ্রষ্টলোক শক্তিমান হওয়ায় আমরা তাকে মন্ত্রীতে বরণ করেছিলাম, কিন্তু এখন কি দেখছি আমরা? উনি নিবোধ, অকৃতজ্ঞ, দায়িত্বহীন—”

“ঠিক বলেছেন প্রধানমন্ত্রী—ঠিক বলেছেন”—

“ওমু তাই নয়, এখন মনে প্রশ্ন জাগছে উনি কি মন্ত্রীস্বের যোগ্য ?
রাজনীতির অ আ ক খ জ্ঞানও যার নেই তাঁকে কি আপনারা”—

সভাগৃহ থেকে বজ্রনির্দোষ শোনা গেল, “না, আমরা তাকে আর
চাইনা”—

“নতুন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করুন”—

“তাকে আমরা চাই না”—

টেবিল চাপড়ে কোলাহল করে উঠল সদস্যেরা ।

অরিন্দম মরিয়ার মত বলল, “আমি মেনে নিচ্ছি আপনাদের দায় ।
কিন্তু বন্ধুগণ, আর একবার ভেবে দেখুন । আপনাদের পরিচালনা
করছেন ধারা—সেই সরকার স্বাধীন । মিথ্যা, অবিচার এবং কপটতাই
তাঁদের ধর্ম”—

“চুপ করুন”—

“শুনব না—আমরা কোন কথা শুনব না”—

“বু—উ—উ—উ—বু—উ—উ—উ”—

অরিন্দম গর্জে উঠল, “আপনাদের সরকার রূপনগরকে কেন আক্রমণ
করবেন জানেন ? সেখানকার তেলের খনির মালিক হবার জ্ঞাত ।
আমাদের স্বার্থের যুগ্মকাঠে দেশের লোকদের বলি দেবেন তাঁরা”—

প্রমেনজিৎ গর্জন করে উঠলেন, “অরিন্দমবাবু—সাবধান”—

অরিন্দম ভয় পেল না । এই তো শুরু হয়েছে তার মহান সংগ্রাম ।
ভাঙ্গো, চক্রাভ্রজালকে অপসারিত করো ।

সে বলল, “আমি ভয় করিনা, আজ আমি সত্যকে উন্মোচিত করব”—

প্রমেনজিৎ অটুহানিতে ফেটে পড়লেন, সভাগৃহের দিকে তাকিয়ে
বললেন, “শুনছেন, কোন যুক্তিতেই আপনাদের টলাতে না পেরে কিভাবে
বিভ্রান্ত করতে চাইছে এই ভদ্রলোক ?—কিন্তু আপনারা ভুল করবেন না,
এই কালো চামড়ার লোকটিকে বিশ্বাস করবেন না । অশেষ শক্তির

পরিচয় দিয়েছিল বলেই কালো হওয়া সবেও শুকে বিশ্বাস করেছিলাম
আমরা। এখন বুঝছি যে আমরা ভুল করেছিলাম কারণ, কালো মানুষেরা
চিরকালই অমাহুষ এবং বিশ্বাসঘাতক”—

অরিন্দম বলল, “আরো শুধুন—সীমান্ত আক্রমণ, লুণ্ঠন, নারীহরণ—
নির্জলা মিথ্যা। বন্ধুগণ”—

ধনরাজ গর্জে বললেন, “বিশ্বাসঘাতক”—

প্রদেবজিৎ বললেন, “হ্যাঁ, এই নীচ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক”—

অরিন্দম তবু বলতে চাইল, “কিন্তু বন্ধুগণ”—

নিষ্ঠুরতায় ভেঙ্গে পড়ল সভাগৃহে, ধনি তুলল, “শুনতে চাইনা—তুমি
বিশ্বাসঘাতক”—

“শুকে বের করে দিন”—

অঘোরনাথ প্রদেবজিৎকে বলল, “শুকে খেপ্তার করুন”—

অরিন্দম হাত নেড়ে কথা বলতে গেল, কিন্তু পারল না, পেছন থেকে
মহানন্দ ও অঘোরনাথ তাকে ধেলে নামিয়ে দিল বেদী থেকে।

“ভাই সব—শুধুন—” অরিন্দমের কণ্ঠ থেকে কারার মত কথা
বেরোল।

হিংস্র পশুর মত সভাগৃহ ফেটে পড়ল, “বের করে দিন—
বিশ্বাসঘাতককে বের করে দিন”—

একটি রক্ষীকে হাজির করলেন প্রদেবজিৎ। রক্ষীটি গিয়ে অরিন্দমের
খাড়ে ধাক্কা দিল, ঠেলতে ঠেলতে বাইরের দিকে নিয়ে চলল।

পিণ্ডাবন্ধ বাঘের মত তবু বলল অরিন্দম, “সব শুধুন, মানুষের
স্বাধিকারকে বিপন্ন করবেন না।”

“বেরিয়ে যাও”—

“মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করুন”—

“শয়তান”—

“তাদের ছুঁতে দূর করুন”—

“নীচুপাড়ার চর”—

“পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ করুন সবাই”—

“বিশ্বাসঘাতক কুহুর”—

হিংসা, হিংসায় মুখ কালো হয়ে উঠেছে সবার। হিংসায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ভগবান।

একটি দাক্ষা ও পদাঘাত।

বাইরের পাকুর-দাঁদাতো পথের উপর ছিটকে পড়ল অরিন্দম।

“হাঃ—হাঃ হাঃ—শালা কুত্তা”—রক্ষীটি তার মুখের ওপর থুথু ফেলল।

আর ভেতরে সদস্যরা গর্জ উঠল সেই সময়, “যুদ্ধ—আমরা যুদ্ধ চাই—আমরা রূপনগরকে ধ্বংস করব”—

আর ধনরাজ যেন প্রসন্নচিত্তের কানে কানে কি সব বললেন।

মহাকাব্যের ভাগ্যাহত মহাবীরের মত অরিন্দম টলতে টলতে এগোল পথের দিকে। বেলা কত? কোন প্রহর? প্রহরী, আমি লাফ দিয়েছি। প্রহরী, তোমার ডাক আমি শুনেছি। হল না। ওদের ব্যাহকে ছিন্নভিন্ন করতে পারলাম না। হ্যাঁ, মুন্সু আর ললিতার কথাই ঠিক। নীচুপাড়ার জনতা, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ভাইসব, আমি এখনো পরাজিত হইনি, আমার সংগ্রাম হবে স্তব্ধ হয়েছে, এখনো তা শেষ হয়নি।

ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

টলতে টলতে বাড়ীর দিকে গেল সে।

উঁচুপাড়ার জনতা কৌতূহলী দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করে তার দিকে। নতুন মজী পায়ে হেঁটে কোথায় চলেছে? কি ব্যাপার? এমন অঘটন তো কখনো ঘটেনি!

নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল অরিন্দম।

বাড়ীর সামনে আটজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী।

ভেতরের দিকে না বাড়তেই রক্ষীরা তাকে বাধা দিল।

“খবরদার ভেতরে এগো না”—রক্ষীরা ধমকে বলল।

“কেন ?” অরিন্দম অবাক হয়ে গেল।

রক্ষীদের একজন সহান্তে বলল, “সরকারের সঙ্গে লড়াই করলে কি আর বাড়ী ঘর থাকে বাবা। যাও এবার রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খাওগে। সরকার তোমার বাড়ী ঘর, টাকা পয়সা ও সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করেছে। যাও মন্ত্রী বাপধন—সব পড়ে”—

রক্ষীটি তাকে ধাক্কা দিল।

অরিন্দম ঘুরে পাড়াল, ফিরে চলল।

রক্ষীরা হো হো করে হেসে উঠল।

এবার ? কোথায় যাবে সে ? কি করবে ?

নীচুপাড়ায় ? নীচুপাড়ায় ফিরে যাবে ? এখনি ?

না। উঁচুপাড়া তো শাসক-গোষ্ঠী আর সভাগৃহেই সীমাবদ্ধ নয়। উঁচুপাড়ার মানুষেরা বলি তার কথায় সচেতন হয় তাহলে কি সরকারের মত বদলাবে না ? নিশ্চয় বদলাবে। হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই করবে সে ? নীচুপাড়া জাগ্রত হচ্ছে। উঁচুপাড়াকেও জাগ্রত করবে সে ? তা না হওয়া পর্যন্ত সে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

“মন্ত্রী—নতুন মন্ত্রী—”

অরিন্দমের চমক ভাঙ্গল। উঁচুপাড়ার পুরানো জনতা তাকে অস্বস্তির কারণে, তাকে দেখে আলোচনা করছে।

“কিন্তু কি ব্যাপার ? মন্ত্রী যে হেঁটে যাচ্ছেন !”—

“চাল ভাই—নতুন মন্ত্রীর নতুন চাল—”

জনতা বাড়তে থাকে। অরিন্দম যত এগোয়, ততই তাকে যিকি জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

হঠাৎ খেয়াল হল অরিন্দমের। এইত স্বযোগ। বাতাসে বাজ-
বিজয়ের মধুর তান। বারংবার আঘাত হানো—

‘ধামল সে, চারিদিকের জনতার উদ্দেশ্যে বলল, “ভাই সব—
শোন—”

জনতা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

“শোন শোন, মহী মশাইয়ের কথা শোন—”

“রাস্তায় বক্তৃতা—বাঃ—”

অরিন্দম বলল, “ভাইসব, তোমরা হয়ত জানো যে রূপনগরের
বিক্রম্ভে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে—”

“যুদ্ধ! বাঃ—”

“আরে যুদ্ধ মানেই মোটা মুনাফা—”

“আর মুনাফা মানে? ছাগমাংস আর নারীমাংস—”

অরিন্দম বলল, “কিন্তু তোমরা তার বিক্রম্ভে প্রতিবাদ ঘোষণা করো।
তোমাদের জীবন যে যুদ্ধে বিপন্ন হয়, যে যুদ্ধে মাতৃস্নেহে দুঃখ বৃদ্ধি পায়
তাকে তোমরা স্বীকার করো না, তাতে তোমরা যোগ দিয়ে না।
শোন, তোমাদের শাসকগোষ্ঠী স্বার্থপর ও ক্ষমতা-লোভী—”

জনতা গুঞ্জনধ্বনি শুরু করল, “এ সব কী কথা বলছে হে মহী?”

“এ আবার কি গুনচি?”

অরিন্দম বলতে লাগল, “তারা মতৃস্নেহের শত্রু, স্বার্থে ও হিংসাত
তারা অন্ধ। তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়েনা তোমরা, শোন তোমাদের
শোষণ করার জন্যই তাদের সমাজ-নীতি আর ধর্ম—শোঃ—”

হঠাৎ একটি সংবাদপত্র-বিক্রেতা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে
এল সেখানে, “তাজা খবর—বিশেষ সংখ্যা—নতুন মহীর কাণ্ড শোন—”

জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল।

“কি খবর? কি খবর?”

“রূপনগরের বিক্রম্ভে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে—যুদ্ধ—”

“নতুন মন্ত্রী সরকার-বিরোধী”—

“বিশ্বাসঘাতক!”—

অসহায় দৃষ্টি মেলে অরিন্দম বলল, “ভাই সব—শোন”—

কিন্তু কাদের বলছ সে? সংবাদপত্রে তার ছবি বেরিয়েছে, বেরিয়েছে তার নিন্দা, তাকে বিশ্বাসঘাতক শব্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পড়ে মুহূর্তে উচুপাড়ার জনতার মুখে চোখে ঘৃণার অন্ধকার নেমে এল।

“ভাইসব—শোন”—

কিন্তু কেউ শুনল না। মুহূর্তে হিংসায় কেটে পড়ল তারা।

“বিশ্বাসঘাতক—শাল, শত্রু”—

“মারো—বাটাঁকে মারো”—

রাস্তা থেকে তিল পাটকেল কুড়িয়ে নিল তারা, তার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। হাতে, পায়ে, পিঠে, বুকে, মাথায় এসে লাগল তা। বেদনা, রক্ত। কিন্তু তবু যেন দেবাতাসে কার নৃপুত্র-নিষ্কণ শুনল, তবু যেন তার কানে ভেসে এল বাণীর কঙ্কার—

“মারো শালকে—হটাঁও”—

“বড় বড় কথা কপচাচ্ছে বাটাঁ—বটে!”

চারজন রক্ষী ছুটে এল, কাঠের ডাঙা তুলে জনতাকে ভয় দেখিয়ে চতুর্ভঙ্গ করে দিল।

তারপর রক্ষীরা অরিন্দমের কাছে এল, বলল, “গবরদার—রাস্তায় আর বক্তৃতা দেবেনা তুমি”—

অরিন্দম কথা বলল না, শুধু যন্ত্রণা-বিকৃত হাসি হাসল।

রক্ষীরা বলল, “যাও এখন—সরে পড়ো—হোঁ”—

অরিন্দম পা বাড়াল।

হল না। কোন ফলই হল না। বহুদিনের দাসত্ব এখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে, বটবৃক্ষের মত অজস্র শিকড় মেলে মৃত্তিকাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু থামবে না সে, হারবে না, সত্যকে সে প্রতিষ্ঠিত করবেই,

মাগ্বকে সে মুক্ত করবেই। দেখে বেদনা, রক্ত। ভবু আকাশ কি
সুন্দর! সেই মনিষ্য কক্ষে এখন মালবী রাগিনী মৃতিমতী হয়েছে।
সেই নর্তকীর স্বর্ণকেশ মৃত্যু-তালে ঢুলছে, ঢুলছে। ললিতা, আমি
পথভ্রষ্ট হইনি।

হেঁটে চলল সে।

অপরূহ এল, গেল, সন্ধ্যা হল। রাত হল।

উচুপাড়ার রাজপথে, ঘরে আলোর সমারোহ। ভীড়। সংবাদপত্রের
ঘোষণা। যুদ্ধ। নতুন মন্ত্রী বহিষ্কৃত। এখানে ওখানে জনতার জটল।

হাস্তমুগ নরনারী। হৃদয়ঙ্কিত, হ্রস্বভিত। ভীড়। যানবাহন
লৌহবস্ত্রে ধাবমান বিদ্যুৎ-যান। ইম্পাতে ইম্পাতে সংঘর্ষ, অগ্নিশূলিক
আর ধাতব গন্ধ। কোলাহল, হাসি উৎসব। মদমত্ত নরনারী।
কটাক্ষ, তনাগ্রচূড়া আর নিতম্ব-নর্তন। মাতৃহতীনা নারী। অনর্গল
কথা আর কানোন্নত বনমাহুঘের হৃদয়। ধর্ম্মাঙ্ক, পৌরুষহীন পুরুষ।
বুসংস্কারের আবর্জনাশূল আর নীচতার মূর্তি। লালসা, লোভ আর
হিংসার রক্তক। ভাঙে—

“হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ দেখো”—কে একজন চীৎকার করে বলল।

অরিন্দম তাকাল। কয়েকজন তাকে চিনতে পেরেছে। উচুপাড়ার
সীমান্তে এসে পৌঁছেছে সে। দূর থেকে সে নীচুপাড়াকে দেখতে পেল।
অন্ধকার নীচুপাড়া। সেই অন্ধকারকে রূপ দেবার জন্যই যেন এখানে
ওখানে একটা ছোটো নিশ্চল বাষ্পীয় আলো। অনাহার, ব্যাধি, দারিদ্র্য
আর মৃত্যুর সাজ। সমস্ত বুক আলোড়িত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরোল
তার।

আর তার কানে এল, “দেখো—ঐ যে সেই বহিষ্কৃত মন্ত্রী”—

ভীড় জ্বলল। অরিন্দম দাঁড়াল একটা আলোকতুঙ্গে হেলান দিয়ে।
আরো ভীড় জ্বলল। আরো।

একটা কিছু ছিল তার মুখে চোখে। হৃদয় বেদনা, ক্ষুধা আর

শোণিতচিহ্ন তার মুখে একটা আকর্ষণীয় ছাপ এঁকে দিয়েছিল। ভাই
জনতা বাড়ল।

হাসাহাসি করতে লাগল তারা।

“মূর্খ”—

“কি মূর্খ লোকটা!”

“ইচ্ছে করে মদীয় চারায়!”

“মূর্খ নয় তে—বিশ্বাসঘাতক”—

“নীচুপাড়ার দরদী”—

“হাঃ হাঃ হাঃ”—

“হি হি হি”—

অরিন্দম তাকাল তাদের দিকে। বেদনায় বুকটা তার মুচড়ে মুচড়ে
উঠল। মাতুষ—মাতুষই মাতুষের শত্রু। কারা হাসছে? হায়। যারা
হাসছে তারা জানে না যে নিজেরা নিজেদের কি ক্ষতি করছে তারা।

সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, “ভাইসব, আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে
নেখে হাসো—কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ভাইসব, দয়া করে আমার
কয়েকটা কথা শোন”—

সে বলতে শুরু করল। জনতা সকৌতুকে তার কথা শুনতে লাগল।

একজন বলল, “নাও না ভুল করে বাটার বক্তৃতা—এ্যা?”

তার সঙ্গীরা বলল, “না—শোনা যাক না কি বলে”—

আর সবাই বলল, “যথার্থ—নিবীষ ভূজঙ্গকে ভয় কি?”

অরিন্দম বলে চলল। উচুপাড়ার আশ্রয়িত বিজ্ঞাপনের লেখা
জলতে লাগল, নিভতে লাগলো চারদিকে। বেতার-যন্ত্রের গান
ভেসে এল দূর থেকে। আর তাকে ছাপিয়ে ভেসে এল বসন্তের আলাপ।
যদঙ্গ বাজছে, নৃত্যশ্রমে মুক্তোর মত হৃদয়বিন্দু জমেছে নর্তকীর ললাটে,
বীণকারের বীণা কথা কইছে। হ্যা, আজবনগরেও বসন্ত এসেছে। ভাই
মাতুষ, জাগো-ও-ও। উঠে দাঁড়াও, সংঘবদ্ধ হও, অত্যাচার আর শোষণের

অবসান করো। কুসংস্কার আর ভয় থেকে মুক্ত হও। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। পৃথিবী সবার। যারা মানুষকে ধর্মের নামে, ভগবানের নামে, পূর্বজন্মের কথা বলে বিভ্রান্ত করে, যারা শোষণ করে স্বার্থকে সমৃদ্ধ করে, যারা সমুদ্রবান হবার জন্য মানুষকে শ্রেণী এবং জাতিতে বিভক্ত করে তাদের উৎপাটিত করো। শোন, প্রত্যেকেই আমরা মুক্ত ও নয় হয়ে জন্মাই। আমাদের ইতিহাস এক—আনন্দ থেকে রক্ত ও মাংস লাভ করি আমরা—আনন্দই আমাদের ধর্ম। সেই আনন্দের শত্রু হিংসা। হিংসাকে ধ্বংস করো। একটা হত্যা করার চেয়েও বড় হিংসা একজনকে ছোট মনে করা। অত্যাচার বিরোধিতা হিংসা নয়। অত্যাচার ভাবা আর মানুষকে অমানুষ ভাবা, তাকে ভাগ্যের কাছে অসহায় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই হিংসা। ভাই মানুষ, তোমার মধ্যেই ঈশ্বর, নিজেকে দেখো, চেনো, জানো যে সত্য, দীর্ঘনিশ্বাস এবং প্রেমই ঈশ্বর। হিংসায় হিংসা বাড়ে। শান্তি চাই। কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা আর তোমাদের শাসকেরাই শান্তির শত্রু। তাদের জন্তই তোমরা শুধু জৈবিক তাগিদে কথায় ভাবো, ভালবাসতে পারো না। তাদের সরাও তাদের পরাজিত করো, তাদের ধ্বংস করো। তারপর? মুক্ত মানুষ, স্বাধীন মানুষ, প্রেমিক মানুষ আর চিরস্থায়ী শান্তি। স্বার্থপরেরা শাসন করে বলেই একদেশের সঙ্গে আরেক দেশের বিরোধ। মানুষদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করো, পৃথিবীময় শান্তি বিরাজিত হবে। শান্তিই আহ্বার পথকে প্রশস্ত করে। গণা, সংগ্রামের জন্য পাশাপাশি দাঁড়াও—মহাজাত-হরণকারী হিংস্রকের হিংসাকে নিশ্চিহ্ন করো। ভাইসব—

চাঁচা বাপু যানের শত্রু শোনা যায়, শোনা যায় অশ্রুধারের শব্দ। অরিকম দেখতে পেল কিন্তু থামল না। জনতার নজর সেইদিকে ছিল না। কোতুলেশ্বরতঃ সুনতে সুনতে তারা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। কথাগুলো সুনতে ভাল লাগছে, যদিও একটাও বিশ্বাসযোগ্য

মনে হচ্ছে না। এমন লম্বা চণ্ডা বুলি তারা সাধু মোহনদাসের মুখে ঢের
ঢের শুনেছে। এর চেয়েও ভালো ভালো কথা। কিন্তু কি হল? দরকার
কি বাবা অত ঝামেলায়?

হঠাৎ গর্জন শোনা গেল, “মারো সবাইকে, মারো”—

অস্বারোহী রক্ষীরা ঘোড়া ছুটিয়ে জনতার মাঝখানে এল, সবগে
এলোপাথাড়ি ডাঙা চালাতে শুরু করল তারা।

“পালা-পালা শালারা”—

“পালাও—পালাও”—

“বক্তৃতা শোনা হচ্ছে—বিশ্বাসঘাতকের বক্তৃতা—বটে!”

“পালাও-পালাও”—

“উঃ”—

“আঃ”—

অভিনাদ, কোলাহল। বিশৃঙ্খল পলায়মান জনতা।

অবিন্দম বিষন্ন হেসে বলল, “ভয় পেরো না—দেখ, সত্যের শক্তি
দেখো। সত্য উচ্চারিত হয়েছে বলেই অসত্যের দাসেরা ছুটে এসেছে—
শোন”—

রক্ষীরা গজ্ঞে উঠল, “মারো শালা গুপ্তচরকে”—

কয়েকজন তার দিকে ছুটে এল।

তারপর কিল, চড়, ঘৃষি, পদাঘাত মাথা ফেটে গেল, রক্তে সবাক
ভিজ্জে গেল।

অবিন্দম জ্ঞান হারাল।

একজন রক্ষী-প্রধান এগিয়ে এল, “শালাকে নীচুপাড়ার রাস্তায় টেনে
ফেলে দাও আর পাহারা দাও এখানে—ও যেন আর এদিকে ঢুকতে না
পারে”—

হুজুন রক্ষী অবিন্দমের চ'পা ধরে টানতে টানতে নীচুপাড়ার রাস্তায়
নিয়ে ফেলে দিল তাকে।

সব রক্ষীরা চলে গেল ।

শুধু দূরে উচুপাড়ার সীমান্তে, চারজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী রক্ষী টহল দিতে লাগল । পিচ-বাধানো কঠিন রাজপথের ওপর থেকে তাদের লোহার নাল-লাগানো ভারী জুতোর শব্দ বারংবার ভেদে আসতে লাগল—খট্-খট্—খট্-খট্—খট্—খট্—খট্—খট্—

ছয়

অরিন্দমের জ্ঞান ফিরে এল। একটু বাদেই। দেহে অসহ্য বেদনা। সে তাকাল ধীরে ধীরে। কোথায়? এষে পরিচিত জায়গা! নীচুপাড়ার রাস্তায় পড়ে আছে সে।

মাথার ওপর তারা-ককরকে আকাশ। বসন্তের মুহূর্তে বাতাসে নীচুপাড়ার শব্দগন্ধ। রাত কত? দ্বিতীয় প্রহর শেষ হতে চলল। তাই তো পঞ্চম রাগের বিলম্বিত তান ভাসছে কানের পাশে, পাখোয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে ধর্মণীর তালে, সুর আর তাল যেন বদ হয়ে বেদনাকে হান করে দিচ্ছে। ললিতা, তোমার কথাই মত। মুকুন্দ, ক্ষমা করো। প্রহরী, এবার কি করব?

কে! অরিন্দম সচেতন হয়ে তাকাল ভালো করে। সপ্তমীর চন্দ্রদেব ঝড়াকারে আকাশে উঠেছেন। তার অস্পষ্ট আলোর নীচুপাড়ার গলি থেকে বহলোককে ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

তারা কাছে এল, অরিন্দমকে ঘিরে দাঁড়াল।

“কে?”

“কে?”

“আরে এষে অরিন্দম—”

“খবর দাও—অরিন্দমকে ওরা আহতাবস্থায় লে রেখে গেছে—”

কয়েকজন ছুটে চলে গেল।

“তোলো ভাই—অরিন্দমকে তোলা—”

ক্ষীণকণ্ঠে অরিন্দম প্রশ্ন করল, “তোমরা! আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে? আমাকে কি আর স্মরণ করো না তোমরা?”

লোকটি হাসল, “ঘৃণা! উচুপাড়ার কাগজে তোমরা সংগ্রামের কথা
আমরা পড়েছি—তুমি তো আমাদেরি জন্ত সংগ্রাম করেছ—”

“আমি—আমি”—

“হ্যা, তুমি সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ প্রেমিক—তুমি মহৎ যোদ্ধা—

আঃ—আঃ। অরিন্দম দু’চোখ বুজল।

বাকী সবাই তাকে ধরাধরি করে নীচুপাড়ার ভেতরে, একটা ফাঁকা
ঝায়গায় নিয়ে শোয়াল।

দূর থেকে নরনারীদের ছুটে আসতে দেখা গেল।

“অরিন্দম—অরিন্দম এসেছে—”

“মহাবীর ফিরে এসেছে—”

“আমাদের যোদ্ধা—”

“আমাদের অরিন্দম—”

অসংখ্য নরনারী এসে জড় হল তার চারদিকে। দুঃখহত, দরিদ্র,
মৃত্যুর ছায়ায় বিবর্ণ-মুখ মানুষেরা। ঘৃণা, লোভ, নীচতা আর অভাবের
মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতেও ব্যাথা মাকুষ হতে চাইছে, ভালবাসছে, শ্রদ্ধা
করছে, আত্মত্যাগ করছে। মাকুষ—মাকুষই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

“আহা, কে মেরেছে এমন করে?—”

“শুধা—ওই শত্রুরা—”

“আমাদের শত্রুরা মেরেছে—”

“সত্য বলার জন্ত—”

“ওদের নুখোশ খুলে ফেলার জন্ত—”

হঠাৎ ভীড় চলেতে চলেতে এল মুকুন্দ আর ইন্দ্র, অরিন্দমের পাশে
তারা হাঁটু গেড়ে বসল, ডাকল, “অরিন্দম—”

অরিন্দম হাসল, “আমাকে ক্ষমা করেছ?”

মুকুন্দ অশ্রুতপ্তকণ্ঠে বলল, “তুমিই আমাদের ক্ষমা কর ভাই—তুমি
প্রমাণ করেছ যে তুমি আদর্শনিষ্ঠ—”

“কিন্তু আমি যে ব্যর্থ হলাম—”

“তবু আদর্শচ্যুত হওনি—ভবিষ্যতে তাই আমাদের সার্থকতার নিহে
নৌছোবে।”

“ঠিক বলেছ মুকুন্দ—। মুকুন্দ, আনাকে তোমাদের সাথে সংগ্রামে
যোগ দিতে দেবে?”

মুকুন্দ হাসল, “দেবনা? তুমি এখন থেকে আমাদের পুরোভাগে
থাকবে।”

“মুকুন্দ—”

“উ?”

“তোমার ঋণ শোধ করা যায় না—”

“কি বলেছ?”

“তুমিই তো আমার ঋক মুকুন্দ—”

“তুমি পাগল।” মুকুন্দ সরেয়ে অরিন্দমের মাথায় হাত বুলাল।
শুষ্কতা।

“মনিশঙ্কর আর নেই মুকুন্দ—বোধ হয় জানো?”

“জানি—কিন্তু তার কর্ম আছে, কথা আছে, নির্দেশ আছে—”

“হ্যা—হ্যা—”

শুষ্কতা। আনন্দময় পৃথিবী।

“মুকুন্দ—”

“বল—”

“এখানে কতদূর?”

“শক্তি বাড়ছে আমাদের প্রতিদিন—মানুষেরা আর মরতে ভয় পায়
না।”

অরিন্দম সানন্দে হাসল।

শুষ্কতা।

কে আসছে ? ভীড় সরে গিয়ে কাকে পথ করে দিচ্ছে ? তাপসকুমারী
মত শীর্ণা, প্রথব-যৌবনা ওই নারী কে ?

কাছে এল সেই নারীমূর্তি । পরণে ছিন্ন শাড়ী ও জামা তবু কি
অপরূপ তার মুখ, কি গভীর তার চোখ !

“ললিতা !”

অরিন্দমের পায়ের কাছে বসে পড়ল ললিতা, তার দু'পায়ে মূখ
লুকোল । তার সবাক যেন অদৃশ্য একটা বড়ের ধাক্কায় ঝাঁপছে ।

মুকুন্দ ইস্তকে টেনে নিয়ে একপাশে সরে গেল । প্রশমীযুগল কথা
বলুক ।

“ললিতা—মুখ তোল—”

মুখ তুলল ললিতা । তার চোখে জল । যেন পদ্মের ওপর শিশির-

বিন্দু ।

“ঐদেছ !”

ললিতা হাসল, “হ্যাঁ ।”

“কেন ?”

“আমি আজ সুখী ।”

“কেন ?”

“তুমি—তুমি কিরে এসেছ বলে । নির্ধাতন সহ্য করে, প্রলোভনকে
জয় করে তুমি সত্যকে ঘোষণা করেছ বলে—আর—”

“আর ?—”

“তুমি বীর বলে—”

“ওধু তাই ? আর কিছু নয় ?”

“হ্যাঁ—আর—”

“কি ?”

অরিন্দমের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে ললিতা হাসল, তারপর মাথা নীচু

করে অশ্রুট স্বরে বলল, “আমার প্রিয়তমকে আবার পুরোপুরি কিরে পেলাম বলে।”

আঃ। বীণা ঝঙ্কত হয়ে উঠেছে, পাখোয়াজ ঘনিত হচ্ছে, নর্তকীর দেহলাঞ্চে রক্ত-সমুদ্র আলোড়িত হচ্ছে। মণুমীর চন্দ্রদেব, আমি সুখী। বসন্তবায়ু, আমাদের প্রেমকে স্রবতির মত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও। আমি আমার নারীকে কিরে পেয়েছি, প্রহরী-ই টি—এবার আমি বার্থ হব না, এবার আমি পাহাড়কেও চুম্বার করে ফেলব—। হে মূর্খ, মদমত্ত, উদ্ভ্রান্ত নীচুপাড়া, তোমার দিন ঘনিয়ে এল, সাবধান—তোমার গগনম্পর্শী ঔদ্ধত্য একদিন তোমার আকাশচুম্বী সৌধাবলীর সঙ্গে ভেঙ্গে নীচুপাড়ার পথের ধূলোয় মিশবে, তোমার বহুদিনের সঞ্চিত পাপ একদিন তোমাকে রসাতলের অঙ্ককারে ডুবিয়ে দারবে—

ভোর থেকেই নীচুপাড়ায় চাকলা জাগল।

আহত, দুর্বল দেহ, তবু বসে থাকতে রাজী হল না অরিন্দম। মুকুন্দ আর ইন্দ্রকে নিয়ে সে নীচুপাড়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। নীচুপাড়া থেকে লোক পাঠাল সে গ্রামাঞ্চলে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ছড়াতে লাগল তাদের কথা, তাদের ডাক। কিন্তু শাসকদের শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত সেই আজবনগরেই বেশী কাজ করতে হবে।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার শুরু করল তারা। তাদের পায়ের শব্দে ইঁহুরেরা গর্তে লুকোল, ছুঁচোরা অঙ্ককারে অদৃশ্য হল, কুকুরদের ডাক এবং শিশুদের কান্না থেমে গেল। ঘরে ঘরে নারী-পুরুষে মিলে প্রাচীরপত্র লিখল।

তাদের কথা এবং প্রাচীরপত্রের কথা নীচুপাড়ার সর্বত্র এবং বিচ্ছিন্নপূর্বের গ্রামগুলোতে উত্তেজনা ছড়াল। এক হও। কালো ও সাদা

মাহুষ, সাকার-বাদী ও নিরাকারবাদী মাহুষ এক হও। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হও। গুণো, জাগো, মহত্ত্ব অর্জন করে মাহুষ হও, মাহুষ হয়ে নিজের মধ্যস্থিত ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়ে দেবতা হও। শোন, মাহুষই মাহুষের ভাগ্যান্বিত। এই সত্য। অর্ধ-সত্যকে বর্জন করো, ঘৃণা করো। শোন, কোন অদৃশ্য শক্তি নয়, মাহুষের দুঃখের জন্ত স্বার্থপর ও লোভী মাহুষেবাই দায়ী। এক হও, স্বার্থপর এবং স্বার্থপরতাকে ধ্বংস করো।

দিন গেল। রাত হল।

রাত গেল। দিন হল।

ললিতা শুশ্রূষা করে অরিন্দমের, ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে দেয় তার। তারপরই আবার বেরোবার জন্ত তৈরী হয় সবাই।

ঠিক সেই সময় ইল্ল আসে, বলে, “খবর শুনেছ?”

“কি?” অরিন্দম প্রশ্ন করে।

“তোমার নামে পরোয়ানা জারী হয়েছে—তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্ত গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

মুকুন্দ বলে, “কিছু ভেবো না, আমাদের লোকও প্রতি রাত্তায় টহল দেবে, কোন রক্ষী বা গুপ্তচর দেখলেই থবর দেবে।”

অরিন্দম বলে, “ঠিক। ভয় কি? ভাড়াতাড়ি তৈরী করো সবাইকে—ওদের অত্যাচার এবার বন্ধ করব।”

আবার গলি থেকে গলি। ঘর থেকে ঘরে।

আগুনের মত কথা ছড়ায় চারদিকে। জাগো। শোন, সত্য হৃন্দর, সত্যকে জানলে সৌন্দর্যকে জানবে, সৌন্দর্যকে জানলে প্রেমকে জানবে। প্রেমই আনন্দ ও দেবত্ব। চেয়ে দেখ, হিংসা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। ‘বীর-ভোগ্যা বহুধ্বরা’ বলে মাহুষ হিংসার ওকালতী করছে—আদিম যুগের এই অরণ্য-আইনকে বর্জন করো। উঠে দাঁড়াও, হিংসা এবং হিংসার আশ্রয়দাতাদের ধ্বংস করো।

মাহুঘেরা সাড়া দেয়। ফ্যান্টেরীর শ্রমিক, মূটে, লোহকার ও
কেরাগী।

সাড়া দেয় চাষীরা। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, এমন কি শিশুরাও সাড়
দেয়।

অন্ধ আসে, খণ্ড আসে, আসে ভিখারীরা।

তারা বলে, “আমরা তৈরী। কবে, কবে এগোবে তোমরা?”

ওরা বলে, “স্থির হও, ডাক পড়বে, শিগ্গীরই।”

দিন গেল। রাত হল।

রাত গেল। দিন হল।

ক্লান্তি নেই। আবার কাজ। চারদিকে সতর্ক চাহনি। নবজীবনের
বার্তা রটে চারদিকে। অগ্রায়কারীকে দমন করো, ধ্বংস করো। তারা
বাঘের মত হিংস্র, নিষ্ঠুর। তারা কখনো প্রেমের ভাষা বোঝে না।
তারপর? প্রত্যেকের প্রহরী প্রত্যেকে, প্রত্যেকেই নিজের প্রহরী। সুখ,
শান্তি আর সাম্যকে সবাই রক্ষা করো। প্রেম রাজত্ব করুক। চিন্তায়,
বাক্যে ও কমে সংযত হও, পৃথিবীকে সমভাবে ভোগ কর। শোন,
পৃথিবীতে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও একা কেউ বাচতে পারে না। এক হও,
নিরাপদ হও, নির্ভয় হও। তোমার জগৎ সারা পৃথিবী সঙ্গাগ থাকবে।

দিন গেল।

দিন গেল।

পরদিন স্থির হল যে নেতারা সবাই একত্রিত হবে রাতে। নীচুপাড়া
তৈরী হয়েছে—এবার কর্মহুচী ঠিক করতে হবে।

রাত নাটার পর ইন্ডের বাড়ীতে সভা বসবে। একটা জীর্ণ বাড়ীর
দোতালায় কামরাটা—এলাকাটাও নির্জন এবং নিঃশব্দ।

সময় হতেই অরিন্দম বেবোল। সঙ্গে চলল মুকুন্দ, ইন্দ্র এবং আরো চারজন যুবক। ললিতাও সঙ্গ ছাড়ল না অরিন্দমের, সে আর একদণ্ডও তাকে চোখের আড়াল করবে না।

লুকিয়ে, লুকিয়ে সন্তর্পণে তারা গলি বেয়ে চলল।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল তারা।

তাদের সামনে একটি কঙ্কালসার শবদেহ।

বাতাসে ছুর্গন্ধ।

কে যেন দূরে কাঁদছে। নারীকণ্ঠ। কে সে নারী?

অরিন্দম মুখ ঘুরিয়ে বলল, “আবার মরলাম আমি।”

ললিতা অরিন্দমের একটা হাত চেপে ধরল, বলল, “শান্ত হও—
সংগ্রামের সময় কঠিনমনা হতে হয়।”

এগিয়ে গেল তারা।

কিন্তু কান্না তো থামে না! কে কাঁদে? নীচুপাড়ার সবত্র এ কার কান্না?

আবার থমকে দাঁড়াল সবাই।

ইন্দ্র বলল, “দেখো”—

একটা দেয়ালের ওপর সরকারী ঘোষণাপত্র—তাতে অরিন্দমের ছবি।
ঘোষণা করা হয়েছে যে অরিন্দম নামক দেশদ্রোহীকে জীবিত অথবা মৃত
যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মুকুন্দ হাসল, বলল, “দামটা বড় কম বাখ করেছে সরকার।”

সবাই হাসল।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলল সেই ঘোষণাপত্র,
অভিবাদনের ভঙ্গী করে কপট সন্তোষের স্বরে বলল, “আজ্ঞে না মহামান্যবর,
পাবেন না—জীবিতও নয়, মৃতও নয়।”

সবাই হাসল, এগোল।

আর ঠিক সেই সময়ে, পার্শ্ববর্তী গলির প্রান্তদেশ থেকে একটি ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবেগে সরে গেল।

অরিন্দম বলল, “আমি তাহলে ওদের কাছে গুরুত্ব অর্জন করেছি—”

মুকুন্দ হাসল, “করবে না কেন? ওদের কান যে বাতাসের মধ্যগত আছে—তুমি যে নীচু পাড়াকে উত্তেজিত ও সংগঠিত করছ যে খবর ওরা পেয়েছে এবং তোমার যে শক্তি আছে তার প্রমাণ তো তারা আগেই পেয়েছে। তাই তোমার মত মারাত্মক শত্রুকে তারা বাঁচতে দিতে পারেনা—”

ইন্ডের বাড়ী এসে গেছে।

ওপরে গেল সবাই।

অত্যাণ্ড নেতারাও এসে পৌঁছেছে তাদের আগে।

সভা আরম্ভ হল।

টিমটিমে প্রশ্নোত্তর শিখাটাকে উদ্দেশ্য দিয়ে অরিন্দম বলতে আরম্ভ করল, “ভাইসব, বিচিত্রপুর রূপনগরকে আক্রমণ করেছে। বিমানঘান, বড় বড় আগ্নেয়াস্ত্র ও বহুরকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সৈন্যরা দিনরাত রূপনগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সৈন্য চাই—তাই সর্বত্র সৈন্য-সংগ্রহের দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নীচু পাড়াতেও তাদের মরণ-যজ্ঞের আহ্বান এসেছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তারা আমাদের বলি দেবে। তাদের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্তই আমরা স্ত্রীর ভালবাসা, জেলের ভক্তি, মাঝারি মেহে বিসর্জন দিয়ে প্রাণ দেব। চিরকাল তাই দিয়েছি আমরা—দেশের নাম করে, রাষ্ট্র রক্ষার নাম করে। কিন্তু আসল কথাটা কোনদিনই ভাবিনি আমরা। প্রাণ দিয়েও কেন আমরা মাতৃষের মত বাঁচবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি? নিজেদের স্বার্থ নিয়ে যারা অন্ধ থাকে তাদের পরের বিষয়ে ভাববার সময় কোথায়? ফলে চিরকাল আমরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অভাবে

মারা গেছি। এবারও তাই মরছি আমরা। ইতিহাস এক। কিন্তু আর না, আর মইব না আমরা।”

ছোট্ট ঘরটার উত্তেজিত দেহমনের উত্তাপ। চোখে মুখে সবাই ঘৃণা আর জালা আর শপথ।

অবিস্ময় বলে চলল। সব ঠিক। সবাই তৈরী। এই উপযুক্ত সময়। লাল লোহাকে রূপ দাও। আর তিনদিন পরে, আমরা দলবদ্ধ হয়ে উঁচুপাড়ার দিকে অগ্রসর হব, পরস্বাপহারী দস্যুদের ভোগের রাজত্ব আমরা দূর করব। সত্য আমাদের সহায়, সত্যই আমাদের একতাবদ্ধ করবে, আমাদের ঐক্যকে অটুট রাখবে। আগুন ও লোহার তৈরী অস্ত্র না থাকলেও আমাদের অস্ত্র আছে—ঘৃণা ও সত্য। আমরা এগোব, ওরা ওদের মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আমাদের বত দায়বে? যদি মারে তো মরব। মৃত্যু পরাজয় নয়! বেঁচে থেকে দামত্ব স্বীকার করাই মৃত্যু। যে যে ভাবে পারবে লড়াই কর। যে সত্যকে জানে তার মৃত্যুভয় থাকে না। যার মৃত্যুভয় থাকে না সে অসুধারণ না করেও সংগ্রাম করতে পারে। এমন বীরেরাই পৃথিবীকে দেবভূমি করতে পারবে। কিন্তু যে সত্যকে পূর্ণভাবে জানেনি তাকে অসুধারণ করতে হবে। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা ভালো। আর অহিংসা মানে শত্রুকে ক্ষমা করা নয়! অত্যাচারে যখন অত্যাচারীর আত্মা হয়ে দাঁড়ায় তখন সে বাধের মতই ভয়ঙ্কর—তখন তাকে ক্ষমা করাই পাপ। যে ভালবাসতে পারে সেই অহিংস হৃদয়েও সংগ্রাম করতে পারে, নিঃশঙ্কে প্রাণ বলি দিয়ে শত্রু মনে ভীতি উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে তেমন কখন আছে? স্বার্থপরদের সৃষ্ট এই সমাজ-ব্যবস্থা প্রেমের শত্রু বলেই মানুষ ভালবাসার চেয়ে ঘৃণাই করে বেশী। এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিচালকরা মুখে বলে যে চুরী করা পাপ, মিথ্যে কথা বলো না, হিংসা করো না কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা ঠিক বিপরীত কাজ করে কারণ পরকে বঞ্চিত না করলে একজন আর একজনের চেয়ে বেশী ভোগ করতে

পারে না। আর তাদের ভোগ দর্শনেই সাধারণ মানুষের চেতনা আদি-
তার স্তরে নামতে প্রলুব্ধ হয় এবং তারাও মনে মনে নতুন নীতি-বাক্য
চিনা করে যে চুরি করাই পুণ্য, সন্ন্যাসি মধ্য কথ্য বলবে, অহিংসায় ফল
নাই। স্বতরাং যে ভাবেই হোক, যে সব শত্রুরা এই ব্যবহার প্রবর্তন
করেছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের চেষ্টা করেছে, তাদের ধ্বংস করতে হবে। বিষ-
বৃক্ষের কাণ্ড ছেদন করলেও শিকড় থেকে নতুন কাণ্ড নির্গত হবে।
স্বতরাং হিংসা অহিংসার প্রশ্ন তুলো না। বল কার ভয় হচ্ছে? যে
ভীক, সে সরে দাঁড়াও। ভেবো না যে তুমি পরের জন্ত সংগ্রামের মহৎ
ব্রত নিয়েছ—শোন, ব্রত তোমার নিজেরই জন্ত। ভেবো না যে এ সংগ্রাম
শুধু নিজের জন্ত, শোন—এ সংগ্রাম তোমাকে সবারই জন্ত করতে হবে।

অরিন্দম খামল।

সবাই একে একে বলল, “তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য অরিন্দম—
আমরা রাজী, আর তিনদিন পর আমরা প্রাণকে পণ করে এগোব।”

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “মাঝারি পাড়ার বাবুদের না আজ আসার কথা
ছিল?”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “ছিল, তারা আসেনি এবং তারা এখন আগবেও
না অরিন্দম—তারা ফলাফল দেখেই লড়াইয়ে ঝাঁপাবে, তার আগে
নয়।”

অরিন্দম হাসল, “কতটুকুই বা পাড়া তা? তাদের কর্তাদের বুদ্ধি
থাকলেও তাদের জন্ত আপনাদের সংগ্রাম পেছিয়ে থাকবে না। তাহলে
কি স্থির হল? তিনদিন”—

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই বাইরে থেকে চীংকার কোলাহল
ও আতঁনাদ ভেসে এল। নীচের গলিতে অনেকগুলো ভারী জুতোর খট
খট শব্দ ধ্বনিত হল।

“কি হল?”

“কিসের শব্দ?”

সবাই সচকিত হয়ে উঠল।

একটি যুবক ছুটে এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, “শিগ্গীর পালাতে হবে। রক্ষী ও সৈন্তরা পূর্বদিক ছাড়া নীচুপাড়ার তিনদিক ঘেরাও করছে, ঘরে ঘরে তারা অহুসঙ্কান করছে অরিন্দমের—”

থট থট—থট থট—থট থট—

এক ফুঁয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল বলিতা, অন্ধকারে সে অরিন্দমের হাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরল। আঃ—বিপদও এমনও মধুর! মাহুঘের জীবন কি অপরূপ!

ইন্দ্র বলল, “এইদিকে বেরিয়ে এসো তোমরা—এইদিকে”—

চাঁদের আলো ঘরে ঢুকেছিল, সেই আলোতেই ঠাহর করে সবাই ইন্দ্রের অন্তসরণ করল। বাড়ীটার ছাদে গিয়ে পৌছোল সবাই।

ইন্দ্র বলল, “আমি সব সময়েই তৈরী ছিলাম—তাই আগে থাকতেই পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি”—

বাড়ীর ছাদ ও পাশের বাড়ীর ছাদের সঙ্গে একটা সেতু তৈরী করেছে ইন্দ্র। বাশের তৈরী। তারি ওপর দিয়ে সমুদ্রপথে একে একে পার হ'ল সবাই, পার হয়ে সেতুটা টেনে নিল। দ্বিতীয় বাড়ী থেকে তৃতীয় বাড়ীতেও একই ভাবে গেল তারা। নীচুপাড়ার ভেতর থেকে আতনাদ ও কোলাহলের রেশটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসতে লাগল। কাছাকাছি কোথায় যেন বাড়ীঘরের জানালা দরজা ভাঙছে রক্ষীরা।

তৃতীয় বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে একটা মাঠে নামল তারা।

মাঠের পর অন্ধকার গলির গোলক-ধাঁধার ভেতর দিয়ে তারা পাহাড়ের দিকে পা 'বাড়াল।

সেদিকটা নির্জন, জঙ্গলাকীর্ণ।

মুহুন্দ বলল, “এতক্ষণে আমরা কিছুটা নিরাপদ হলাম।”

সামনের পাহাড়টাতে তারা উঠল। কঠিন প্রস্তর আর মাটির

পাহাড়। তার ওপর শাল, সরল, মহুয়া এবং পলাশের জঙ্গল, লতাগুল্ম-
ও নামহীন আগাছার কোপে নিবিড় হয়ে আছে। এত নিবিড় যে
বাদশীর চন্দ্রদেবও সেখানকার অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেননি।

ললিতার হাত চোপে ধরে অরিন্দম মুহূর্তে প্রশ্ন করল, “কষ্ট হচ্ছে
ললিতা?”

ললিতা হাসল, অন্ধকারেও তার হাসির দীপ্তি দেখা গেল। সে একটি
মাত্র কথা বলল, “না।”

মুকুন্দ আগে ছিল, সবাইকে সতর্ক করে বলল, “সাবধানে চল, পাহাড়ে
বন্য জন্তুর অভাব নেই”—

পা কটল, কাঁটা ও ঝোপঝাড় লেগে দেহ ক্ষতবিক্ষত হল, ছিন্ন
পরিধেয় আরো ছিন্ন হল। তবু থামল না তারা। অবশেষে প্রায় ঘণ্টা
খানেক পরিশ্রম করে তারা পাহাড়ের চূড়ার একটু ফাঁকা জায়গায়
গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে একটা অর্ধ-ভগ্ন ইঁটের বাড়ী পড়ে আছে।

মুকুন্দ বসে পড়ল, বলল, “আঃ—বাঁচলাম”—

ললিতা বলল, “কিছু ওদিকে তাকিয়ে দেখ দাদা—ওই পশ্চিম
দিকে—”

সবাই তাকাল। পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা গেল যে নীচেকার
সমতল ভূমির পশ্চিম দিকে কয়েকটা জায়গায় দাউ দাউ করে আগুন
জ্বলছে। মনে হল যেন কয়েকটা আগ্নেয় অঙ্গুর জ্বল্ মেলে বাতাসকে
লেহন করছে।

“কোথায় জ্বলছে ঐ আগুন?” ইঙ্গ প্রশ্ন করল।

অরিন্দম কঠিন হয়ে বলল, “কোথায় আবার? নীচু পাড়ায়।”

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ”।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই দাঁতে দাঁত ঘষল। নিঃশব্দে সবাই
বসে রইল। সময় কাটতে লাগল।

ক্রমে নীচু পাড়ার আগুন নিভে গেল।

সুপ্রভাতের চন্দ্রদেব মধ্যগগন অতিক্রম করে যেন পশ্চিমের অগ্নিকাণ্ড দেখার জন্ত কোঁতুলী হয়ে উঠলেন। শালবন থেকে শব্বরের ডাক-মেশানো বিল্লীরব ভেসে এল, এল আরো নানা জানোয়ারের নৈশ-চীৎকার। আর ললিতার মুখ কি হৃন্দর দেখাচ্ছে!

মুকুন্দ বলল, “অরিন্দম শোন”—

অরিন্দমের চমক ভাঙ্গল, “বল”—

মুকুন্দ বলল, “নীচুপাড়ায় যেভাবে ওরা তোমার খোঁজ করছে তাতে তোমার এখন এখানেই এক আধদিন কাটানো উচিত।”

অরিন্দম দৃঢ়কণ্ঠে বলল, “কিন্তু সংগ্রাম? তিনদিন বাদে যে আমাদের দল বেঁধে বেরোতে হবে?”

মুকুন্দ অরিন্দমের কণ্ঠে আবেগ লক্ষ্য করে হাসল, বলল, “বেরোবে বইকি—সেই ব্যবস্থা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্তই তোমাকে এখানে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা ফিরে গিয়ে সবাইকে সেই দিনের কথা বলে দিই, রক্ষীদের অত্যাচারেও তারা যাতে ভয় না পায় তার জন্ত তাদের সাহস জোগাইগে”—

“হু”—অরিন্দম ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, “আচ্ছা। কিন্তু নিজস্ব থেকে তো আমি শান্তি পাবনা মুকুন্দ।”

মুকুন্দ বলল, “না পেলো। তোমার দেহের জন্ত অন্ততঃ একটু বিশ্রাম তো পাবে। শোন, সকালেই লোক পাঠাব আমরা—তোমাকে খাবার দিয়ে বাবে সে।”

“হু”—

“ওদিকে রক্ষীদের অত্যাচার কমলেই তোমাকে ফিরে যাবার জন্ত খবর দেব আমরা। আর যদি তোমার খোঁজে তারা এদিকে অগ্রসর হয় তাহলে আমরা উচুপাড়ার দক্ষিণদিককার ঐ চন্দ্রচূড় পাহাড়ের চূড়োয় আশ্রয় নেবে নংকেতু জানাব।”

“চক্ৰচূড় পাহাড়ের চূড়ো কোনটি ?”

“ঐ যে—অৰ্ধচক্ৰের মত বাকী যে পাহাড়টির চূড়ো দেখতে পাচ্ছ—”

অরিন্দম তাৎপাল। হ্যাঁ, চক্ৰালোকে পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
চারটে পর্বত-চূড়ার পরেই তা।

মাথা নেড়ে সে বলল, “হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি।”

“তাহলে আমরা যাই ?”

“এসো।”

ইন্দ্র জামার ভেতর থেকে হঠাৎ একটা ছোরা টেনে বের করল,
অরিন্দমের হাতে দিয়ে বলল, “এটা রাখো—পাহাড়ে জঙ্গল জানোয়ার
আছে, বলা তো যায় না”—

“দাও”—

“আর ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটাতে গিয়ে রাত কাটাও—ওর মধ্যে একটা ঘরে
এখনো খাবার আছে—এই অঞ্চলের ‘কাঠুরেরা’ জিরিয়ে জিরিয়ে সেটাকে
বাসযোগ্য করে রেখেছে”—

“হুঁ”—

“আমরা চললাম—সাবধানে থেকো।” মুকুন্দ আবার বলল।

অরিন্দম জবাব দিল না শুধু ললিতা’র দিকে একবার তাকাল।
ললিতার গোখে ব্যাকুলতা।

মুকুন্দ ডাকল, “চল ললিতা”—

ক্ষীণকণ্ঠে ললিতা সাড়া দিল—“চল।”

হতাশ দৃষ্টিতে অরিন্দম দেখল যে মুকুন্দ, ইন্দ্র এবং অজ্ঞাত লোকদের
সঙ্গে ললিতাও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আর কি আশ্চর্য! ললিতা
আর একবারও ফিরে তাকাল না।

শালবনের মধ্যে ওরা সবাই অদৃশ হরে গেল।

একা।

চাঁদের আলোতে অস্ফুট দেখাচ্ছে পাহাড়গুলোকে। রহস্যময়।

আকাশের বৃকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ—চাঁদের আলোতে স্থান করে তা যেন শুভ্রতর হয়েছে ।

দূরে আজবনগরকে দেখা যাচ্ছে । খেলাঘরের মত ছোট দেখাচ্ছে বাড়ীঘরগুলোকে, জোনা কীর মত জলছে সেখানকার বাতি ।

আজবনগরের ওপর, পাহাড়ের ওপর হালকা কুয়াশা । চন্দ্রালোকে সেই কুয়াশা যেন একটা অবাস্তব পরিবেশের জাল ছড়িয়েছে সমস্ত কিছুর ওপর ।

সে একা ।

পাহাড়ের ওপরে একটু শীতবোধ হয় ।

শালবনে পাতা ঝরেছে একটার পর একটা । দক্ষিণের হাওয়ায় সেখানে মর্মরধ্বনি উঠেছে । হাওয়ায় ভাসছে মহুয়া আর ভুঁইচাঁপার সুবাস । মাঝে মাঝে হরিণের ডাক ভেসে আসছে, ভেসে আসছে নানা পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর বনকুক্কটের ডাক । পাহাড়ের বৃকে কোথায় যেন একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—তার শিলা থেকে শিলাস্তরে আছড়ে পড়ার একটানা আওয়াজটা ভারী অদ্ভুত লাগছে, শুনতে শুনতে চেতনা স্তিমিত হতে চায়, হুঁচোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে ।

মনে পড়ে । এমনি পাহাড় সেখানে, এমনি শালবন । অদৃশ্য ঐ ঝরণার মত রূপসী নদীর জলকল্লোল । সেখানেও হরিণ ডাকে, শালবনে মর্মরধ্বনি জাগে, টুপ্‌টাপ্‌ পাতা ঝরে । আর এই পাহাড়ের ঐ ভাঙ্গা ইটের বাড়ীটার মতই সেই প্রাচীন পাষাণগৃহ । তারি একটা কক্ষে, মণি-মাণিক্যের উজ্জল আলোর মাঝে, সেই স্তিমিতচক্ষু বীণকার তার সঙ্গীত বীণাকে মুখর করেছে । তার পাংলা পাংলা আঙ্গুলের আঘাতে যেন তারের বৃক থেকে ললিত রাগিনী নিংড়ে বেরোচ্ছে আর সেই সুরের মুহূর্তেই যেন চন্দ্রালোকিত রাত্রি গলে গলে কুয়াশা হয়ে শেষ হচ্ছে ।

সে একা ।

“কি করছ ?”

বিজ্ঞাণেগে ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। না, সে একা নয়।

“তুমি-!”

ললিতা হাসল, মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ। ফিরে এলাম।”

গভীর আনন্দে হৃদয় প্রাণিত হল, একপা এগিয়ে, হৃহাত বাড়িয়ে
অরিন্দম ডাকল, “এসো—এসো—”

ললিতা এগিয়ে এল। তার চোখে জ্যোৎস্না, মুখে জ্যোৎস্না, সর্বদেহে
জ্যোৎস্না—যেন সে জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া একটা স্বপ্ন।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে তারা সূর্যোদয় দেখল। পূর্বাচল থেকে
সূর্যদেবের স্বর্ণমুকুট ঝিকমিক করে উঠল, ধ্যানী ঋষিদের মত নিশ্চল-
দেহ ও অরণ্যাবৃত পাহাড়ের ওপর তাঁর রাঙা আলোর আশীর্বাদ ছড়িয়ে
পড়ল। শাল পলাশ আর মহয়ার বনে পাখীর দল কঁলরব করে উঠল।

সূর্যদেব ওপরে উঠতে লাগলেন। রোদের তেজও ক্রমে প্রখর হয়ে
উঠল।

কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক এল নীচুপাড়া থেকে। তার হাতে
হুঁবেলার মত খাবার, একটি মোমবাতি ও দেশলাই।

ছেলেটির মুখে চোখে শঙ্কার ছায়া।

অরিন্দম প্রশ্ন করল, “খবর ভালো তো?”

যুবকটি মাথা নাড়ল, “আমাদের খবর ভালো কিন্তু নীচুপাড়ার অস্ত
খবর খুব খারাপ—”

“কেন?”

“কাল রক্ষী ও সৈন্তরা সেখানে ভয়াবহ অত্যাচার করেছে—”

“কি করেছে ?”

“গুলি করে তারা প্রায় পঞ্চাশজনকে মেরেছে, দুশো লোককে গ্রেপ্তার করেছে এবং তিরিশজন নারীর ওপর বলাৎকার করেছে—”

“অবিন্দম মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, অত্যাচারীর ইতিহাস চিরকাল এক।”

“আমি তবে বাই ?”

“বাও।”

যুবকটি চলে গেল।

ললিতা কাছে এসে বলল, “বেলা যে বাড়ছে, এখন তো আর বোদে টিকতে পারবে না—”

“হু—”

“চলনা—ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটার ভেতরে বাই—”

“চল।”

ভাঙ্গা বাড়ীটার চারদিকে নিবিড় ঝোপ।

“বনফুল, কাঁটা বৈচী আর বনকরকার ঝোপ। তার পেছনে কয়েকটা ঘন-সন্নিবিষ্ট মহুয়ার গাছ। অজস্র নতুন পাতায় স্নিগ্ধ-শ্যাম, থলো থলো ফুল আর ফলে অলংকৃতা রূপসী।

ঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা সংকীর্ণ চলায় পথ গিয়ে বাড়ীটাতে শেষ হয়েছে। একটা পোড়ো ইঁটের বাড়ী। হয়ত এককালে তিনচারটে ঘর ছিল, এখন মাত্র একটি ঘর টিকে আছে। কবে কোন প্রকৃতি-বিলাসী নির্জনতা-প্রিয় লোক যে ওটি নির্মাণ করেছিল তা কে জানে ?

ঘরের দেয়াল থেকে অর্থের চারা বেরিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে এক আধদিন পাহাড়টা হয়ত কেঁপেছিল তারই স্মৃতি বিসর্পল ফাটলের রেখায় লিখিত আছে। ছাদের অর্ধেকটা ভাঙ্গা, জানালার শুধু গহ্বরটিই অবশিষ্ট। সেই সব রক্তপথ দিয়ে শীতশেষের শুকনো পাতা ভেতরে উড়ে

এসেছে, ঘরের অসমান মেঝের ওপর জমা হয়ে তা পূর্ণ গালিচা তৈরী করেছে।

সেই শুকনো পাতার বিছানার ওপর ললিতা বলে পড়ল, চারদিক ভালো করে দেখে সে একটু হেসে বলল, “আমাদের প্রথম ঘর—”

অরিন্দম বলল, হাসল, বলল, “হ্যাঁ, আমাদের প্রথম সংসার—”

“সংসার!” ললিতা উচ্চারণ করল।

অরিন্দম মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ। ভাঙ্গা ঘর, মাথার ওপরে আকাশের ছায়া, চন্দ্র সূর্যের আলো আর অনিশ্চিত জীবন নিয়ে আমাদের ঘর-সংসার—”

ললিতা কথা বলল না, তার হুঁচোখের অন্তহীন গভীরতায় শুধু একটা বিচিত্র আলো দেখা গেল। নিঃশব্দে সে একখানা হাত রাখল অরিন্দমের হাতের ওপর।

অরিন্দম ললিতার হাতটা চেপে ধরল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “এমন আনন্দের দিন আমি করনাও করিনি। পাহাড়ের চূড়ায়, সংগ্রামের মধ্যে তোমাকে আমি আজ পেয়েছি।” ললিতার চোখের গভীরতায় তার দৃষ্টি বেন ডুব দিল।

তুচ্ছতা।

পরস্পরের দিকে মগ্নমগ্নের মত তাকিয়ে রইল দুজনে।

অরিন্দম কম্পিতকণ্ঠে বলল, “সূর্য সাক্ষী—তুমি আজ থেকে আমার বো—”

ললিতা কেঁপে উঠল, বলল, “সূর্যদেব সাক্ষী—আজ থেকে তুমি আমার স্বামী—”

তুচ্ছতা।

কেবল দক্ষিণের বায়ুবেগে শালবনের অশ্রান্ত মর্মরধ্বনি। কেবল পাখীদের কাকলি, ময়ূরের কেকাধ্বনি, হরিণের ডাক আর পার্বত্য স্বরগার কল্কল শব্দ।

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে সূর্যদেব আরো ওপরে উঠলেন।

হঠাৎ এক সময়ে অরিন্দম সেই ভাঙ্গা ঘরের স্তম্ভতা ভেঙ্গে বলল,
“নীচুপাড়ার খবর শুনলে?”

ললিতা মাথা নাড়ল, “শুনলাম। কি আর এমন নতুন খবর?
ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ওরকম খবর কতবার শুনেছি।”

অরিন্দমের মুখে কাঠিঘের অঙ্ককার নামল, দৃঢ়কণ্ঠে সে বলল, “কিন্তু
আর দু’দিন পর আমরা ইতিহাসকে নতুন পথে নিয়ে যাব।”

“পারবে?”

“সন্দেহ কেন ললিতা?”

“কি জানি—ভয় হয়—” ললিতার গলা কেঁপে উঠল, তার কথাগুলোর
ভেতর দিয়ে একটা হুচীমুখ জ্বালাকে টের পাওয়া গেল। সে বলল,
“অভাব, মৃত্যু কি কন ঘটছে? এক পা এগোলেই তো রাস্তায় মরা
মানুষ ডিকোতে হয়। না খেয়ে শিশুরা শুকিয়ে মারা যায়, বুড়োরা গলায়
দড়ি দেয়, যুবকেরা বিদ্রোহ করে মরে। কিন্তু কৈ? আজো পর্যন্ত
কিছুই তো হল না।”

অরিন্দমের শরীরে উত্তাপের তরঙ্গ ছড়াল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে
বলল, “হবে! মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো ললিতা। তোমার দুঃখ
আমার দুঃখ এখন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের দুঃখ হয়েছে—এবার
দুঃখ দূর হবে। ললিতা, মানুষই প্রকৃতির সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব—
তার বুদ্ধি এবার তাকে নিজেকে লক্ষ্য করতে বাধ্য করেছে—এবার
পরিবর্তন হবে।”

“কিন্তু আগে তো—”

“আগেও হয়েছে ললিতা—। মানুষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে নতুন করে
দেখছে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছে। প্রতিদিনই বুদ্ধি বাড়ছে
তার—ফলে, যেমন সমস্তা বাড়ছে তেমনি তার প্রতিকারও হচ্ছে।
ললিতা, নিশ্চিন্ত হও।”

“তারপর ? মানুষের ভবিষ্যৎ।”

“শান্তি, সুখ, শাস্তি, আনন্দ।”

“তারপর?”

“মানুষ দেবতা হবে।”

“তারপর?”

“তারপর তো আর বলা যায় না। মানুষ প্রতির বৃকে থাকে।”

স্বপ্নতা।

একটা দার্কর্ক খরগোশ ঘরের কাছাকাছি এসে মুহূর্তের জন্ত অবাক হয়ে রইল তাদের দেখে, তারপর চকিতে অদৃশ্য হল।

হরিয়ালের ডাক ভেসে আসছে।

সূর্যদেব আরো ওপরে আরোহণ করলেন।

ললিতা বলল, “এবার একটু ভাবনা চিন্তা বিসর্জন দাও—”

“কেন?”

“তোমার ক্ষিদে পারানি?”

“পেয়েছে বইকি। সংগ্রাম তো তারি জন্ত।”

“তাহলে খাও।”

“দাও।”

দু’জনে খেল। রাতের জন্ত কিছুটা খাবার তারা ঢেকে রেখে দিল।

ললিতা বলল, “কিন্তু জল কোথায় পাবে?”

অরিন্দম হাসলো, “মুখ মেয়ে, জলের ডাক কি শুনতে পাচ্ছ না?”

“ঠিক—তাহলে চল।”

ছুটে বেরোল ললিতা। অরিন্দম তার অনুসরণ করল।

শব্দ অনুসরণ করে বরগাতে গিয়ে পৌছোল তারা। চূড়ার বিপরীত দিকে তা। ভাঙ্গা বাড়িটার পেছনে, মর্মারিত শালবনের নিভৃত ছায়া অতিক্রম করে কিছুদূর গেলে পর বরগাটাকে পাওয়া গেল। নির্মল স্বচ্ছ, হুঁশতল জলের ধারা। গলিতস্থীরকের মত। একটা শিলাখণ্ডে

ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত নীচেকার আর একটা শিলাখণ্ডের ওপর তা সবগে আছড়ে পড়ছে। যেখানটায় পড়ছে সেখানে পাহাড় কয় হয়ে একটা অতিক্রম জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে, তারপর সেখান থেকে লাফিয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে চলে গেছে ঝরণাটা।

সেই ঝরণার জল অঞ্জলি ভরে পান করল দুজনে।

আর পান করতে গিয়ে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখল তারা জলের ভেতর।

অরিন্দম বলল, “তুমি সুন্দর ললিতা—”

ললিতা হাসল, “ভাগ্যিস্ ঝরণাটা ছিল।”

দুজনে হাসল।

হাসতে হাসতে আবার জলের দিকে তাকাল অরিন্দম, হঠাৎ হাসি ধামিয়ে বলল, “আশ্চর্য!”

ললিতা প্রশ্ন করল, “কি?”

“তোমার কথাই সত্যি।”

“কোন কথা?”

“একদিন তুমি বলেছিলে যে শক্তি আমার মুখে কালো ছায়া ফেলেছে। বিশ্বাস হয়নি কিন্তু বাড়ী ফিরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ—আজ তো আর ভয় হচ্ছে না?”

“আজ তুমি সুন্দর—তোমার মুখে আজ দুঃখ আর সত্যের জ্যোতি।”

স্বকথা।

হঠাৎ খচ্চমচ্চ পাতার শব্দে তারা পেছন ফিরে তাকাল।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে একটা হরিণ। ডাগর ডাগর দুটি নিম্পলক চোখ মেলে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছে তাদের।

“হরিণ!” ললিতার চোখও সেই হরিণের চোখের মত হয়ে উঠল।

আর হরিণটা সেই শব্দে সচকিত হয়ে একটা লাফ দিল।

মূহূর্তকালের জন্ত তার আঁকাবাঁকা শিং আর পা শূন্যের মধ্যে দেখা
গেল, তারপর সে অদৃশ্য হল।

অরিন্দম বলল, “তোমার হরিণ পালিয়েছে কিন্তু আমার হরিণ
পালায়নি।”

ললিতা হাসল, “তাহলে পালাই?”

ছুটে ওপরে উঠতে গিয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, বলল, দাঁড়াও—”

“কি?”

“তোমার ক্ষত ধুয়ে দিই।”

“দরকার নেই।”

“আছে—আমি জানি।”

ললিতা জল দিয়ে অরিন্দমের ক্ষত পরিষ্কার করে আবার বেঁধে
দিল। তার সেই পরিচর্যা-রত সপ্রেম মুখটি লক্ষ্য করতে করতে
অরিন্দমের কৃক ভরে উঠল।

“এবার চল।”

“চল।”

ভাঙ্গা ঘরটার পাশে, একটা পলাশ গাছের তলায় তারা বসল।

ললিতা বলল, “একটু ঘুমিয়ে নাও। রাতে ঘুমোবার সুযোগ যদি না
ঘটে?”

অরিন্দম মাথা ঝাকাল, “না।”

“কেন?”

“তোমাকে যে তাহলে দেখতে পাব না?”

“তাতে কি! আমি তো দেখতে পাব।”

অরিন্দম হাসল, বলল, “ঘুমোচ্ছি।”

কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। দূরে ধূসর পাহাড়ের সারি আর চারদিকে
বসন্তের নবীন শোভা। গাঢ় সবুজ নতুন পাতা গজিয়েছে গাছপালায়।
চারদিকে নব-জীবন। এখানে ওখানে অজস্র নাম-না-জানা বনফুল আর

তার মৃগসন্ধি। জায়গায় জায়গায় পত্রহীন গাছগুলো পদাভিকের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে। কোথাও লতার গায়ে ঢুলছে শুবকে শুবকে কুল। বিচিত্র-বর্ণ প্রজাপতিরা তার ওপর বসে পাখনা নাচাচ্ছে। নিকটে ও দূরে সবুজ পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পলাশের রক্তশোভা। মহুয়া গাছের নীচে অজস্র শুভ্র ফুলের রাশি, তার তীর গন্ধে বাতাস আকুল। আর শালবনে—পাতা ঝরছে, পাতা ঝরছে, পাতা ঝরছে। পাতা-ঝরার দিন এসেছে। ঝরুক, শুকনো, জীর্ণ, হলদে পাতা সব করে পড়ুক, বাতাসে উড়ে থাক, নবজীবন শ্রামশোভায় ঝলমল করুক।

“ঘুমোচ্ছ না?”

“ঘুমোচ্ছি বইকি—কিছু মাথায় দেব কি?”

“এই বুঝি তোমার বীরত্বের নমুনা? বালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারো না?”

“না।”

“কিন্তু কোথায় পাব বালিশ?”

“ভাহলে তোমার কোলে মাথা রাখি।”

“তুমি তুই।”

“তা বলতে পারো।”

ললিতার কোলে মাথা রেখে অরিন্দম চোখ বুজল। আঃ—কী আশ্চর্য অস্থিভূতি! পাখীর কুজন, ফুরফুরে হাওয়া, পলাশের ছায়া আর ললিতার স্পর্শ—ঘুম না এসে কি পারে?

সময় কাটে।

মধ্য-গগন থেকে পশ্চিমাকাশে অবরোহণ শুরু করলেন সূর্যদেব। জনমে তার আলোর প্রার্থ্য কমে এলো, শালবন আর অরণ্যের ছায়া গাঢ়তর হল, অপরাহ্নের স্নান আলো নামল পাহাড়ের সাহুদেশে আর আজব-নগরের ওপরে। আর আকাশের বুকে নিকুদেশবাসী মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাখীর দল উড়ে চলল।

অরিন্দমের ঘুম ভাঙল।

কিছু কোথায় ? ললিতা কোথায় গেল ?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অরিন্দম, ডাকল, “ললিতা”—

কিছু কোন সাড়া এল না।

“ললিতা”—

না, কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ভাঙ্গা বাড়ীটার ভেতরে গেল অরিন্দম। না, সেখানেও নেই ললিতা।
তবে ? কোথায় গেল সে ? অরিন্দমের সর্বাঙ্গ যেন মুহূর্তে হিম হয়ে
গেল।

একটু ভাবল সে, তারপর ঝরগাটার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

তখন বাতাস ধেমে গেছে। চারদিকে একটা অসহ্য গুমোট।
একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। শালবনের ভেতরেও একটা ধমধমে
শব্দ। কেবল থেকে থেকে পাখীদের ডাক শোনা যাচ্ছে। শোনা
যাচ্ছে পায়ের তলায় শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ।

ঝরগাটার কাছে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে অরিন্দম ধমকে
নাড়াল। আশ্চর্য একটি ছবি তার সামনে ! ঝরনার জলের সেই অগভীর
সকরের মধ্যে ললিতা নগদেহে নান করছে। তার ছিন্ন শাড়ী ও জামা
একটা শুকনো শিগার ওপর রাখা আছে।

অরিন্দমের চোখে যেন স্বপ্ন ঘনাল। কী আশ্চর্য সুন্দর ললিতার
দেহ ! যেন সে নিখুঁত ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন, যেন সে কোন মর্য়-
খোদিত দেবীমূর্তি। চোখের তারায় যা কিছু ভালো বলে মনে হয় তা
থেকে নিংড়ে নিংড়ে যেন ললিতার দেহবল্লরী রচিত হয়েছে। ফুল, পাখী,
আকাশ, মেঘ, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র আর মৃত্তিকা থেকে যেন তিল তিল
আহরণ করেই এই তিলোত্তমার স্রষ্টি হয়েছে। নিঃশব্দে, নিকরনিঃশব্দে
অরিন্দম লক্ষ্য করতে লাগল। ললিতা জল থেকে উঠল, তার সুদীর্ঘ,
সিস্ত, কেশরাশিকে নিংড়ে নিংড়ে শুকোল, দেহ মুহল, শাড়ী ও জামা
পরল, তারপর ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। শেষ অপরাহ্নের

রাঙা আলোতে ধোঁয়া ফুলের মত ঝকঝক করছে তার মুখটি, পিঠের ওপর আলুশারিত হয়ে আছে তার কেশের অরণ্য।

অরিন্দম দেখল। দেখতে দেখতে তার সারা দেহমন যেন একটা ঝড়ের দোলায় মর্ম্মরিত হয়ে উঠল। একটা আবুল তুফা যেন বিজ্যেগে ছাড়িয়ে গেল তার চেতনায়, তার প্রতি রোমকূপে।

হঠাৎ ললিতা তাকে দেখতে পেল।

“তুমি!” সে যেন চমকে উঠল।

“হ্যাঁ।”

“গাছে হেলান দিয়ে ওখানে কি করছিলে?”

অরিন্দম ললিতার দিকে এগোতে এগোতে বলল, “তোমাকে দেখছিলাম—তুমি চান করছিলে”—

ললিতার মুখে লজ্জার রক্তিম আভাস দেখা দিল, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, “তুমি চোর”—

অরিন্দমের চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, কাছে এসে হঠাৎ সে ললিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। সে বলল, “আমি চোর নই—ডাকাত।”

“ছাড়ো”—

“না।”

“পাগলামী করোনা লক্ষ্মীটি”—

“না।”

ললিতা আর কথা বলল না, অরিন্দমের বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সে হুঁচোখ বুজল। অরিন্দম তাকে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল। ললিতা যেন একরাশ পাখীর পালক।

সূর্যমুখের রথের ঢাকা তখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যাচ্ছে। বাতাস নেই, নিঃস্প গাছপালায় ঢাকা পাহাড়গুলো যেন কিসের প্রতীক্ষায় মৌন ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। একটা অশ্রু স্তমোট। বোধ হয় ঝড় উঠবে।

সেই ভাঙ্গা বাড়ীর ঘরটায় গিয়ে অরিন্দম ললিতাকে সেই শুকনো

শান্তার শব্দাতে বসিয়ে দিল, দুটি তৃষ্ণার্ত চোখের নিম্পলক, প্রাণীপ্ত দুটি মেলে সে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য একটা তৃষ্ণায় দেহমন তার আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

ঘাড় বেকিয়ে তাকে দেখল ললিতা, মুহু গলায় প্রশ্ন করল, “তোমার কি হল?”

“আমি পাগল হয়েছি।”

“কেন?”

“তুমি সুন্দর”—

ললিতা জবাব দিল না, মাথা নত করল।

“শুনছ—ললিতা”—

“ঐ?”

“তুমি এত সুন্দর কেন?”

ললিতা মুখ তুলে তাকাল অরিন্দমের দিকে। তার মুখে গোদুগীর অপক্কণ আলো। সেই আলোতে তাকে মৃত্তিকার জীব বলে মনে হল না, অপাণ্ডিত্ব একটা বহন যেন তার দু’চোখের বাষ্প-বন দৃষ্টিতে জলজল করতে লাগল, আর ধরধর করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট দুটো।

“ললিতা”—

“অন্ধকার হোল, বাতিটা জলি?”

“জ্বালো ”

মোমবাতিটাকে জ্বালাল ললিতা, তারপর আড়নমনে তাকিয়ে দেখল যে অরিন্দম একইভাবে নিরীক্ষণ করছে তাকে। নতদৃষ্টিতে সে চূপ করে বসে ঘামতে লাগল। লজ্জায়, পুলকে।

অরিন্দম লক্ষ্য করতে লাগল। তার সেই তৃষ্ণা এবার অন্তর্দাহী হয়ে উঠেছে। ললিতা কি সুন্দর! অরণ্যের মত কেশপাশ, অর্ধচন্দ্রের মত ললাট, উড়ন্ত বাজের ডানার মত একজোড়া ভুরু আর অমৃতলোকের রহস্য-ভরা একজোড়া ভ্রমর-কালো চোখ। প্রবালের মত রক্তিম দুটি

টোটার ওপরে ও নীচে, বাঁশীর মত নাসাগ্রে তার প্রেম আর লজ্জার
মুক্তাবিন্দু। আর কি দেখবে সে? বরণার জলের মাঝে তার বে
দেহকাস্তি সে দেখেছে তার কি তুলনা আছে? কিন্তু শুধু তাই তো
ললিতা নয়, সে তো শুধু দেহ নয়। আরো কিছু, আরো কিছু। স্নেহ,
বদ্দ, ত্যাগ, আদর্শ। প্রেম আর নির্ভীক ভালবাসা সব কিছু মিলিয়ে
ললিতা। তাছাড়াও আরো কিছু—তা দেখা যায় না, তা শুধু অনুভব
করে জানা যায়। সেই রূপ অনুভব করলে মানুষ পাগল হয়। অরিন্দমও
পাগল হয়েছে।

ললিতা মুখ তুলল, অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে এবার হেসে
ফেলল, বলল “কি দেখছ?”

অরিন্দম কথা বলতে গেল, পারল না। নিরুত্তরে কয়েক মুহূর্ত
তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ললিতার হাত নিজের হাতে টেনে নিল।
স্পর্শ। দেহের ভেতর যেন একটু অনুভূতির পন্থাকলি দল মেলেছে।
আরো কাছে চাই। ললিতাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল সে।
ললিতা কাছে এল। নিজের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ তারা গুনতে পেল।
নিজের রক্ত-সমুদ্রের কম্পোলধ্বনি তাদের কানে ভেসে এল। হঠাৎ
অরিন্দম ললিতাকে বুকে টেনে নিল। অসুস্থ্য তৃষ্ণার একটা স্তর যেন
মুহূর্তে অনুধান করল কিন্তু কোমল দেহের স্পর্শ, বাহ্যিকতার বন্ধন, কঠিন
ও কোমল বুকের মিলন যেন নতুন বরে সেই তৃষ্ণাকে তীব্র করল।
অরিন্দম তাকাল। বাস্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে ললিতাও তাকাল। ললিতার
ছোটো পাংলা ঠোঁট কাঁপছে। কি যেন হল, নিজেরও অজ্ঞাতসার
অরিন্দমের মুখটা এগিয়ে গেল ললিতার মুখের দিকে। তারপর তার
ঠোঁট ললিতার ঠোঁটকে স্পর্শ করল। ললিতা চোখ বুজল, অরিন্দমের
চোখও মুদ্রিত হয়ে এল, কাঁপতে লাগল হৃৎকেন্দ্রের দেহ, হৃৎকেন্দ্রের উত্তপ্ত
নিঃশ্বাস ভারী হয়ে পরস্পরের মুখের ওপর পড়তে লাগল, বন্ধ হয়ে এল,
চুষন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল, ললিতার ছোটো হাত ধীরে ধীরে অরিন্দমের

কণ্ঠদেশকে আরো নিবিড়ভাবে বেঠন করল। কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল হৃজনের দেহ।

হঠাৎ ললিতা তাকে ঠেলে দিল, বলল, “না—আর না”—

অরিন্দম আবিষ্টের মত বলল, “কেন?”

“কখন বিপদ ঘনিযে আসবে, কখন যে আগুনের সংকেত চন্দ্রচূড়ের ওপর দেখা যাবে তা কে জানে? চল, বাইরে যাই”—

“না”—

“শোন—সংগ্রামের মুহূর্তে অতৃদিকে মন দিও না”—

অরিন্দম হাসল, বলল, “তোমার ভয় মিথ্যে ললিতা”—

“শোন, বিপদ হতে পারে—”

“না ললিতা”—

আবার সে ললিতাকে চুষন করল। সেই বিচিত্র তৃষ্ণা, একটা বিচিত্রতর আবেগ তাকে আবার উন্মত্ত করে ফেলছে। ললিতার গুষ্ঠের ক্ষুদ্র কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত তার দেহগৌরভ! আর বাইরে কি অদ্ভুত স্তব্ধতা!

একটির পর একটি চুষন। ওষ্ঠদেশ ত্যাগ করে গালে, তারপর চোখে, ললাটে, কর্ণে, বুকে, হাতে, বাহুতে। একটা অন্ধ আনন্দ। আর কোন জ্ঞান নেই। ঘরের ভেতরে মোমবাতিটা জ্বলছে, গলছে।

“ওগো—আর না, থামো”—

“ললিতা, তুমি হৃন্দর”—

“শোন”—

“তুমি আমার”—

“ওদিকে হয়ত সংকেত করছে ওরা”—

“ললিতা”—

বাইরে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে, রাত হয়েছে, রাত গাঢ় হচ্ছে। অরিন্দমের তৃষ্ণাও গাঢ়তর হচ্ছে। দূর, পাহাড়ের নীচের দিক থেকে

একদল শেয়ালের ডাক ভেসে এল, ভেসে এল হারেনার চীৎকার।
নিঃশব্দ, বায়ুহীন অরণ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকের দল অশ্রান্ত ঐকতান শূক
করল।

অরিন্দম ললিতাকে আরো নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরল।
ললিতা'র কেশের অরণ্য তার পিঠের ওপর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ল।
হুটি দেহ যেন এক হয়ে মিশে গেল। পরস্পরকে তারা যেন বিশ্লেষণ করে
বুঝে নিতে চাইল। আশ্চর্য একটা রংয়ের পৃথিবী, আশ্চর্য একটা
আনন্দময় প্রবাহ তাদের চারদিকে।

“শোন—দামে”—

“কথা বলো না—চুপ.”—

“কিন্তু বাইরে”—

“যাব—দাঁড়াও”—

“আমার কথা শোন”—

“তুমি আমার কথা শোন—ললিতা, তুমি এত সুন্দর! ললিতা, আমি
তোমাকে ভালবাসি—আমি আজ পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারি”—

“তুমি পাগল”—

“ললিতা!—আমি মানুষ”—

অরিন্দমের মাথায় হাত বুলোল ললিতা, গাত কণ্ঠে বলল, “জানি,
জানি—আজ তোমার বুক থেকে মুহূর্তের জন্মও কি আমার মরতে হচ্ছে
করছে? কিন্তু কর্তব্য?”—

অরিন্দম ললিতার কাণের পাশে মুখ নিয়ে গেল, মুহূ ও কম্পিত কণ্ঠে
বলল, “জানি, আমি তা জানি—কিন্তু ললিতা, চুপ করো, আমাকে
মুহূর্তের জন্ম মানুষ হতে দাও। ললিতা!”—

“কি”—

“তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?”

“কি বলব, কি জবাব দেব? ‘ভালবাসি’ বলেও কে বোঝাবে
পারব কত ভালবাসি?”

“অথচ ভালোবাসায় ডুবে যেতে পারছি না—মানুষ নিজেকে অসহায়
করে রেখেছে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারছে না”—

একটা সমুদ্র ঘেন তোলপাড় করেছে দেহের ভেতর। আকণ্ঠ সেই
পিপাসাটা বারংবার দেহকে কাঁপাচ্ছে। চুষনেও তৃপ্তি নেই, আলিঙ্গনেও
নিবৃত্তি নেই। দুঃসহ একটা কামনা, বহুবার মত দুর্জয় একটা বাসনা।

“ললিতা”—

“না—না”—

“হ্যাঁ”—

“তুমি সৈনিক”—

“আমি মানুষ”—

ললিতা বাধা দিল, কিন্তু পারল না, না পেরে সে নিজেকে ছেড়ে
দিল। উন্মত্ত একটা প্রয়াস। অরিন্দম ললিতাকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে
নিল, তাকাল তার মুখের দিকে। ললিতা’র চোখে জল।

“তুমি কাঁদছ!”

“না—না”—ললিতা হেসে হুঁচোথ মুদ্রিত করল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলে অরিন্দমের বুকে মাথা লুকোল।

তারপরে সমুদ্র আছড়ে পড়ল। একটা চেতনা-লোপকারী
অমৃতভূতি। বুকে বুক, মুখে মুখ, বাহুতে বাহু, উরুতে উরু। দুটি হৃদয়ের
স্পন্দন এক হল। নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। পৃথিবীর পরিব্যাপ্ত যে
আনন্দধারা কুল ফোঁটায়, নক্ষত্রের জন্ম দেয়, বীজকে অঙ্কুরে পরিণত
করে, সেই আনন্দধারার একসাথে ডুব দিল দুজনে। সব কিছু মিলিয়ে
গেল, চেতনার বাইরে চলে গেল। দুটি সুর মিলে একটি সুর হল, দুটি
দেহ এক দেহ হল, দুজনের নিশ্বাস একই বাতাসে মেলাল। আনন্দ,

পৃথিবী মধুময়। নতুন প্রাণের বীজকে বপন করল তারা। ভূভিক,
 বৃত্তা, পতঙ্গ আর হিংসার মাঝেও মাহুঘ তার সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখল।
 রক্তমাংস, অস্থিমজ্জার অন্তরালে যে মন তা যেন এতদিনে পরিণতি লাভ
 করল। হ্যাঁ, এই সেই মনিমর কক্ষ আর ঐ মোমবাতিটা যেন
 চন্দ্রকান্তমণি। ধমনীর মাঝে সেই স্বর্ণকেশীর নৃত্য, বুকের মধ্যে সেই
 পাখোয়াজের ধ্বনি, মহুয়া-গন্ধে মত্তর নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরে ভাসছে নটমল্লারের
 বিলম্বিত তান। শালবনের মাথার ওপরে উঠেছেন ক্ষীরোদ-সমুদ্র-স্নাত
 চন্দ্রদেব, বারংবার হরিণেরা ডাকছে, ময়ূরেরা কেকাদধ্বনি করছে, মৃগরাজ
 শব্বরের চীৎকারে অরণ্যের স্তব্ধতা খান খান হচ্ছে। পৃথিবী মধুময় হোক,
 প্রাণবাণ হোক, সুন্দরতর হোক।

“ললিতা”—

“উ” ?—

“ললিতা”—

“উ” ?—

“ললিতা”—

আবার নিঃশব্দ হয় চুজনে, পরস্পরের চেতনাতে মেশে। রাত বাড়ে।
 কিল্লীরবে অরণ্য মুখর হয়। হায়েনার ডাক ভেসে আসে, ভেসে আসে
 পাহাড়ী ঝরণার গান। আর সব নিস্তক। হাওয়া নেই, ধমধমে
 ভাব, একটা গাছের ও পাতা নড়ে না। রাত বাড়ে। পাহাড়ের চূড়ায়
 চূড়ায় চাঁদের আলো গলে গলে কুয়াশা হয়, শিশির ছড়ায়, কুলে কুলে বা
 এঁকে দেয়।

আর ঈশান কোন থেকে নিরেট কালো একটা মেঘের পুঞ্জ দৈত্যের
 মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দ্রুতগতিতে। নিঃশব্দে।

আর চন্দ্রচূড় পর্বতের চূড়ায় আশ্বিন অলে উঠেও একসময়ে নিভে
 যায়। কেউ সে সংকেত লক্ষ্য করে না।

অরণ্যায়ত পাহাড়গুলো যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে।

গভীর তুচ্ছতা।

হঠাৎ একটা শিলাখণ্ড গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে। শিলা থেকে শিলাস্তরে আঘাত খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে শব্দসৃষ্টি করল তা।

ললিতা চমকে উঠল, বলল, “কুনলে?”

অরিন্দম হাসল, বলল, “ভীক মেয়ে—ও কিছু নয়।”

“কিছু নয়?”

“না। হয়ত কোন জানোয়ারের পা লেগে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল”—

“ওঃ”—

কিন্তু সঙ্গেই আর একটা শব্দ শোনা গেল। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন। পাহাড়ের তুচ্ছতা খান খান হয়ে গেল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলল। শাল আর মজুয়ার বনে পাখীরা ভয়ানক কোলাহল তুলল, হরিণের পাল বিড়ো গতিতে বনান্তরে পালিয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠল দুজনে, শিখিল বেশবাস ঠিক করে নিয়ে সামনের দরজাহীন ঘরপথের দিকে এগোল। পত্রবহুল গাছপালার ফাঁক দিয়ে মেঘাবৃত চাঁদের ক্ষীণ আলো এসে মাটিতে পড়েছে, অস্পষ্ট আলো আধারির সৃষ্টি করেছে। সেই সব গাছপালার আড়াল থেকে তারা হঠাৎ দেখতে পেল যে ছায়ামূর্তির মত একজনের পর একজন, অনেক-গুলি সৈনিক গাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

“পালাও”—ভীতকণ্ঠে বলল ললিতা।

তারা ঘুরে দাঁড়াল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আবার আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, পাহাড় কেঁপে উঠল আর ললিতা অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁধ চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

“ললিতা!”

“পালাও”—

যন্ত্রনায় ললিতার মুখ বিবর্ণ, বিকৃত হয়ে গেছে, তার ক্ষত থেকে বহু-
মূল্য রক্তের ধারা আঙ্গুলের কাঁক দিয়ে শুকনো পাতার ওপর চুঁয়ে চুঁয়ে
পড়ছে।

মুহূর্তে ললিতাকে কাঁধের ওপর ফেলে পেছন দিকের ভাঙ্গা দেওয়াল
দিয়ে শালবনের ভেতর ছুটে গেল অরিন্দম।

পায়ের নীচে শুকনো পাতার রাশি দলে পিষে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে চলল
সে। চাঁদসমেত অর্ধেকটা আকাশ নিকষ কালো মেঘের আড়ালে আত্ম-
গোপন করেছে। এদিকটায় নিবিড় জঙ্গল, তাই অন্ধকারও নিবিড়।

ললিতা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, “সাবধানে চল - পড়ে যেয়ো না”—

“ললিতা!” আর্তকণ্ঠে বলল অরিন্দম। “তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?”

ললিতা হাসবার চেষ্টা করল, “কোথায়? ও কিছু নয়”—

“দাঁড়াও, এখুনি তোমার ক্ষত ধুয়ে বেঁধে দিচ্ছে”—

দাঁতে দাঁত ঘষে অমৃতপ্তকণ্ঠে অরিন্দম বলল, “আমি—আমি কর্তব্যে
অবহেলা করেছি বলেই এই শাস্তি—চন্দ্রচূড় পবিত্র থেকে ওরা নিশ্চয়ই
ঠিক সময়ে সংকেত জানিয়েছিল—কিন্তু আমি—। তোমার কথাও আমি
তিনি ললিতা—”

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলল, “অমৃত্যুপূর্ণত্বের লক্ষণ”—

অরিন্দম আর কথা বলল না। এগোল সে।

পেছনে অনবরত আঘেয়াস্ত্র গর্জাচ্ছে। শিকারী কুকুরের মত ভাঙ্গা
অরিন্দমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্বত মেঘের
ডাক গড়িয়ে গেল। যেন ঢেউ খেলানো লোহার পাতের উপর দিয়ে
এক অদৃশ্য দৈত্যরাজ তার লোহরথ চালিয়ে গেল। শালবনের পাখীরা
আতর্জন করে উঠল, হরিণের পাল এদিকে ওদিকে বিশৃঙ্খলভাবে

লাগতে লাগল। ময়ূরেরা গদগদকণ্ঠে প্ৰথম মেলে কেকাধ্বনি করতে
লাগল।

আকাশ মেঘের আড়ালে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেল। মেঘ আরো
ঢাকতে লাগল। যেন পাহাড়ের গুহা থেকে একদল সিংহ একটানা
গর্জন করতে লাগল। ঘোর অন্ধকারে শালবন একাকার হয়ে গেল।
তারি ভেতর দিয়ে সস্তপ্ৰণে এগোল অরিন্দম। ললিতার বোঝা এখন
ভারী মনে হচ্ছে অথচ পেছনে মেঘের ডাকের মাঝে মাঝে আশ্রয়স্থল
দূরগত গর্জনের শোনা যাচ্ছে।

আর একটু।

কণ্ঠের শব্দ নিকটবর্তী হয়েছে।

আর একটু।

করণাকে দেখা গেল।

একটা গাছের নীচে ললিতাকে সমস্ত গুইয়ে দিল অরিন্দম।
ললিতার মুখে স্বপ্নাবারি, বহুনাথ ছুঁচোখ মূদ্রিত, রক্তে তার শাড়ী রঙা
হয়ে উঠেছে। ললিতার রক্ত অরিন্দমের জামাকাপড়েও লেগেছে।
ললিতার রক্ত—তা যেন অরিন্দমেরই বুকের রক্ত।

“ললিতা”—

“উঃ” ললিতা সাড়া দিল, ছুঁচোখ মেলে তাকাল, হাসল, বলল,
“ভয় নেই, আমি তোমাকে ছেড়ে মরব না।”

অরিন্দম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “দাঁড়াও—জল নিয়ে
আসছি”—

“এসো”—

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গ সঙ্গ জিশান কোনের দিকে একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ শোনা গেল।
অতি মৃদু। মৃহুতে তা প্রবল হল, প্রবলতর হল, প্রবলতম হয়ে আছড়ে
পড়ল পাহাড়ের গায়ে, শালবনের ঢুক। গৌঁ গৌঁ শব্দ। বোঝা কান্নার

মত। যেন হাজার হাজার প্রাগৈতিহাসিক জন্তরা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য একজোট হয়েছে।

“ঝড় উঠল ললিতা”—

“হু”—

“কিন্তু ভয় পেয়ো না তুমি—আমি আসছি”—

অরিন্দম ঝরণার দিকে এগোল।

ঝড় বাড়ল, ভয়ঙ্কর হল। মড় মড় শব্দে গাছ উপড়ে পড়তে লাগল, পতিত গাছের আঘাতে পাহাড়ের গা বেয়ে শিলাখণ্ড গড়াতে লাগল, অসংখ্য অদৃশ্য হাত দিয়ে কারা যেন পাহাড়টাকে ধরে নাড়া দিতে লাগল।

অরিন্দম ক্রম্বেপ করল না। ঝরণার ধারে গিয়ে সে পরিধেয় ছিঁড়ে জলে ভেজাতে লাগল।

ঝড় বাড়ল। মেঘের ডাক আবার শোনা গেল। গুরু গুরু গুরু গুরু—দৈত্যরাজের লৌহরথ ধামানে ছুটে চলেছে। কোথায় যেন একটা বিরাট পাথরের প্রাসাদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। হঠাৎ আকাশটা যেন কেটে পড়ল, বারংবার বিদ্যুৎ চমকাল। নীল বিদ্যুতের প্রখর আলোর একটা ধারা এসে যেন অরিন্দমের চোখ ঝলসে দিল, তাকে স্পর্শ করল, তাকে অবশ করে দিল আর তার হৃৎচোখের সামনে পূজ পূজ কালো মেঘের মত অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ঘোঁয়ার মত চেতনা মিলিয়ে গেল।

মূহূর্তকাল মাত্র।

তারপরই সে আবার জ্ঞান ফিরে পেল, চারদিকে তাকাল। একি? বজ্রার জলের মত হুর্দম বাতাসের বেগ তাকে গুরুতো পাতার মত শূন্যে তুলেছে, তাকে আঘাতে আঘাতে ধামনের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ নিজের দিকে তাকাল সে। একি! একি! সে আত্ননাদ করে উঠল। একি! সে যে আবার সেই পুতুলের দেশের গ্রহরীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পেছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, “তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় গেলে ?”

ললিতা ডাকছে।

“তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় ?”

বাতাসে এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কহারের আলাপ। শ্রীমন্ত বীণা বাজাচ্ছে, কীর্তিমান গাইছে, সেই নাইন পাখোয়াজ-বাদক তার বাস্তবত্রে আঘাত করছে, উর্বলীর মত সুন্দরী মারিয়ানা নাচছে, টিমথির বেহালা থেকে নাইটিংগেলের গান বেরোচ্ছে। মনিমানিক্যখচিত সেই পুতুলের দেশকে সে দেখতে পাচ্ছে। সেখানকার প্রহরী সে। তার হাতে একটা বাঁকা তলোয়ার সে দেখতে পাচ্ছে। অসংখ্য পুতুলেরা। আনন্দে বিভোর তারা। সুখ-স্বপ্নের মত সুন্দর তাদের দিন আর রাত। ছয়রাগ হুত্রিশ রাগিনার আলাপ মার ত্যাচ্ছন্দে তাদের দিন রাত কাটে। দুঃখশোক জরামৃতহীন তাদের জীবন ও যৌবন। আর তাদের মাঝে সেই পক্ষকেশ বুড়ো শিল্পীরাজ। তার যেন সবাই তাকে ডাকছে।

“এসো—এসো”—

“প্রহরী, তুমি কোথায় ?”

“প্রহরী, তুমি ফিরে এসো”—

“প্রহরী-ই-ই-ই”—

ঝড় বাড়ছে, বায়ুবেগ বাড়ছে, কোনো পাতার মত উড়ে চলেছে সে। আর ঝড় ও বজ্রের সেই প্রায়ঃকর শব্দ ভেদ করে আর একটি ডাক ভেসে আসছে, “তুমি কোথায় ? ওগো তুমি কোথায় ?”

অসহায় মুমূর্ষু প্রেমসীর কাতর আহ্বান।

না। সে আর পুতুলদের রাজ্য ফিরে যাবে না। প্রজাপতি-পক্ষ-বাহিত মধু আর আর্দ্র বাতাসের পর্দায় তার চাই না, নৃত্যগীতে ভরা আনন্দ-ঘন অস্তিত্বেও তার প্রয়োজ নেই। কর্মহীন, শ্রমহীন, সৃষ্টিহীন ও সংগ্রামহীন পুতুলের খণ্ড ষবনের আনন্দে তার কোন লোভ নেই।

সেই জীবন চায়, সে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করবে, কঠিন শ্রমের মধ্যে
 ন করবে, সংগ্রাম করে বঁচিন হবে, কঠিন হৃদয়কে আবার প্রেমের
 মাধুর্যে মধুর করবে। সে মানুষ হবে, মানুষের জীবনে সে পুতুলদের
 আনন্দময় অহুভূতিকে সত্য করবে। লোভ লালসা, নীচতা, শঠতা,
 স্বার্থ, ব্যাধি, দারিদ্র, দুঃখ, বৈরাগ্য, শোষণ ও নির্দোষ—অসংখ্য
 জগতের সব সর্প-কুর দানবদের স একে একে অপসারিত করবে।

“ওগো-ও-ও—তুমি কোথায়? তুমি এসো-ও-ও-ও—”

হ্যাঁ, সে পাপ করেছে। সংগ্রামের পবিত্র বর্তমানে সে ভুলে
 গিয়েছিল। কিন্তু আর না, ভবিষ্যত আর কোনদিন সে পুণ করবে না।

চীৎকার করে সে বলল, “আমি আসছি—আমি আসছি ললিতা—আ-
 আ-আ”—

ঝড়ের হাহা শব্দে তার পুতুলেরা ক্ষীণ কণ্ঠ ডুবে গেল। মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সে মানুষ হবে। পুতুলের ডাক সে শুনেবে না, সে প্রবল
 হবে না। শিল্পীরাজের কথা তারানে আছে। সে জানে, সে প্রমাণ
 পেয়েছে যে ইচ্ছা থেকেই সব কিছু উৎপন্ন হয়। আজও সে ইচ্ছা করেছে।
 সে মানুষ হবে, মানুষ হবে, মানুষ থাকে হতেই হবে।

“প্রহরী ফিরে এসো”—

“প্রহরী-ই-ই-ই”—

পুতুলেরা ডাকছে।

আর ডাকছে ললিতা, “তুমি কোথায় গেলে? তুমি এসো-ও-ও”—

ললিতা ডাকছে। বার দেহের দ্বারা এখনো তার প্রতিটি রোমকূপে।
 এখনো যে শালবনের প্রান্তে, রক্তাক্ত মায়ায় শুয়ে তার প্রতীক্ষা করছে।

“আমি আসছি ললিতা—আমি আসছি—ই-ই-ই”—

হ্যাঁ, সে মানুষ হবে। আর ভুল হবে না সে, আর অবহেলা করবে
 না। সে মানুষ হবে, মানুষ হবে। উদ্দেশ্য তার বুক বারংবার ওঠানামা
 করতে লাগল, নাকটা ফুলে উঠল, চোখে তারায় দাবানল জ্বলল।

৬৫

